এক

তের শো চুয়ান্ন সাল। ইংরিজী উনিশ শো আটচল্লিশ।

চৈত্র-সংক্রান্তির শেষ রাত্রি। বোধ করি আর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদেড়েক মাত্র রাত্রি বাকি আছে। নবগ্রামের পশ্চিম দিকের প্রবেশ-মুখে পাকা সড়ক ধ'রে একখানি গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়োয়ানই গরু দুটোকে রুখলে। গাড়ীটাতে ছই নেই, শুধু খাটুলি—দেখে মনে হয়, বোধ হয় জিনিসপত্র বোঝাই নিয়ে আসছে। কিন্তু তা নয়, খাটুলিটার ভিতর খড় বিছিয়ে তার উপর বিছানা পেতে একজন আরোহী ঘুমুচ্ছিলেন। গাড়োয়ান ডাকলে—বাবু! বাবুমশায়! অ বাবু!

আরোহী সাড়া দিলেন—ডাকছ?

—আজ্ঞা হাঁ। নবগ্রাম এসে গেলাম। কোথাকে যাবেন বলুন?

—এসে গেলাম! উঠে বসলেন আরোহী। চারিদিক চেয়ে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে, কোন্ জায়গা এটা বল তো?

—রেলের ফটক গো। এই তো গ্রাম শুরু। ওই বাঁ দিকে হাসপাতাল। ওই ছামনে রেজেষ্টারি আপিস। তারপরে ইস্কুল। তারপরে বড়বাবুদের কাছারি।

আরোহী বললেন—চল, গ্রামের ভিতরে চল। দক্ষিণপাড়া।

—কার বাড়ী যাবেন, তা বলেন।

—দাঁড়াও, আমি নেমে পড়ি। আমার সঙ্গে এস তুমি।

—হেঁটে যাবেন? কেন গো?

—হ্যাঁ, হেঁটেই যাব।

গাড়োয়ান আর বললে না কিছু। সওয়ারীটি সম্পর্কে বিস্ময় তার অনেক, কিন্তু তা নিয়ে ঔৎসুক্য আর তার নেই। সাত মাইল পথ

আসতে আসতেই বিস্ময় তার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সাত মাইল দূরে বড় লাইন অর্থাৎ ই-আই-আরের স্টেশনে রাত্রি বারোটার ট্রেনে নেমেছে। ই-আই-আর স্টেশন থেকে ছোট লাইন চ'লে গিয়েছে পূব দিকে; সেই লাইনেরই একটা ফটক—এই ফটকটি; এই লাইনের উপরেই এই গাঁয়ের স্টেশন, এ লাইনের বড় স্টেশন—গ্রাম নবগ্রাম। বড় লাইনের জংসন স্টেশনে—ছোট লাইনের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, রাত্রে বড় লাইনের ট্রেনে নেমে যারা এই ছোট লাইনে যাবে—তারা ওই ছোট গাড়ীতে গিয়ে বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়ে। ভোর-ভোর ট্রেন ছাড়ে, নবগ্রামে সে ট্রেন আর ঘণ্টাখানেক পরে এসে পৌছবে। এর জন্যে কেউ গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে আসে না। কেন আসবে? সড়কটা অবশ্য নামে পাকা সড়ক। অনেক কালের সড়ক। কিন্তু আজকাল সে সড়কের যা হাল—তাতে গোপথও অনেক ভাল। যে যুদ্ধ গেল, ওরে বাপ রে, বাপ রে! মিলিটারী লরীতে সড়কের হাড় পাঁজরা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলো ক'রে দিয়ে গিয়েছে। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এক বিন্দু বাড়িয়ে-বলা কথা নয়। এই সড়কটার উপরের লাল কাঁকর পাথরের জমাট বিছানার নীচে দু থাক ঝামা ইট বিছানো ছিল। সে ইটের আর চিহ্ন নাই। আছে গুঁড়ো সুরকি। এক হাঁটু পুরু লাল ধূলো আর সুরকি, তার মধ্যে মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য খানা। এর উপর গরুর গাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরিয়ে লোকে কেন আসবে? তার উপর দু টাকা চার আনা বেশী ভাড়া দিয়ে। রেলে নবগ্রাম পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া বারো আনা। গরুগাড়ীর ভাড়া আড়াই টাকা। এ বাবু তিন টাকা ভাড়া দিতে রাজী হয়েছে। গাড়ীতে ছই নেই; বলছে—সে ভালই হয়েছে। গরমের দিন—চাঁদনী রাত—খোলা গাড়ীতে বেশ আরামে যাব। ছই থাকলেই আমার অসুবিধে হ'ত।

আরে মশায়, ধূলোতে সর্বাঙ্গ লাল হয়ে যাবে!—গাড়োয়ানের আসতে খুব ইচ্ছে ছিল না। সে নিজেই বলেছিল কথাটা। এই অদ্ভুত বাবুটি হেসে বলেছে—ধুলো তো ভাল জিনিস, চল।

শেষ পর্যন্ত তিন টাকার লোভে এসেছে গাড়োয়ান। নইলে চৈত্র-বৈশাখ মাস মাঠে সার বইবার সময়—এখন কি ভাড়া খাটলে চলে!

সারাটা রাস্তা লোকটি তাকে বকিয়েছে। কি নাম? চাষ কর? চাষে তো এখন অনেক লাভ কিন্তু সে নিজের জমি না-থাকলে নয়? তোমার নিজের জমি আছে? বাড়ীতে কে কে আছে? ছেলে দুটি কেমন? তোমার কথা-টথা শোনে তো? মেয়ে তিনটির বিয়ে দিয়েছ—জামাইরা কেমন? ছেলেমেয়েদের কি নাম? নাতি নাতনী ক'টি? কথা শুনে মনে হচ্ছে—ছোট মেয়ের ছোট মেয়েকে বেশী ভালবাস তুমি। তা নাতনীর নাম কি রেখেছ? উল্‌কী? উল্‌কী ব'লে ডাক? বাঃ, বেশ নাম—খাসা নাম! নাতনী তোমার অঙ্গের উল্‌কী। দিব্যি, আদর করতেও সুবিধে—উল্‌কী—উল্‌কী—উল্‌কী—মনের বনের তুমি ফুল কি? ফুল নও—ফুল নও আগুনের ফুল্‌কি। উল্‌কী-উল্‌কী-উল্‌কী! তুলে দেবে বেছে পাকা চুল কি?

এমনি বড়্‌বড়্‌ ক'রে কত যে বকেছে তার ঠিকানা নাই। তবে হ্যাঁ, সারা পথ সিগারেট খাইয়েছে বটে! নিজে একটি ক'রে ধরায় আর বলে—নাও গাড়োয়ান মশায়, ধরাও।

তার পর বলে—নাও গাড়োয়ান মশায়, একপদ গান কর ভাই। চাঁদনী রাত। জমিয়ে ধর। ভদ্রলোক অনেক ক'রে বললে সে আর কি করে? গান ধরেছিল—'কত দিনে ঘুচবে রে মন (তোর) আমি-আমি-আমি করা? আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া।'

মাঝপথে—তালের মুখেই অবশ্য—থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বলে—না গাড়োয়ান মশায়, ও গান নয়। এমন চাঁদনী রাতে একখানা পিরীতি রসের গান কর।—

"চৈত্রেতে মাধবী ফুল ফুটে থরে থরে,
মাধব বিহনে হায় কেঁদে যায় ঝ'রে।"

বারমেসে গান কর বরং। বুঝেছ? কিংবা ধর "বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা তো হ'ত না পরাণ গেলে!"

এ পর্যন্ত তো যা-হোক তা-হোক ব্যাপার, অর্থাৎ বিস্ময়ের হ'লেও বিস্ময়ে হতবাক হবার মত ব্যাপার নয়। এর পর ঠিক সাড়ে তিন মাইলের মাথায় সুঁদীপুরের বটতলায় এসে হঠাৎ উঠে ব'সে বলে—এই তো সুঁদীপুরের বটতলা!

হ্যাঁ, সুঁদীপুরের বটতলা। তা হোক, আপনি ভয় পাবেন না মশায়। এখন আর ভয়ের কিছু নাই। ভয় ছিল বটে আগেকার কালে, সে আপনার পঞ্চাশ বছর আগে। তখন এখানকার চেহারাও ছিল অন্যরকম। আধ মাইল আগে হতেই রাস্তার দু পাশে ছিল ঘন জঙ্গল—একেবারে বিশ হাত প্রশস্ত -পাঁচিলের মত ঘন, মাথার উপরেও দু পাশের গাছ পরস্পরে মাথায়-মাথায় মিশে ছাউনির মত নিশ্ছিদ্র, দিনেও আলো হ'ত না ভাল ক'রে, রাত্রে চামড়ার মত পুরু অন্ধকার থমথম করত। এরই মাঝখানে এই বটতলা। বিশাল ছত্রচ্ছায়া। শাখা থেকে নেমেছে ঝুরি; সে ঝুরি মাটিতে ঢুকে কাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এমনি কাণ্ড প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা। তার মধ্যে মূল কাণ্ডটা ফাঁপা শূন্যগর্ভ। তার মধ্যে চন্দ্রবোড়া সাপের রাজ্য। আর শাখায় শাখায় পেঁচার কোটর। তলার জায়গাটায় ঘাস জন্মায় না কোন কালেই। পরিষ্কার মিহি বালিতে ভরা। তার চারিপাশ ঘিরে ব'সে থাকত ঠ্যাঙাড়ে নরহন্তারা। নিঃশব্দে ব'সে থাকত। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ মিশে যেত ওই সাপগুলোর নিশ্বাসের সঙ্গে। গাছের ডালে ডালে ডাকত পেঁচারা। আর এক ধরণের রাত্রিচর পাখী ডাকত। কুক্-কুক্-কুক্-কুক্ শব্দ উঠত। এরই মধ্যে অকস্মাৎ উঠত তীব্র মর্মান্তিক চীৎকার। মানুষের চীৎকার। এই জঙ্গল-ঘেরা রাস্তার উপর বেজে উঠত দ্রুত ধাবমান চতুষ্পদের খুরের শব্দ। গাড়ীর গরু দুটো ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ভয়ে ছুটে পালাত। সকালবেলা পাওয়া যেত পরিত্যক্ত ছইওয়ালা গাড়ী। ভাল ক'রে খুঁজলে একটা

বা তুটো বা তিনটে মৃতদেহ পাওয়া যেত। আকাশ থেকে পাক খেয়ে নামত মৃতমাংসলোভী শকুনের পাল। কাছাকাছি কোন জঙ্গলে বা খানায় মাথা-গোঁজা অবস্থায় পাওয়া যেত। বর্ষার সময় পাওয়া যেত না। ওই যে পিছনে ফেলে এলাম 'নলে' নদীটা—ওই নদীর জলে ভাসিয়ে দিত। সেকাল হ'লে কি এই রাত্রে তিন টাকা ভাড়ার লোভে সে আসত? ঘড়াভর্তি টাকা-মোহর দিলেও না। সেকালে লোকে বলত—"যদি পার হবি ন'লে ঘরে আয়গা ব'লে।" অর্থাৎ বিদায় নিয়ে আসিস। শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা ক'রে তবে আসিস।

সে কাল আর নেই। সেকালও নেই—সে ঠাঁইও নেই। তাকিয়ে দেখ, জঙ্গল নেই, সাফ হয়ে গিয়েছে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে দেখ, তার সে ফাঁপা কোটরওয়ালা গুঁড়িটাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে কোটরের বাসিন্দা চন্দ্রবোড়া সাপেরাও নেই। ঝুরির কাণ্ডগুলোর উপর গাছের মাথাটা দাঁড়িয়ে আছে থাম-ভেঙে-পড়া পাকা-বাড়ীর ফাটা থিলেনের মত। আর তারা—যারা মানুষ মারত পিশাচের মত—তারাও নেই। সে জাতটাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ভয় নেই বাবু, শুয়ে থাক। কথাতে যদি মন না মানে, তবে বল একখানা গান করি, পীরিতি রসের নয়, ভক্তিরসের। শ্যামামায়ের নাম করি।

আমি নই আটাশে ছেলে—
আমি ভয় করব না রাঙা চোখ দেখালে
ওরে শমন—

বাবু অদ্ভুত। বলে—না গাড়োয়ান মশায়, ভয় নয়। একটুখানি গাড়ীটা তুমি রাখ। আমি একবার নামব। সুঁদীপুরের বটতলাটা দেখব। ওর তলায় ব'সে একটা সিগারেট খাব।

এ এক ভাল মজার মানুষ নয়?

এইভাবে সারা রাস্তাটা এসে সাড়ে পাঁচ মাইল—ওই রেললাইনের রাঘবপুর হল্টের কাছে চুপ হয়েছিল। আর খানিকটা এসে গাড়োয়ান

পিছন ফিরে দেখেছিল—বাবু ঘুমিয়েছে। সে মনে মনে বলেছিল—বাবা, বাঁচলাম।

এ মাইল দেড়েক সেও ব'সে ব'সে ঘুমিয়েছে। খাটুলির গাড়ীতে ব'সে ঘুমানোর সুবিধে আছে, ঠেস দেওয়া যায়।

এখন আবার বলে—হেঁটে যাব। তাই চল, হেঁটেই চল।

* * * *

দু পাশে কত পরিবর্তন ভদ্রলোকটির চোখে পড়ল। গ্রামে ঢুকতে রাস্তার দু পাশে ছিল দুটি পুকুর। নবগ্রামের গোপীচন্দ্রবাবুর শখের পুকুর-পাড়ের উপর ছিল বাগান। বাগান আজ আর নেই। দু পাশে সারি সারি ঘরবাড়ী। তারপর ইস্কুল। এই তো গোলথামওয়ালা স্কুলটি। ওঃ, পাশে আরও কত বাড়ী ঘর! বোধ হয়, ইস্কুলটাই বেড়েছে। ওই এ পাশে সেকালের কাস্টেয়ার্স চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্সারি। পরে ওটা হয়েছিল গোপীচন্দ্রবাবুদের বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য বিশ্রামভবন।

মনে প'ড়ে গেল, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে গোপীচন্দ্র চিকিৎসার জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন। শুভক্ষণ দেখে ভিতর-বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে এই বিশ্রামভবনে ছিলেন এক রাত্রি। তারপরই এই যে বাঁয়ে শ্যাম সায়র। এইখান থেকেই রাস্তাটা দু দিকে চ'লে গিয়েছে। দু দিকে চ'লে যায় নি, এইখানে—একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পথ মূল রাস্তা থেকে বার হয়ে সোজা চ'লে গিয়েছে নবগ্রামের দক্ষিণপাড়ায়; গোপীচন্দ্রের ভিতর-বাড়ীর দরজায় গিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়াল।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'ল বাবুমশায়? পথ ঠাওর করতে পারছেন?

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে। পথ চিনতে

পারছে না ব'লে গাড়োয়ান সন্দেহ প্রকাশ করছে। করতে পারে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তার পরিচয় যে কত নিবিড়, কত গভীর সে তো জানে না। সে তো জানে না, এখানকার মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক পুরুষানুক্রমিক—জন্মমুহূর্ত থেকে। তাই বা কেন—তারও আগে থেকে; যে সময়ে মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে তার অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে। মায়ের নিশ্বাসের সঙ্গে এখানকার বায়ুকে সে গ্রহণ করেছে, তারই সঙ্গে এখানকারই জলে শস্যে সে পুষ্টিলাভ করেছে। এখানকারই মাটির উপর সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখানকারই মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তার জন্মের আগে থেকে। তার সঙ্গে বন্ধন তার বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন।

—বাবু মশায়! রাত যে শেষ হয়ে এল। পথ ঠিক করেন, পথে দাঁড়িয়ে থাকব কত?

সচেতন হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন—তুমি তো এ গ্রামে নতুন আসছ না। দক্ষিণপাড়া চেন তো?

—তা চিনি বইকি। বল্লেন না কেন কার বাড়ী যাবেন? এ মাঠের পথে তো দক্ষিণপাড়ার ভিতরে যাওয়া যাবে না। বড়বাবুদের বাড়ীর পিছনকার দরজায় যাওয়া যাবে। আর মাঠ ভেঙে ইস্টিশানে যাওয়া যাবে।

—জানি।

—তবে এখানে দাঁড়ালেন যে?

—দাঁড়ালাম। একটু চুপ ক'রে থেকে ভদ্রলোক বললেন—সে শুনতে হবে না তোমাকে। তুমি এক কাজ কর, তুমি বাজারের পথে চ'লে যাও দক্ষিণপাড়ায়। কিশোর মুখুজ্জে মশায়ের বাড়ী জান?

—তেনার বাড়ী যাবেন?

—না। তাঁর বাড়ীর আগেই ভাঙা প'ড়ো একটা বাড়ী আছে, নিশ্চয় দেখেছ?

—বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী?

—হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি। চল, চল, দাঁড়িও না।

গাড়ীটা চ'লে গেল শ্যামসায়রের পাড়ের উপরের বাগানের মধ্য দিয়ে পাকা সড়ক ধ'রে।

এ পাশে মাঠের বুক চিরে চ'লে গেছে ছোট একটি পাকা সড়কের মত পথ—দক্ষিণপাড়ায় যাবার সংক্ষিপ্ত পথ। গোপীচন্দ্রবাবুর প্রাসাদের পিছনের দরজায় শেষ হয়েছে। দক্ষিণ দিকে ধানক্ষেত, উত্তর দিকে সারি সারি পুকুর। ঘন তালগাছের সারিতে ঘেরা জঙ্গলসমাচ্ছন্ন কাশীর পুকুর, তারপর সাহার পুকুর, তারপর বাড়ীর পুকুর, বাড়ীর পুকুরের বিপরীত দিকে এ গ্রামের অন্যতম জমিদার স্বর্ণবাবুদের শখের কালী সায়র।

বাড়ীর পুকুর এবং সাহার পুকুরের মাঝখানে বিশাল অর্জুন গাছ। তার তলায় কাঠাদুয়েক জায়গা—পোড়া হাঁড়িতে সমাকীর্ণ। পুরুষানুক্রমে ওইখানে দক্ষিণপাড়ার জন্মমৃত্যুর হিসাব দাখিল করা হয়। নবজাতক জন্মালে তার নাভিপুষ্প ওই অর্জুন গাছটির গোড়ায় রেখে আসে দাইয়েরা। বলে আসে—হে সহস্রায়ু মহাবনস্পতি, এই পুষ্পে তোমায় পূজা পাঠিয়েছে নবজাতক। তুমি তাকে শতায়ু বর প্রদান কর। আর দাও তাকে তোমার মত বীর্য। সে যেন সকল ঋতুর প্রকোপ সহ্য করতে পারে তোমার মত সহনশীলতায়। সে যেন আকাশপথে তোমারই মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আবার মৃত্যুতেও এইখানে গৃহস্থ রেখে দিয়ে যায় রন্ধনশালার পাত্রগুলি। ব'লে যায়—একদিন যে নবজাতক তোমাকে তার নাভিপুষ্পে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল, সে আর নাই। তার বিয়োগে অন্ন-অমৃতও তিক্ত হয়েছে, তাই অন্নপাত্র পরিত্যাগ করলাম তোমার চরণতলে।

এই মহাপবিত্র বনস্পতিও কিন্তু কালক্রমে—সমাজবিকৃতির ফলে—অস্পৃশ্য স্থানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অর্জুন গাছটি এ গ্রামের মধ্যে মহা ভয়ের জায়গা। এখানে নাকি—মানে ওই গাছটায় নাকি কোন এক ভয়ঙ্কর বাস করেন। কেউ দেখেছে—এ কথা কেউ বলে না; তবে অনেককাল আগে অনেকে দেখেছিল—এ কথাকে লোকে ইতিহাসের পাতায় স্থান দিতে দ্বিধা করে না।

কাশীর পুকুরে অসংখ্য আলকেউটের বাস। এটা কথার কথা নয়। এ কথা সত্য। কাশীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আছে তিনটি মহুয়ার গাছ। মহুয়ার ফুলের সময়—। এই তো, এই তো মহুয়া ফুল ফুটবার সময়—চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে মহুয়ার ফুল ফুটবে। আজও হয়তো আর একটু এগিয়ে গেলেই মদির মহুয়া ফুলের গন্ধ এসে নাকে ঢুকবে। ভোর রাত্রি এখন, এখন থেকেই টুপ-টাপ ক'রে খ'সে পড়ছে একটি দুটি ক'রে। ইস্কুলে এখন মর্নিং স্কুলের সময়। মর্নিং স্কুলে আসবার পথে ওই গাছ-তলায় ছুটে যেত ছেলের দল। একা কেউ যেত না, কেউটে সাপের ভয়ে। চীৎকার ক'রে কলরব তুলে কেউটেদের স'রে যেতে ব'লে তারা যেত গাছতলায়। সকালবেলা পথের ধূলোর উপর সাপের যাওয়া-আসার দাগ প'ড়ে থাকত। রাত্রে কতজন তাড়া খেয়েছে।

এইগুলি মনে প'ড়েই কিন্তু এ লোকটি এমনভাবে থমকে দাঁড়ায় নি। একটি বিচিত্র স্মৃতিকথা মনে পড়েছে তার।

বহুদিন পূর্বে—তখন তার বয়স সাত বৎসর।

সেইদিনও ছিল চৈত্র-সংক্রান্তি। তবে সন্ধ্যা। চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধ্যা।

সেইদিনই দুপুরবেলা এই গ্রামের সে-যুগের মহেশ্বরের মত পুরুষ গোপীচন্দ্র শেষবারের মত নবগ্রাম ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন; দিনের

বেলা শুভক্ষণ দেখে গ্রামের ভিতরের অন্দরমহল থেকে যাত্রা ক'রে এইখানে ওই বিশ্রামভবনে প্রতীক্ষা করছিলেন। যাবার কথা শেষরাত্রে। সকালে ওই জংশন স্টেশনে ট্রেন ধরবেন। গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তিনি একটি ছোট ছেলের খোঁজ করেছিলেন। এই গ্রামের রাধাকান্তবাবুর ছেলে গৌরীকান্তের। কিন্তু গৌরীকান্ত তখন ছিল না বাড়ীতে। সন্ধ্যার সময় গৌরীকান্তের মা সাত বছরের ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন গোপীচন্দ্রের পায়ে প্রণাম নিবেদন করতে।

সাত বছরের ছেলেটি একা এসেছিল এই পথে।

ভদ্রলোকের চোখের সামনে সেই ছবি ভেসে উঠছে। তাই তিনি দাঁড়িয়েছেন। আবছা অন্ধকারে ছাওয়া চারিদিক। পশ্চিম আকাশে অল্প আলোর আভাস। চারিদিকে কোটী কোটী পতঙ্গের ধ্বনি অনন্ত সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হচ্ছে। আশেপাশে কোথাও মানুষ নেই। তারই মধ্যে ছেলেটি চ'লে আসছে।

পিছনের গ্রামপ্রান্তে কালী সায়রের বড় বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকার অংশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। নারী-কণ্ঠস্বর। গৌরীকান্তের মা—কাশীর বউয়ের কণ্ঠস্বর। বিচিত্র মহিমময়ী নারী ছিলেন তিনি।

তিনি ওই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছেলেকে অভয় দিচ্ছিলেন—চ'লে যাও, ভয় নেই। চ'লে যাও। চ'লে যাও। ভয় নেই। আমি আছি; ভয় নেই। চ'লে যাও।

সেই অভয়ে নির্ভয় পদক্ষেপে চ'লে আসছে গৌরীকান্ত। ছোট্ট সাত বছরের ছেলেটি।

ভদ্রলোকটি সেই কণ্ঠধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছে। দীর্ঘকালের ওপার থেকে ভেসে আসছে।

—চ'লে যাও। ভয় নেই।

অকস্মাৎ চোখে জল এল ভদ্রলোকের।

সেই শেষরাত্রে স্তব্ধতার মধ্যে একবার কাতর স্বরে লোকটি ডেকে উঠল—মা!

সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। শ্যাম সায়রের জলের বুক ছুঁয়ে চ'লে গেল উত্তর দিকে। পূর্ব-দক্ষিণে মাঠের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

এ আবেগ ভদ্রলোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। নিজেই সেই বালক গৌরীকান্ত। দীর্ঘকাল পরে নবগ্রামে ফিরে আসছে।

দুই

গাড়োয়ানকে বিদায় ক'রে নিজেদের জীর্ণ বাড়ীটার বারান্দায় ট্রাঙ্কটার উপর ব'সে ছিল গৌরীকান্ত। দক্ষিণমুখী একতলা বাড়ীটার সামনে প্রকাণ্ড হাতা। চারিপাশের পাঁচিলটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বাড়ীটার দক্ষিণ এবং পূর্ব প্রায় খোলা বললেই হয়। পূর্ব-দক্ষিণ অংশের আকাশ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। আদিম প্রকৃতি তামসী সূতিকাগারে প্রবেশ করেছে। আলোক-শিশুকে প্রসব করবে।

পাণ্ডুর আকাশের পটভূমিতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার খণ্ডের মত ও কি? মেঘ? না, মেঘ নয়। গ্রামের দুর্গালাইকার দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণের বটগাছটা। মহাবৃক্ষ। ওঃ এখনও কি পত্রপল্লব-সমারোহ! ফাল্গুনে পাতা ঝরেছে, এরই মধ্যে নূতন পাতায় ভ'রে গিয়েছে। না-গেলে এমন জমাট অন্ধকারের মত তো মনে হ'ত না! ঠিক এই মুহূর্তটিতেই আকাশের বায়ুস্তরের নিঃশব্দতা ভেঙে দিয়ে ডেকে উঠল হাজারে হাজারে পাখী। কলকলস্বর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

গৌরীকান্ত উঠে এসে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াল। আলোক-প্রকাশের অপেক্ষা আর তার সইছে না। দীর্ঘ—দীর্ঘকাল পর ফিরে এল সে নবগ্রামে। একদিন সে এই গ্রাম থেকে এমনই গভীর রাত্রে—। থাক্ সে কথা। থাক্, অপমানের কথা, অমর্যাদার কথা, অবজ্ঞার কথা, নির্যাতনের কথা থাক্ এখন। এখন শুধু ভালবাসার কথা, স্নেহের কথা বড় হোক। নইলে সে এল কেন? কোন্ আকর্ষণে এল? এসে অবধি

তো শুধু সেই কথাই মনে পড়ছে। কত সুখ—কত হাসি—কত কান্নার কত ছোট কথা মনে পড়ছে, যা এর আগে কোনদিন মনে পড়ে নি।

কিশোরবাবুর খুড়তুতো ভাই অতুল তার সঙ্গে পড়ত। তার সঙ্গে মিলে একদিন তারা দুজনে একখানা কাঁচি নিয়ে পরস্পরের চুল ভুরু কেটে ছ আনা দশ আনা চুল ছাঁটার এবং দাড়ি কামানোর শখ মিটিয়েছিল। একদিন গোলাপগাছের ডাল নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল অতুলের সঙ্গে। গোলাপগাছের ডালটার সঙ্গে একটা মর্মান্তিক স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। থাক্। না, ওই ঘটনার কথা ভোলা যায় না। ও-ঘটনা থেকেই তাদের বংশের গতির দিক্‌পরিবর্তন হয়েছে।

গৌরীকান্তের দৃষ্টি আপনা থেকে গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল—বারান্দার সামনে প'ড়ো জায়গাটার একটি স্থানে। এই প'ড়ো জায়গাটায় তখন ছিল সুন্দর একটি বাগান। একালের কেয়ারী-করা বাগান নয়। বাগানের মধ্যে আঁকা ছকের মত রাস্তা ছিল না। ছিল সারি সারি গাছ। বারান্দাটার মাঝখানের সিঁড়ি থেকে শুধু একটি সোজা রাস্তা ছিল। দু-পাশের জমিতে আলু বেগুনের জমির মত ডিলিবন্দী গাছ। রাশি রাশি বেলফুল ফুটত। জবা টগর করবী কামিনীও ফুটত অনেক। এরই মধ্যে এই মাঝের রাস্তাটির ধারে ছিল একটি গোলাপের গাছ। কৃষ্ণাভ লাল ভেলভেটের মত রঙের ফুল ফুটত। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ। তার বাবা রাধাকান্ত নিজের হাতে বাগান করেছিলেন। তাদের বাগান থেকেই গ্রামের দেবমন্দিরের পূজার ফুল তুলে নিয়ে যেত পূজকেরা। ইষ্টপূজার জন্যও ফুল নিয়ে যেত অনেকে। কোন নিষেধ ছিল না। শুধু এই গোলাপ ফুলের উপর নিষেধ। এই ফুল তুলতে কাউকে দিতেন না রাধাকান্তবাবু। একদিন এই গোলাপ ফুল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন গোপীচন্দ্র-বাবু। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন। তাঁর সামনে ফুলদানিতে সাজাবার জন্য এবং সাহেবের কোটে গুঁজে দেবার জন্য চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। তিনি জানতেন না রাধাকান্তের নিষেধের কথা। রাধাকান্ত গোপীচন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি। বলতে পারেন

নি—দেবতার পূজার জন্যও যে ফুল আমি তুলতে দিই না, সেই ফুল কি ক'রে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য দেব ? বিশেষ ক'রে যে মানুষ বিধর্মী—যে বিধর্মীদের অস্পৃশ্য ব'লে মনে করেন তিনি ?

বলতে পারেন নি, ফুল তুলে দিয়েছিলেন। গাছটার কুঁড়িগুলিও রাখেন নি। তারপর এই মমতার মূলোচ্ছেদের জন্য, তাঁর ভীরুতার প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের হাতে গাছটি কেটেই নিরস্ত হন নি ;—মাটি খুঁড়ে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সংবাদটা চাপা থাকে নি। প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। প্রকাশ হয়েছিল গৌরীকান্ত এবং অতুলের গোলাপের ডাল নিয়ে ঝগড়ার ফলে। অতুল চেয়েছিল গোলাপের কাটা ডাল নিয়ে যেতে ; তার বাড়িতে কলম কেটে পুঁতবে। গৌরীকান্ত দেয় নি। সে জানত, তার বাবা বলেছিলেন—ওই ডাল'যেন আর কেউ না লাগায়। নির্মূল হয়েছে, এইবার শুকিয়ে নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হোক। সেই ঝগড়াতেই গৌরীকান্তের দুটি হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তারই ফলে প্রকাশ হয়ে গেল—যে ফুল দেবতার পূজার জন্য তুলতে দিতেন না রাধাকান্ত, সেই ফুল বিধর্মী রাজকর্মচারীর মনস্তুষ্টির জন্য দিতে হয়েছে ব'লে রাধাকান্ত গোলাপের গাছটাই কেটে ফেলে দিয়েছেন। সেকালে সকলেরই মন স্পর্শ করেছিল ঘটনাটি। কেবল গোপীচন্দ্র ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন নি। ক্ষুব্ধ হ'লেও মহৎ গোপীচন্দ্র আত্মসম্বরণ করেছিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্র ক্রুদ্ধ হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কানে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন কথাটা। সাহেব সে আমলের সাহেব। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সিপাহীবিদ্রোহ-সাঁওতালবিদ্রোহ-দমনকারী ইংরেজের রাজপ্রতিনিধি। তিনি হুকুম পাঠিয়েছিলেন গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে রাধাকান্তকে প্রকাশ্যে—তাঁর পুলিস দারোগার সম্মুখে।

রাধাকান্ত সে আমলে সাহসী মানুষ ব'লে পরিচিত ছিলেন। লোকে বলত, দেবতা আর গুরুজন ছাড়া মাথা তাঁর মানুষের পায়ে নোয়ায় না। নোয়াতে গেলে কেটে গড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাধাকান্ত মাথা না-নত ক'রে পারলেন না। রাজভয়ে তিনি

ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর মামার বাড়ি ছিল পশ্চিম বীরভূমে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের ইতিহাসে গ্রামখানি চিহ্নিত গ্রাম। বিদ্রোহ দমনের সময় গ্রামখানিতে ইংরেজ পল্টনের ছাউনি পড়েছিল। ইংরেজ পল্টনের সেই বিদ্রোহ-দমনের ভয়ঙ্করত্ব দীর্ঘকাল সেখানকার অধিবাসীদের দুঃস্বপ্নবিহ্বলের মত ভয়াতুর ক'রে রেখেছিল। রাধাকান্তের মাতামহীও সেই দুঃস্বপ্নস্মৃতি বহন করতেন। বালিকা-বয়সে তিনি চোখে দেখেছিলেন এই বিদ্রোহ-দমন। বাল্যকালে সেই দুঃস্বপ্নের কথা রাধাকান্ত শুনেছিলেন তাঁর কাছে। বর্ষণমুখর রাত্রে মাতামহীর কোলের কাছে শুয়ে ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বিনিদ্র বিস্ফারিত চোখে চেয়ে শুনে যেতেন নির্বাক হয়ে। গ্রামপ্রান্তে ময়ূরাক্ষীর গর্জনও তিনি শুনতে পেতেন না ভয়বিহ্বলতায়। সেই ভয়কে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনি গোপীচন্দ্রের কাছারিতে গিয়ে সর্বসমক্ষে হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার অন্যায় হয়েছে। গোলাপ গাছটি কেটে আপনাকেই অসম্মান করেছি আমি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

এইখানেই শেষ নয়।

কিছুদিন পর সাহেব নিজে এলেন এখানকার ইস্কুল-বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য। সভা হ'ল। চায়ের মজলিস বসল। সেই মজলিসে ব'সে সাহেবের আবার মনে পড়ল এই কথাটা। তিনি ডাকলেন রাধাকান্তবাবুকে। ভীত হয়ে রাধাকান্ত সামনে দাঁড়ালেন। সাহেব খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রাধাকান্ত বললেন—হুজুর, আমি অসুস্থ। মিথ্যা তিনি বলেন নি, অসুস্থ তিনি ছিলেন।

সাহেব প্রশ্ন করলেন—হোয়াট ?

—আমি অসুস্থ।

—অসুস্থ ? তুমিই তো সেই রাধাকান্ত ?

—হ্যাঁ হুজুর, আমি সেই হতভাগ্য।

—হোয়াট? হোয়াট ইজ দিস হটভাগ্য?

ইংরিজীতে পণ্ডিত অমরচন্দ্র—গোপীচন্দ্রের শ্যালিকাপুত্র—তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অর্থ। সাহেব হেসে কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলেন—আমি ডুঃখিট। কিন্তু তার প্রটিকার আমার হাটে নাই, ইউ সি। কিন্তু টুমি গোপীচন্দ্রবাবুর কাছে অ্যাপলজি চাহিয়াছে?

রাধাকান্ত অসহনীয় ক্ষোভে সর্বসমক্ষে বলেছিলেন—করেছি, এবং আপনার সমক্ষে এই সভাস্থলে আবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি রাজপ্রতিনিধি; পৃথিবীতে দেবতার পরই বলবান রাজা। রাজশক্তিকে অমান্য করাও প্রজার পক্ষে অন্যায় আইনবিরোধী। সেই শক্তিবলে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন আবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সাহস নেই, আমি দুর্বল, আমি কাপুরুষ। গোপীচন্দ্রবাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সভাস্থল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। এর কয়েকদিন পরই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন।

এই কাহিনী—এই স্মৃতি কি ভুলবার?

মোড় ফিরল বংশের গতির। ভোগী বিষয়ী সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করলে। তার সন্তান গৌরীকান্ত। সেও একদিন এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল।

আবার ডেকে উঠল পাখীরা। আবার। আবার।

গৌরীকান্তের ওই চিন্তায় ছেদ পড়ল।

কলরব উঠছে। হুলুধ্বনি পড়ছে। তামসীর শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। মাতৃগর্ভের রক্তচর্চিত ললাটখানি তার দেখা যাচ্ছে।

নূতন বৎসরের সূর্যোদয় দেখবার জন্য সে পথে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে দুর্গাদাইকার দীঘির পাড়ের উপর গিয়ে দাঁড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার একটি ছোটখাট সৌম্যদর্শন গৌরবর্ণ মানুষকে। গৌরবর্ণ বললেও বোধ করি সন্তোষ পিসেমশায়ের রঙের

কথা ঠিক বলা হয় না—সে যেন কাঁচা সোনার মত রঙ। তার ... বলতেন—আপনার নাম সন্তোষ না হয়ে প্রসন্ন হ'লেই ঠিক হ'ত। প্রসন্নবাবু কে?—এ প্রশ্ন কেউ করলে অনায়াসে বলা যেত, চেহারা দেখে বেছে নাও।

সূর্য অভ্যুদয়ে উঠতেন সন্তোষ পিসেমশায়। প্রাতঃকৃত্য সেরে ফুলের সাজি এবং আঁকশি হাতে বেরিয়ে পড়তেন। দাঁড়াতেন গিয়ে ওই দুর্গালাইকারের পাড়ের উপর। সূর্য যখন উঠত এবং যতক্ষণ উঠত ততক্ষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আরক্ত সূর্যের দিকে চেয়ে স্তব পাঠ করতেন। তারপর ওই লাইকারের পাড়ের উপর বেলগাছ থেকে বেলপাতা পেড়ে নিয়ে আসতেন তাদের বাড়ি, ফুল তুলতেন।

তার বাবা দাঁড়িয়ে থাকতেন দাওয়ার উপর। তিনি সহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতেন—আসুন, আসুন। অন্তরে আসন গ্রহণ করুন।

সে আমলের বাক্যালাপের এই ছিল ধারা, এরই মধ্যে ছিল সে আমলের রুচি অনুযায়ী বৈদগ্ধ্য। সন্তোষ নাম—তাই বলতেন ঐ কথা।

সন্তোষ পিসেমশায় হেসে উত্তর দিলেন—বাঁড়ুজ্জে, ধনকামী যশোকামী প্রতিষ্ঠাকামীদের অন্তরে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ আমার প্রকৃতি শীতল, স্বভাব কোমল, বর্ণে শুভ্র; আর এই সব কামীদের অন্তর কামনা-বহ্নিতে অহরহ বহ্নিমান; সেই হেতু সেখানে প্রবেশ মাত্র আমার অপমৃত্যু ঘটে, পুড়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাই।

সন্তোষ পিসেমশাই ছিলেন এখানকার অন্যতম জমিদার স্বর্ণবাবু—গৌরীকান্তের গ্রামসম্পর্কে স্বর্ণকাকা—তাঁর ভগ্নীপতি; ঘরজামাই ছিলেন। সে আমলটাই ছিল ঘরজামাইয়ের আমল। সন্তোষ পিসেমশাই ঘরজামাই হ'লেও শাস্ত্রজ্ঞ ভাবুক মানুষ ছিলেন।

স্বর্ণবাবুকে মনে পড়ছে।

লোকে সেকালে বলত—সাক্ষাৎ অভিমানী দুর্যোধন। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী না-দেবার পণ ক'রে আজীবন মামলা ক'রে গেছেন গোপীচন্দ্রের সঙ্গে। জেদী, দুর্দান্ত মানুষ। তেমনি ছিল ভোগে আসক্তি। মধ্যযুগের ধনী-সন্তানদের সমস্ত দোষগুণ নিয়ে পাথরের ভৈরব মূর্তির মত মানুষ ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে স্বর্ণবাবুর পাশে প্রায় অহরহ থাকত তিনটি মানুষ। জনাব রাজমিস্ত্রী, নোটন বাউরী, নাসের সেখ। স্বর্ণবাবুর জন্য প্রাণ দিতে পারত তারা। স্বর্ণবাবুর আদেশ পালন করতে কোনদিন ধর্মাধর্ম ন্যায়-অন্যায় কিছুর বিচার করে নি।

মনে পড়ছে গবিনসিংকে। সেও ছিল স্বর্ণবাবুর অনুগত। হিন্দুস্থানী গবিনসিং দীর্ঘকাল স্বর্ণবাবুদের বাড়ীতে চাকরি ক'রে শেষে এখানেই বাস করেছিল। গবিনসিংয়ের স্ত্রী বেগুনি, ফুলুরি, সিঙাড়া ভেজে বিক্রি করত। ধান ওঠবার সময় তৈরী করত পুয়ো, পালো—চাষীদের প্রিয় খাদ্য। পয়সা নিয়ে বিক্রি করত না, ধান নিয়ে বিক্রি করত। ভদ্রঘরের ছেলেরাও ধান কুড়িয়ে সেই ধান দিয়ে পুয়ো-পালো খেত।

সারি সারি মানুষ এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে মনের মধ্যে। অবজ্ঞাত, অখ্যাত, যাদের অস্তিত্ব হয়তো বিলুপ্ত হয়েছে তাদের মৃত্যুর সঙ্গেই, নয়তো জরাগ্রস্ত হয়ে ঘরের দাওয়ায় ব'সে ধুঁকছে। তাতেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জীবিতেরা বিস্মৃতপ্রায়।

সৃষ্টিধর বাউরী—ছিষ্টে বাউরী তাদের সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে। তার পিছনে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ, হেবো, গোপাল, পুলিন, কুঞ্জ, দৈতোকুঞ্জ, নন্দলাল, মাধব, তিলক, কালাচাঁদ, ছবিলাল, বৃন্দাবন, হাঁপানির রোগী উপেন, অভিলাষ, সাতকড়ি, বাউরীদের সাত ভাই সারি বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। পরীকে মনে পড়ল। ওদের সকলের পিছন থেকে মাদকতাময় হাসি হেসে পরী এসে সবার সামনে দাঁড়াল। সাতকড়িদের বোন পরী। কষ্টিপাথরের মত কালো, স্বর্গের পরীর মতই দেহসৌষ্ঠব,

কোঁকড়ানো চুল, ডাগর টানা চোখ, বাঁশীর মত নাক। লোকে বলত—লালপরী নীলপরীর মত কালোপরী। সারাটা গাঁয়ে উল্লাস-উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণাবর্ত তুলেছিল পরী।

অটল বাউরীর মেয়েরাও ছিল এই রকম। তাদের নাম গৌরীকান্তের মনে নেই। গোপাল বাউরীর দুই বোন ছিল এই রকম। পঞ্চি আর খুকী।

হঠাৎ কার গানের সুর এসে তার কানে পৌছল। উৎকর্ণ হয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

একখানি একতলা বাড়ির ভিতর থেকে গান ভেসে আসছে। বাড়িখানি গৌরীকান্তের কাছে নতুন। এ বাড়ি সে দেখে যায় নি। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে তার বুঝতে বাকি রইল না কিছু।

কিশোরবাবুর কণ্ঠস্বর। এ বাড়ি তা হ'লে কিশোরবাবুর। কিশোরবাবুদের পুরানো বাড়ি তার বাড়ির পাশেই। এ বাড়ি কিশোরবাবু নতুন করেছেন।

কিশোরচন্দ্র এককালে ছিলেন নবগ্রামের তরুণ নায়ক।

সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরবাবু। রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। কিশোরবাবু আর তার বাবা রাধাকান্ত একই রাত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। অথচ পরস্পরের সংবাদ দুজনের কেউ জানতেন না। রাধাকান্ত বেরিয়েছিলেন পদব্রজে পূর্বমুখে গঙ্গাতীর অভিমুখে, আর কিশোর গিয়েছিলেন পশ্চিমমুখে; জংশন স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধ'রে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন নবযুগের মহামন্ত্রে দীক্ষা নিতে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নতুন তন্ত্রে।

রাধাকান্ত আর ফেরেন নি, কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। কিশোরচন্দ্র ফিরে এসেছিলেন গ্রামে। ফিরে এসেছিলেন ওই নতুন তন্ত্রের বাণী বহন ক'রে, এখানে সেই বাণী বিতরণ করতে। তারপর—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে গৌরীকান্ত।

এগিয়ে চলল সে।

থাক্। এখন সকলের কথা থাক্। নতুন বৎসরের প্রভাত। ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেছে। স্বাধীন দেশের আকাশে প্রথম নববর্ষের সূর্যোদয়। পাখীরা ঘন ঘন কলধ্বনি তুলেছে। দুটো চারটে কাক উড়ে এসে ঘরের চালের উপর বসছে। একটা দুটো কোকিল্ ঘনবিন্যাসে কুহুধ্বনি দিয়ে উড়ে চ'লে গেল পলাতকের মত।

সে এসে দাঁড়াল দুর্গাপাটকারের পাড়ের উপর। এই পুষ্করিণীতেই ভরা হয় দুর্গাপূজার ঘটকুম্ভ। শারদ সপ্তমীর প্রসন্ন-আলো-ঝলমল প্রভাতে সমস্ত গ্রামের মানুষেরা উৎসববেশে সজ্জিত হয়ে ঢাক ঢোল শিঙা সানাই কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়। পুরোহিত ঘাটে দীঘির জলে নেমে পুণ্যতোয়া নদীমহিমা এবং সপ্তসমুদ্র-মহিমাকে আহ্বান ক'রে ঘট পূর্ণ করেন। মিছিল দাঁড়িয়ে থাকে মহাবৃদ্ধ বটবৃক্ষের ছায়ায়।

কিন্তু কই? সে বটগাছটা কই? ওটা তো সেটা নয়। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে আবছা অন্ধকারের মধ্যেও পাণ্ডুর আকাশের পটভূমিতে বৈশাখের খণ্ড মেঘের মত তার বিশাল ছত্রশোভাকে প্রতিফলিত দেখেছে। সে কি এইটা? হ্যাঁ, এইটাই তো। এটা কিন্তু সেই মহাপ্রাচীন বৃদ্ধ বট নয়। এটা আর একটা। হ্যাঁ, একে সে যখন শেষ দেখেছে তখন এ ছিল অনেক ছোট। এ গাছটার কৈশোর না হোক, প্রথম যৌবন সে দেখেছে। সেই গাছ এত বিশাল হয়েছে? কিন্তু সে মহাজন কোথায়? ওইখানে ছিল সে। তার চিহ্ন নেই। চিহ্নের মধ্যে মস্ত বড় একটা গর্ত রয়েছে।

বিচিত্র দৃষ্টিতে সে সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে রইল। কাটে নি কেউ। ও বৃক্ষকে কেউ কাটবে না—এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত। তা হ'লে ঝড়ে পড়েছে। সম্ভবত উনিশ শো বিয়াল্লিশের সাইক্লোনে। তাই হবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে।

সূর্য উঠছে। স্বাধীন দেশের প্রথম নববর্ষের সূর্য! ইংরিজী নববৎসরও একটি এসেছে এর মধ্যে, কিন্তু তাকে ঠিক নিজের ব'লে গ্রহণ করতে পারে নি গৌরীকান্ত। শুধু গৌরীকান্ত কেন; এদেশের অধিকাংশ মানুষই পারে নি। কিছু মানুষ অবশ্য আছে, যারা মনের দিক দিয়ে বর্ণসঙ্কর—তাদের কথা স্বতন্ত্র।

আবার একটি গানের সুর কানে এল। অনেকগুলি শিশুকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতের সুর। পিছনের দিক থেকে আসছে। ফিরে তাকালে গৌরীকান্ত।

ছেলেমেয়েদের—না, শুধু মেয়েদের একটি মিছিল আসছে। তারাই আসছে গান গেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান—

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।"

কিশোরী এবং বালিকাদের মিছিল। পরনে বেশীর ভাগ লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সাদা জামা, এলোচুল—সারি বেঁধে গান গেয়ে এই দিকেই আসছে। চমৎকার লাগছে। ভারি ভাল লাগছে। স্বাধীনতার প্রথম নববর্ষে এই মিছিল একটা নতুন ইঙ্গিত নিয়ে আসছে যেন।

নববর্ষের মিছিল নবগ্রামেও তা হ'লে এসেছে! আসবে বইকি। দীর্ঘকাল ধ'রে নবগ্রাম এ অঞ্চলের মানুষের জন্য বহন ক'রে নিয়ে আসে নূতনের ধারা—নূতনের বাণী, নূতনের অভিশাপ, নূতনের উন্মত্ততা, ভাল মন্দ দুই-ই নিয়ে এসে এখানকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওই কিশোরচন্দ্র একদিন এনেছিলেন—এমনি নূতনের বাণী, নূতনের মন্ত্র।

হঠাৎ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল গৌরীকান্ত, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; পুলকদীপ্তির আলো জ্ব'লে উঠল তার দৃষ্টির মধ্যে। ও কে ?

ওই যে মেয়েদের মিছিলের পাশে থেকে মিছিল পরিচালনা করছে, ওই যে খদ্দরের লালপাড় শাড়ি পরনে, লালপাড়ের বর্ডার দেওয়া খদ্দরের ব্লাউস গায়ে—ওই যে মেয়েটি, ও কে ? শান্তি ? শান্তি নয় ?

হ্যাঁ, শান্তিই তো ! ওই তো তার রিমলেস চশমায় আলোর ছটা পড়েছে। ওই তো শ্যামবর্ণের শীর্ণাঙ্গী মেয়েটি সেই ডান হাতের তর্জনী হেলিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। শান্তিই তো। দীর্ঘ দশ বৎসর পর শান্তির সঙ্গে দেখা।

শান্তিও থমকে দাঁড়াল। স্মিতবিস্ময়ে শান্তির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন মুহূর্তে প্রদীপ জ্ব'লে উঠল। শান্তির মুখখানির ওইটুকুই বিশেষত্ব। আনন্দে প্রদীপের মত জলে, বিষণ্ণতায় বেদনায় দমকা বাতাসে বাসি পদ্মফুলের দলের মত মুহূর্তে ঝরঝর ক'রে ঝ'রে যায়।

—গৌরীদা !

শান্তি ডাকলে। তারও মুখে চোখে কণ্ঠস্বরে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আনন্দের বিদ্যুৎদীপ্তি।

—শান্তি !

—হ্যাঁ। এখানে আমি যে ইস্কুলে চাকরি করি।

তিন

ঢাকা বিক্রমপুরের মেয়ে নবগ্রামে এসেছে চাকরি নিয়ে। বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু তবুও প্রথমটায় চমক লাগে বইকি। সেই কথাই গৌরীকান্ত বললে, বিস্ময়ের কিছু নেই, তবুও অকস্মাৎ তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

শান্তি তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় নিয়ে প্রণাম করলে। তারপর বললে, আপনার এখানে বাড়ি, এ-গ্রামের ঘরছাড়া ছেলে

গৌরীকান্ত—আমাদের গৌরীকান্তদা, বাংলা দেশের প্রিয় লেখক গৌরীকান্ত, তা অবশ্য আমি এখানে এসে না-জানা নই। কিন্তু ঘরছাড়ার কাহিনী শুনে ভাবি নি যে, ঘরছাড়া ছেলেটি কোনদিন ঘরে ফিরবে। কতদিন ভেবেছি—। হেসে ফেললে শ্যামবর্ণ মেয়েটি।

—কি ভেবেছ? বল? থেমে গেলে কেন?

—ভেবেছি, ঘরখানা দখল ক'রে নিই। আমরা তো বাস্তহারা।

চকিতে একটা চমকের মত কথাটা গৌরীকান্তের মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়ে গেল। বেদনা অনুভব করলে। কথাটা তার মনেই হয় নি; ঢাকা-বিক্রমপুরের মেয়েটির এখানে আসা—অতি সাধারণ চাকরি করতে আসা নাও হতে পারে; দেশ-বিভাগের ফলে বহু পুরুষের বাসভূমি পরিত্যাগ ক'রে নিরাশ্রয়ের মত, আশ্রয় গ্রহণ করার মত সকরুণ অসহায় আসাও হতে পারে। নইলে শান্তির মত মেয়ের এখানকার সামান্য আপার-প্রাইমারি বালিকা-বিদ্যালয়ে চাকরি করতে আসার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাস না-ক'রে ব'সে থাকবার মত মেয়ে তো নয় শান্তি।

—কিন্তু যে পাহারাদার রেখেছেন! এদিকে কিশোর মামাবাবু—ওদিকে বাস্তু-দেবতার কাচ্চা-বাচ্চা। বাপ, দিনে দুপুরে, বৃষ্টিবাদলে যদি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, তবে ভিতর থেকে গ'র্জে গ'র্জে শাসায়—গোঁ-গোঁ! মা গো, একদিন ভোরবেলা দেখি, এক বৈজিতে আর এক পাহারাদারে লড়াই। ফণা কি! কিন্তু এখন আর নয়। আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি, গ্রাম ঘুরে ইস্কুলে যেতে হবে। সেখানে প্রার্থনা-সভা হবে—তারপর ছুটি।

তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে—এঁকে তোমরা চেন না। আমাদের গ্রামের লোক। মস্ত বড় লেখক। গৌরীদা, নমস্কার কর।

গৌরীকান্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সে ভাবছিল, শান্তির একটা কথা—সাপের কথা। মেয়েদের নমস্কারের উত্তরে

অন্যমনস্কভাবেই প্রতিনমস্কার জানালে। আর একটি তরুণী এবার এগিয়ে এল। ওই ইস্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী। ফিস ফিস ক'রে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলে—গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়? ইনিই? এবার গৌরীকান্তকে সচেতন হতে হ'ল। থাক্ সাপের কথা। সাপ নিয়ে ঘর করা তাদের তিন পুরুষের—তার পিতামহের আমল থেকে।

এদিকে সঙ্গিনীর প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নেড়ে শান্তি জানালে, হ্যাঁ। তারপর হেসে বললে—তিনিই। তোমার সব চেয়ে প্রিয় লেখক।

—আর আপনার?

—আমার তো গৌরীদা। আমার ঘরের লোক। আমি গৌরীদার বই পড়ি না।

—হ্যাঁ। ময়রা-বাড়ির মেয়েরা মিষ্টান্ন খায় না।—এতক্ষণে কথা বললে গৌরীকান্ত।

অন্য মেয়েটি এবার জবাব খুঁজে পেলে, বললে—দেখিয়ে খায় না। কিন্তু লুকিয়ে খায়। যারা কিনে খায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি খায়।

হেসে উঠল তিনজনেই।

ঠিক এই সময়েই আর একটি সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি শোনা গেল। সবল উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীত। ছেলেদের ইস্কুল থেকে আসছে। যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে সিকি মাইল পশ্চিমে খোলা মাঠের ওপারে ছেলেদের ইস্কুল দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল শান্তি।

—এখন চলি গৌরীদা। ছেলেরাও বের হচ্ছে। ওদের সঙ্গে এক জায়গায় হব আমরা অট্টহাসে দেবী-মন্দিরে। যাই এখন। ধর, তোমরা গান ধর। ধর—বেসুরো হচ্ছে। ধরতা ঠিক হচ্ছে না।

শান্তি নিজেই ধরলে—

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়!
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়—
তোমারই হউক জয়!"

মেয়েরা এগিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। ওদিকে ছেলেদের ইস্কুল থেকে মিছিল মাঠের পথে বেরিয়ে পড়েছে। এসে রেল-লাইন ধ'রে ওরা গিয়ে উঠবে অট্টহাসের দেবী-মন্দিরে। এক-কালে নাকি অট্টহাসই ছিল এখানকার আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রী আসত। সেই থেকেই সেকালে একটি নতুন বসতির সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন বসতি, তাই নাম নবগ্রাম। সেইখানেই ওরা যাবে। কিন্তু আজ আর ওই দেবীর মহিমা গান গেয়ে ওরা যাচ্ছে না। নূতন কালের নূতন প্রভাতের গান গেয়ে চলছে। ছেলেরাও এই গানটিই গেয়ে চ'লে আসছে। ওদের সর্বাগ্রে একটি ছেলের হাতে রয়েছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা।

বেশ লাগছে। একটা আশা জাগছে।

—গৌরীদা! শান্তি ফিরে এসে তাকে ডাকলে।

—ফিরে এলে?

—এলাম। নিমন্ত্রণ করতে এলাম। বৎসরের প্রথম দিন, আপনি আমার ওখানে খাবেন।

হেসে গৌরীকান্ত বললে—নববর্ষের প্রভাত সুপ্রভাত, তাতে সন্দেহ নেই। এমনি ভাবে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন যদি এই শুভারম্ভের কল্যাণে নিমন্ত্রণ পাই, তবে বেঁচে যাই। তাই হবে।

শান্তি চ'লে গেল।

* * *

ঢাকা-বিক্রমপুরের মেয়ে, এক দেশকর্মীর ভাগ্নী। সারাটা জীবন এই মানুষটি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। একটানা নির্যাতন ভোগ করেছেন হাসিমুখে। একদিন এক মুহূর্তের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, অনুশোচনা করেন নি, ক্লান্তিবোধও বোধ হয় করেন নি কোনদিনও; ভিতরে অনুভব করলে তাকে প্রশ্রয় দেন নি তিনি। লোকে বলত—তাঁর চামড়ার দাগ মিলিয়ে গেছে বটে, কিন্তু হাড়গুলি কালসিটে প'ড়ে কালো হয়ে গেছে। কোন কালে এই মানুষটি ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় এসে বসেন নি। সে বসলে তিনি বিখ্যাত নেতা হয়ে বসতে পারতেন। ঢাকা শহরেও তিনি থাকতেন না। থাকতেন গ্রামে। মধ্যে মধ্যে ধরপাকড়ের সময় আত্মগোপনের জন্য ঢাকায় বা কলকাতায় বা অন্য কোথাও থেকেছেন—সেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আর গ্রামের বাইরে থেকেছেন বন্দী-জীবনে—জেলখানার শক্ত উঁচু পাঁচিলের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ।

হঠাৎ একদিন—ইংরেজ সরকার তখন তার দমননীতি শিথিল করেছে, দেউলী বন্দীশিবির থেকে বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছে—একদিন গৌরীকান্তের আস্তানায় এসে উপস্থিত হলেন এই মানুষটি। তার লেখা প'ড়ে লেখককে দেখতে এসেছেন—আলাপ করবেন। গৌরীকান্ত তখন যেখানে থাকে, তাকে বাসা বলা চ'লে না—মেসও নয়, হোটেলও নয়, তার নাম ঠিক বলা যায় না, বলতে হ'লে আস্তানাই বলতে হয়। দক্ষিণ কলকাতায় একটা কয়লার ডিপো, মুদীর দোকান এবং গরুর খাটালের পিছন দিকে টিনের চাল টিনের দেওয়াল একটা কুঠরি। মেঝেটা অবশ্য পাকা। কল ছিল না, বাথরুম পাইখানাও না, তবে ইলেকট্রিক লাইট ছিল। ভাড়া ছিল পাঁচ টাকা। লম্বা ফালি একটা গলিপথ অতিক্রম ক'রে পৌছতে হ'ত। সেদিন এই গলিপথে ছ ফুট লম্বা এই মানুষটিকে দেখে গৌরীকান্ত বিস্মিত না হয়ে পারে নি। তারপর একটু শঙ্কিত হয়েছিল। কাগজের সম্পাদক নয়তো? কাগজের সম্পাদকের আগমন লেখকের পক্ষে সম্মানের কথা, আশার কথাও বটে।

কিন্তু বেশভূষা দেখে, মুখের চেহারা দেখে এই মানুষটিকে স্বচ্ছল অবস্থার কোন কাগজের সম্পাদক ব'লে ভুল হবার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না। পাঁচ টাকা ঘর ভাড়া এবং দৈনিক আট আনা হিসাবে খাদ্য—খরচ পনরো টাকা, তার উপর ট্রাম বাস বিড়ি ইত্যাদিতে গোটা আষ্টেক—একুনে আটাশ টাকা রোজগার যার হয় না, তার পক্ষে বিনা পয়সায় লেখা দেওয়া আদৌ শঙ্কার কথা অবশ্য নয়, কিন্তু গৌরীকান্ত তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—বিনা দক্ষিণায় লিখবে না। দক্ষিণা অবশ্য গল্প-পিছু পাঁচ টাকা। বড় কাগজের কাছে দাবি দশ টাকা।

তবুও ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ডেকে ঘরের মধ্যে ভদ্রতা ক'রে বসাতে হয়েছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকে দেখে প্রথমেই বলেছিলেন—যেমনটি ভেবেছিলাম তেমনই। লেখা প'ড়ে মনে মনে একটা ছবি এঁকেছিলাম। মিলছে সেটা। সব মিলছে। এমন দারিদ্র্য না হ'লে, কৃচ্ছ্র সাধন না থাকলে এমন লেখা হয় না।

ধীরে ধীরে পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় যত গাঢ় হয়েছিল, গৌরীকান্তের বিস্ময়-শ্রদ্ধাও হয়েছিল তত গভীর থেকে গভীরতর। মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরবার পথে কলকাতায় সেবার তিনি পনরো দিন ছিলেন। এগারো দিন তিনি গৌরীকান্তের কাছে এসেছিলেন। তার বইগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, আবার নিন্দায় নির্মম! নতুন লেখকের আকৃষ্ট হবার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু এর উপরেও ছিল কি গভীর জ্ঞান তাঁর দেশ সম্পর্কে! কি বিশ্বাস! জীবনের সাধনা সম্পর্কে কি নিষ্ঠা! ইউরোপের জীবনদর্শন থেকে ভারতের জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা গৌরীকান্তের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বলেছিলেন—ঘর তৈরি কর, নগর তৈরি কর, দশতলা বিশতলা পঞ্চাশতলা—যোজনবিস্তার নগর তৈরি কর, ইউরোপের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত কর, কিন্তু গাছতলা আর গুহাকে ভুলো না। সেই গাছতলার ছায়ার আবছা আভাস তোমার লেখার মধ্যে পেয়েছি ব'লেই ভাল লেগেছে, পড়েছি। নইলে গল্প উপন্যাস আমি বড় পড়ি না।

প্রশংসায় লজ্জিত না হ'লেও, বিনম্র না হয়ে মানুষ পারে না। গৌরীকান্ত লজ্জিতই হয়েছিল, নিরুত্তর হয়েই বসেছিল।

নন্দলালবাবু হেসে বলেছিলেন, ক্যাম্পে তোমার লেখা নিয়ে আলোচনা হ'ত, আরও অনেকের আলোচনা হ'ত ; কিন্তু ওসবের মধ্যে আমি বড় যেতাম না। অন্য সকলের ভাল-লাগা থেকে আমার ভাল-লাগার অনেক তফাত আছে। কিন্তু আমার ভাগ্নী শান্তি যখন চিঠিতে লিখলে—'মামা, তুমি নতুন লেখক গৌরীকান্তর লেখা প'ড়ো। নিশ্চয় ভাল লাগবে তোমার। আমার খুব ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে ব'লে একখানা বই তোমাকে পাঠালাম। নিশ্চয় ক'রে প'ড়ো যেন!' বই পড়লাম—প'ড়ে সত্যিই ভাল লাগল। জান, ভাল না-লাগলে মুখের খাতিরে ভাল বলার মানুষ আমি নই। ও-মুখের ওপরেই ডুম ক'রে ব'লে দি—ভাল না তোমার লেখা। বাজে।

সেই দিন শান্তির নাম প্রথম শুনেছিল গৌরীকান্ত।

সংসার-সম্পর্কে উদাসীন এই সন্ন্যাসী মানুষটি শান্তির পরিচয় দিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। এমন গুণের মেয়ে, এমন দুরন্ত মেয়ে, এমন শান্ত মেয়ে, এমন কঠিন শাসনকর্ত্রী মেয়ে আর হয় না। শান্তির মত সাহিত্যবোধ তিনি আর দেখেন নি। শান্তির মত সাহসিনী আর হয় না। বলেছিলেন—দেখ, আমি তো এই মানুষ, আগুন নিয়ে আমার খেলা, সংসার দেখবার আমার সময় নেই। রুচিও নেই, দেখিও না কোনদিন। সব দেখে ওই শান্তি। কিছু জমি আছে, কিছু খাজনা পাই। শান্তি বড় হয়ে অবধি ওই সব দেখে শুনে নেয়। একাই চ'লে যায় জোতদারের বাড়ি। প্রজাদের খাজনা—তাও আদায় করে। এরই মধ্যে পড়েছে। আমি ডিটেনশনে ছিলাম, শান্তিই সংসার দেখেছে। আমার দিদি—তিনি বাতে পঙ্গু, তাঁর সেবা সেই করে।

সে প্রায় এক ঘণ্টা গুণবর্ণনা ক'রে বলেছিলেন—মেয়েটার রঙটা শুধু ময়লা, নইলে শ্রী যা তাতে রঙ ফরসা হ'লে রাজরাণী হতে পারত।

নন্দলালবাবু দেশে চ'লে গিয়েও চিঠি লিখতেন। তার সঙ্গে শান্তির চিঠি আসত। লেখার সমালোচনা ক'রে পাঠাত। হাজারও প্রশ্ন করত।

তার পর, মাস কয়েক পর হঠাৎ নন্দলালবাবু এলেন কলিকাতা। সঙ্গে এল শান্তি। এসেই সেদিন প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিল সে। গৌরীকান্ত সেই সময়ে একটা গল্প লিখেছিল—গল্পটি তার একটি বিখ্যাত গল্প। একজন কুষ্ঠ-রোগগ্রস্তের স্ত্রী—স্বামীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা, সেই ভালবাসায় ঘৃণাকে জয় ক'রে ভয়কে অতিক্রম ক'রে তার সেবা ক'রে যেত। লোকে অবাক হয়ে দেখত। বিস্ময় মানত। সেই মেয়ে হঠাৎ একদিন দেখলে, তার হাত-পায়ের আঙুলগুলি ফুলেছে—তৈলাক্ত আঙুলের মত চকচকে একটা আভা দেখা দিয়েছে। আয়নায় দেখলে, মুখেও যেন তাই। নাকটা যেন মোটা দেখাচ্ছে। কানও ফুলেছে। আয়নাখানা সে আছড়ে ভেঙে দিলে। তারপর মনে হ'ল, তার গা থেকে যেন কুষ্ঠরোগীর গায়ের গন্ধের মত গন্ধ পাচ্ছে সে। সমস্ত রাত্রি সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল আকাশপানে চেয়ে; হঠাৎ এক সময় বুক ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। তারপর উন্মত্তের মত ভাবতে শুরু করলে দেবদেবীর ছবি। স্বামী এল সান্ত্বনা দিতে। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর উপর—তাকে সে হত্যা করবে। এর পরও আছে। কিন্তু শান্তির ঝগড়া সেটুকু নয়। ঝগড়া এইটুকু নিয়ে। কেন? কেন গৌরীকান্ত এমন গল্প লিখেছে? স্বামীকে যে এত ভালবাসত, সে এমন করতে পারে না। এ হতে পারে না। ভালবাসা এত ভঙ্গুর নয়।

গৌরীকান্ত বলেছিল—এই বাস্তব। এ আমার চোখে দেখা ছবি।

—সে দেখা মিথ্যে দেখা। আর সাহিত্যের বাস্তবও এ নয়। তা ছাড়া মেয়েদের মন-চরিত্র আপনারা—পুরুষেরা জানেন না। বুঝতে পারেন না। আমার মাকে আপনি দেখেন নি। কুলীনে বিয়ে হয়েছিল। সমস্ত জীবন আমার বাবা এক জমিদারের বাড়ি ঘরজামাই ছিলেন।

আমার মাকে কোনদিন চোখে পাড়েন নি। বৃদ্ধবয়সে ঘরজামাই বাবা পালিয়ে এলেন। শালাদের আমলে টিঁকতে পারলেন না। এলেন মায়ের কাছে। আমার মামা—ওঁ তো, ওঁর সামনেই বলছি—প্রথমটা প্রসন্ন হন নি। আমার মাও হন নি। তবু কর্তব্যের খাতিরে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর মা তাঁকে ভালবাসলেন। সে ভালবাসায় সব বিসর্জন দিলেন। ভাইয়ের বোন হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দেশের কাজ করতেন। উগ্রপন্থী ছিলেন। ভালবেসে সে সব ছাড়লেন। বাবা নেই, কিন্তু আজও সে ভালবাসা ম্লান হ'ল না। বাবা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ; মূর্খ ছিলেন না। নিজের ধর্ম ছেড়ে মা বাবার ধর্ম নিয়েছিলেন, সেই ধর্মকে আঁকড়ে ধ'রে আছেন।

চোখ মুখ উচ্ছ্বাসে থমথম ক'রে উঠেছিল।

নন্দলালবাবু কৌতুকে হেসেছিলেন সারাক্ষণ। হঠাৎ মামার দিকে তাকিয়ে তাঁকে হাসতে দেখে শান্তি ব'লে উঠেছিল—তুমি হাসছ মামা? তুমি হাসছ?

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল শান্তি। নন্দলালবাবু বুঝিয়ে শান্ত করতে পারেন নি। শান্ত করেছিল গৌরীকান্ত। সে আলোচনার জের টানার ছল ক'রে বলেছিল—আপনার একটা কথা কিন্তু মাথা হেঁট ক'রে মেনে নিচ্ছি আমি। বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, সেই ঘটাটাই সাহিত্যের সত্য নয়। সাহিত্যের সত্য সত্যিই স্বতন্ত্র। যা হ'লে ভাল হ'ত—যা মানুষ হতে চায়—তাই সাহিত্যের সত্য। প্রেমকে সে সেই আদি কাল থেকে চেয়ে এসেছে, আজও সে তাকে চায়। এ সংসারে নিরেনব্বুই জনের বাস্তবে যাই ঘটুক, একজনের বাস্তবেও প্রেম সত্য হ'লে মানুষের ওই চাওয়ার জন্যই সে সাহিত্যের সত্য। মহাভারতের যুধিষ্ঠির পায়ে হেঁটে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন কি না—এ নিয়ে, বিজ্ঞান ভূগোল নিয়ে, ম্যাপ পেড়ে তর্ক যারা করে, তারা পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক তার্কিক যাই হোক—সাহিত্যের পাঠক নয়, অধিকারীও নয়।

এই শান্তির সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়।

তারপর সেই পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জে নন্দলালবাবুর বাসায়। নন্দলালবাবু নারায়ণগঞ্জে এসে বাস করেছিলেন এর কিছুদিন পর। বিচিত্র মানুষ। হঠাৎ কি উপলব্ধি করলেন তিনিই জানেন, একদিন বর্গাদারদের ডেকে বললেন—দেখ, আমি ভেবে দেখলাম, এ জমি ন্যায়ত ধর্মত আমার নয়, তোমাদের হওয়াই উচিত। তোমরাই জমি চাষ কর, সার দাও। আমার বাপ পিতামহ জমি কিনেছিলেন টাকা দিয়ে, তার জন্য তিন পুরুষ ধ'রে অনেক ফসল পেয়েছি। আর নয়। জমি আজ থেকে তোমাদের।

এই ব'লে তাদের জমি ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলেন ঢাকায়। বর্গাদারেরা খুশী হয়ে নিজে থেকেই কিছু টাকা তাঁকে দিয়েছিল, সেই টাকায় এবং দিদির অর্থাৎ শান্তির মায়ের "কয়েকখানা গহনা বিক্রি ক'রে নারায়ণগঞ্জে তুললেন একটি ছোটখাট বাড়ি। নারায়ণগঞ্জে পৈতৃক কিছু পতিত জমি তাঁর ছিল।

গৌরীকান্তকে নন্দবাবু জানিয়েছিলেন—অবশেষে পৈতৃক ঋণমুক্ত হলাম। এবার সত্যই আমি মুক্ত। এবার নারায়ণগঞ্জে বাড়ি করলাম। শান্তির জন্য দিদির জন্য ভাবনা ছিল, এবার নিশ্চিন্ত হলাম। বাড়ি ক'রে দিলাম দিদির নামে। শান্তি এখানে থেকে কলেজে পড়ুক। মাথা গোঁজবার ঠাঁই হ'ল, ক'রে খাবার মত লেখাপড়া শিখছে, আর চাই কি? আত্মরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষাও আমি তাঁকে দিয়েছি, ছোরা খেলতে জানে, বন্দুক পেলে তাও চালাতে পারবে। আমি নিশ্চিন্ত। তুমি একবার এস। আমাদের দেশ দেখে যাও। আমাদের বাড়ি দেখে যাও। নিশ্চয় আসবে।

সঙ্গে শান্তিও পত্র লিখেছিল। লিখেছিল—এখানে আসুন। ব'সে ব'সে গল্প লিখুন। তার চেয়ে বরং একটা উপন্যাস লিখবেন। খুব ঘন ঘন চা খাওয়াব, তার সঙ্গে আমাদের দেশের খাবার। আর খুব ভাল মাছ খাবেন। আমি খুব ভাল রান্না শিখেছি।

এ নিমন্ত্রণ গৌরীকান্ত উপেক্ষা করে নি। সে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে এক মাস কাটিয়ে এসেছিল। বাসাটি ছিল চমৎকার জায়গায়, একেবারে স্টীমার-ঘাটের কাছে। সম্মুখে বিপুলবিস্তার নদীকে সামনে রেখে বাড়ির বারান্দায় ব'সে গৌরীকান্ত সত্যিই একখানা বড় বই লিখতে শুরু করেছিল। নন্দলালবাবু ঘুরতেন নারায়ণগঞ্জের কলের শ্রমিকদের মধ্যে। তাঁর মনের কাঁটা তখন দিক পরিবর্তন করেছে।

শান্তির তখন কলেজ বন্ধ। সে তখন আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী। তার মা থাকেন দেশের বাড়িতে। পৈতৃক ভিটে তিনি ছাড়তে রাজী হন নি। শুধু ভিটেই নয়—পিতামহ শিব-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভিটেতে, শিবের মাথায় জল দেওয়া ছেড়ে তিনি কি ক'রে আসবেন? নন্দলালবাবু তাতে আপত্তি করেন নি। করবার কারণও ছিল না। দিদি—তাঁর দিদি। দিদি এককালে তাঁর সহকর্মিণী ছিলেন। তিনি জেলে গেলে একা কাজ করেছেন। নিজেও উনিশ শো একুশ সালে জেল খেটেছেন। তার উপর ওখানকার প্রতিটি লোকের ছিলেন দিদিঠাকরুন। প্রবীণেরা বলত—ঠাকুরঝি। অর্থাৎ ঠাকুরমশায়ের পুত্রী।

শান্তি এই এক মাস তার সঙ্গে দিন রাত্রি তর্ক করেছে। লেখা শুনেছে। বার বার চা খাইতেছে, নানারকম খাবার তৈরী ক'রে খাওয়ার জন্যে তাকে বকাবকি করেছে।

এই এক মাসের স্মৃতি তার মনে দীর্ঘকাল শেষরাত্রির আকাশে শুকতারার মত উজ্জ্বল হয়ে দীপ্যমান হয়েছিল। আজ আবার দীর্ঘকাল পরে সেই শুকতারা যেন মনের আকাশে উঁকি মারছে।

এর পর আর একবার শান্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

নন্দলালবাবুকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এনেছিল। নন্দবাবু তখন টি. বি. ধরিয়েছেন। এক তরুণ কর্মী-শিষ্যের সেবা করতে গিয়ে নিজে আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে।

শাস্তির সঙ্গে সেই শেষ দেখা। তার পর আর দেখা হয় নি। তবে কিছুদিন চিঠির আদানপ্রদান ছিল নিয়মিত। নন্দবাবু মারা যাওয়ার পর শান্তি আর একখানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—'গৌরীদা, এবার মাকে নিয়ে সংসারের সকল দুর্যোগের সামনাসামনি দাঁড়ালাম। পাহাড়ের আড়াল ঘুচে গেল। এ সংসারে কেউ নেই যে, আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আশ্রয় দেয়। তবে হার আমি মানব না। সে শিক্ষা মামা আমাকে দিয়ে যান নি।'

সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর গৌরীকান্ত দিয়েছিল, কিন্তু তার উত্তর আর শান্তি দেয় নি।

সেই শান্তি এখানে এসেছে বাস্তহারা হয়ে। সামান্য একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছে।

বিস্ময় একটু লাগছে বইকি!

কিন্তু কে কেঁদে উঠল হঠাৎ? এই শুভ নববৎসরের প্রভাতে কার কি হ'ল? কে কাঁদছে?

চার

কে কাঁদছে? আজ এই নতুন বৎসরের প্রথম প্রভাতে ঠিক সূর্যোদয়ের লগ্নটিতে কার কোন্ সর্বনাশ হ'ল? হতভাগ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জন্ম আর মৃত্যুর আলোছায়ায় বিচিত্র মহাকাল অবশ্য নিরবধি, তার মধ্যে আর নববর্ষই বা কি, উদয়াস্তই বা কি! কিন্তু মানুষের কাছে নববর্ষের একটি বিশেষ মূল্য, বিশেষ অর্থ আছে বইকি! মনটা হায় হায় ক'রে উঠল গৌরীকান্তের। সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল এমনি এক নববর্ষের উদয়ক্ষণে মারা গিয়াছিলেন—নবগ্রামের স্বর্ণবাবুর ছোট ভাই মাণিকবাবু। স্বর্ণভূষণের ভাই মাণিক্যভূষণ। স্বর্ণভূষণের বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। গ্রামখানির মধ্যে সর্বজনপ্রিয় বন্ধুজন হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিগত ত্রুটি, চরিত্রের খুঁত অনেক ছিল; তবুও মানুষের বিপদে-আপদে

এমন বন্ধু আর হয় না। ভদ্রলোক একত্রিশে চৈত্র সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের নিয়ে সঙ্কল্প ক'রে তাস খেলতে বসেছিলেন। সারারাত্রি তাস খেলে জেগে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে সূর্যোদয় দেখবার জন্ম উঠে দাঁড়িয়ে বুকে একটা ব্যথা অনুভব ক'রে ব'সে পড়েছিলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যোদয়ের লগ্নেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

কথাটা মনে প'ড়ে গেল গৌরীকান্তের। উঃ, সে কি কান্না!

এ কান্নাটা কোথায় উঠছে? দিক লক্ষ্য ক'রে গৌরীকান্ত এগিয়ে গেল। এ গ্রামে সে আজ প্রায় অপরিচিত। নিতান্তই আগন্তুকের মত; অনেকে চিনবেই না। দেখেই নি কখনও। যারা দেখেছে, যাদের সে দেখেছে তাদেরও অনেকে চিনতে পারবে না। উনিশ শো আঠারো সাল আর আটচল্লিশ সাল—তিরিশ বৎসর সময় তো কম নয়! মহাকালের হয়তো একটা পলক। এক পলকেই কত শিশু পূর্ণ যৌবনে উপনীত হ'ল, কত যুবা বৃদ্ধ হ'ল, কত রাধা রূপান্তর গ্রহণ ক'রে হৈমবতী হয়ে কার্তিক-গণেশকে কোলে বসাল, কত জন এল, কত জন গেল, কে তার হিসেব রাখে। তবুও এগিয়ে চলল। হাসি আর কান্না—মহাকালের হাসিতে ঝরে মাণিক, কান্নায় ঝরে মুক্তা, এ দুয়ের যা-ই ঝরুক যেখানে, সেখানেই মানুষ ছুটে যায় তাই কুড়িয়ে জীবনসম্পদ সমৃদ্ধ করতে। পরের হাসির সঙ্গে হেসে অপরের কান্নার সঙ্গে কেঁদে মানুষের মন বেঁচে যায়, পরমায়ু পায়।

এগিয়ে চলল গৌরীকান্ত। কান্নাটা উঠছে স্টেশনের ওদিকে। ওদিকের পল্লীটাই গৌরীকান্তের কাছে নতুন। দুর্গালাইকারের উত্তরপ্রান্তে সেকালের গ্রাম শেষ। লাইকারের উত্তর পাড়ে বাউরীপাড়া। তারই কোল ঘেঁষে পথ চ'লে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে ওই নূতন পল্লীটার দিকে। আগে ওখানটায় ছিল পতিত-প্রান্তর। খাঁ-খাঁ করত। বটগাছ ছিল কয়েকটা। তার তিন-চারটেতে ভূতের অপবাদ ছিল। বাউরীদের মেয়েরা বাসন মাজছে লাইকারের ঘাটে। এদের কাউকেই

ঠিক চিনতে পারলে না গৌরীকান্ত। বটতলায় ন্যাংটা ছেলেরা নাচছে। পুরুষেরা কেউ নেই। বোধ হয় খাটতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ একজন বেরিয়ে এল একটা বাড়ি থেকে। এ বাড়িটা কিন্তু বাউরীদের নয়, বায়েনদের। বাউরীপাড়া বায়েনপাড়া একেবারে লাগালাগি। এ বাড়িটা লখাই বায়েনের বাড়ি ব'লে মনে পড়ল গৌরীকান্তের। এ লোকটি কে? অনি নয়? অনিই বটে। লখাই বায়েনের ছেলে অনি বায়েন। গৌরীকান্তের চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সাদা চুল, সাদা গোঁফ, কঙ্কালসার দেহ, গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে, চোখের শুক্লমণ্ডল পীতপাণ্ডুর—কুঁজো হয়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু সে প্রশ্ন করবার এখন ঠিক সময় নয়। অনিও চলেছে ওই কান্না লক্ষ্য ক'রে। গৌরীকান্ত তাকে প্রশ্ন করলে—কে কাঁদছে হে? কার বাড়িতে কি হ'ল?

সে তার দিকে একবার তাকালে—দৃষ্টিতে প্রশ্নও ফুটে উঠল, কিন্তু সে চকিতের মত। তারপর সে বললে—ওই মহাদেব সরকার মশায়দের বাড়িতে লাগছে। মনে নিচ্ছে ওদের সেই রাঁধুনী মেয়েটির গলা। হয়তো তারই ছেলেটা গেল।

মহাদেব সরকার? এ গ্রামের সরকার-বংশের জটিল-প্রকৃতির সেই বিচিত্র লোকটি। ভাল ইংরিজী দরখাস্ত লিখতে পারে মহাদেব সরকার। এই তার শিক্ষার দম্ভ এবং সে দম্ভ তার আকাশস্পর্শী। সরকারী দপ্তরে কেরানী ছিল। এখন সে অবসর নিয়েছে, অবসর নেওয়ার কথা তো অনেক দিন আগে। লোকটি আজীবন বেনামী দরখাস্ত ক'রে এল। প্রতি মাসে একটা বেনামী দরখাস্ত সে করতই। নতুন দরখাস্তের হেতু না পেলে পুরানো দরখাস্তের উপরেই আর একটা দরখাস্ত দিত। সাপের বিষে যার মৃত্যু হয়, তার শবদেহ শেয়াল কুকুর চিল শকুনে খায় না। বিষাক্ত হয়ে যায় তার গলিত মাংস। এ মানুষটাকে এক অদৃশ্য বিষাক্ত সরীসৃপ দংশন করেছে, তার ফলে সমস্ত অন্তরটাই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে।

না। সাপের উপমাটা ঠিক হ'ল না। ক্ষ্যাপা শেয়াল কুকুরের বিষে বিষাক্ত মানুষ। জলাতঙ্ক-রোগাক্রান্ত। জীবনান্ত কাল পর্যন্ত সংসারের প্রতিটি মানুষকে দেখেই শেয়াল কুকুরের আক্রোশে চীৎকার ক'রে তাদের কামড়াতে চায় এবং ওর দাঁতেও সেই বিষ সঞ্চারিত হয়েছে—জলাতঙ্কের বিষ। ওর কাছে চোর নেই, সাধু নেই, মানুষ মাত্রেই ওর শত্রু। দেখলেই দাঁত বের ক'রে আক্রমণ করে। ভরসা শুধু এইটুকু যে, নিজের বিষেই ওর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাহস শক্তি সব পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। তাই নাম দিয়ে দরখাস্ত করতে ওর সাহস নেই। যার যখন প্রতিষ্ঠা বিগত হয়, তারই মনে তখন এই বিষ সংক্রামিত হয়। তার উপর চোখের সম্মুখে অন্য কেউ যখন সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, তখন আর রক্ষা থাকে না। ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে তাকে। কিন্তু এমন ধরনের ক্ষিপ্ততা গৌরীকান্ত আর দেখে নি।

এ কি সেই মহাদেব সরকার? কিন্তু তাদের বাড়ী তো গ্রামের মাঝখানে। এই নতুন পল্লীতে তার বাড়ী কি ক'রে হবে? তাই বা আশ্চর্য কি? ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—এ তো আছেই। এখানে এসে বাস করতে বাধা কোথায়?

—তাই বটে। সরকারবাবুর বাড়ীতেই বটে। অনি বায়েন মাঝ পথেই থমকে দাঁড়াল।

গৌরীকান্ত দেখলে, এবার বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খড়ের চালের বাংলো ধরনের বাড়ীর বারান্দার সামনে একটি জনতা জ'মে রয়েছে।

ওই যে মহাদেববাবু হাত-পা নাড়ছে। অনি ফিরল।

—ফিরলে যে? যাবে না?

—গিয়ে কে গাল খাবে মশায়? ওই বাবুলোকটির গাল ছাড়া তো কথা নাই। বলবে—বেটা হারামজাদ, মজা দেখতে এসেছ? বলতে বলতেই চলতে শুরু করলে অনি।

গৌরীকান্তও এতে দ'মে গেল। সে তো আজ গ্রামে একান্তভাবে অপরিচিত আগন্তুক, তার কি ওখানে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত হবে?

—বাবুমশায়। অনি আবার ফিরে এসেছে।

—আমাকে বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা কথা বলছিলাম। আপনাকে মশায় চেনা-চেনা লাগছে। আপনি—। মাথা চুলকাতে লাগল সে।

—তোমার নাম তো অনি? অনি বায়েন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তা হ'লে আমাদের বাড়ুজ্জে-বাড়ীর গৌরীবাবু? ইয়ে বাবু মশায়ের ছেলে?—স্বর্গগত রাধাকান্তবাবুর না ম ধরবে না অনি।

—হ্যাঁ, আমি। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ চিনেছি অনি।

—আমি মশায় আপনাকে চিনতে পারি নাই প্রথমটায়। তাপরেতে যত দেখি ততই যেন মনে হয়, কোথা দেখেছি—কোথা দেখেছি! হঠাৎ মনে হ'ল, গৌরীবাবু লয়? তাঁ এতকাল পরে ফিরে এলেন মশায়? আপনি আসবেন এ কথা কেউ ভাবে নাই। তবে এখানকার লোকে আপনকার নাম করে, খুব নাম করে। হ্যাঁ, তা করে। বলে—আপনি নাকি বড়মানুষ হয়েছেন! থিয়েটারে সেবার পালাগান হ'ল। বললে—আপনকার পালা। সে পালা আমরাও দেখলাম। লোকে ধন্যি ধন্যি করলে।

গৌরীকান্ত হেসে বললে—তোমার কেমন লাগল বল?

—ভাল। ভাল লাগল মশায়। এখানকার সাঁওতাল নাচ, তা-পরেতে সদ্দার মেধু মাঝির কথা, বেশ লাগল। মেয়েগুলানের তো খুব ভাল লেগেছে। বারে বারে আমাকে খোঁচা দিচ্ছিল। ব—ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমায় দেখ। দেখ—ওঠ। ইসব এই গাঁয়ের কথা।

এবার সশব্দে হেসে উঠল গৌরীকান্ত। বললে—তুমি তা হ'লে ঘুমুচ্ছিলে?

—তা মশায়, মিছে বলব না। ঘুমিয়েছিলাম। খানিক ঘুমিয়েছি—খানিক দেখেছি। সারাদিন খাটি-খুটি—তাপর সাঝবেলায় মদ খাই। রাত জাগতে পারি না। ঘুম আসে।

গৌরীকান্ত এবার ও-কথা ছেড়ে দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে—এর মধ্যে তুমি কিন্তু এত বুড়ো হয়ে গেলে কেন অনি ?

অনি বললে—কি করব বলেন ? জ্বরে ভুগে আর না-খেয়ে।

তারপরই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে—আর সে সোনার নবগেরাম নাই মশায়। মানুষ-জন ম'রে পেরেতপুরী হয়ে গিয়েছে। বাড়ীঘর ভেঙে প'ড়ে ঢিপেপুরী হয়ে গিয়েছে। খাঁ-খাঁ করছে—সব খাঁ-খাঁ করছে। সেই আমল ছিল—সেই হাঁক-ডাক, লোকজন, বড় বড় বাবু, হা-হা করে হাসি, এই গমগমে মজলিশ, গানবাজনা আলো—কিছুই নাই আর। এই আপনার মুখুজ্জে-বাড়ীতে সাত ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই আছে শুধু। আর আছে বড়জনার ছেলে কিশোরবাবু। স্বন্নবাবু মশায়দের তিন ভাইই গিয়েছে। মশায়, সেই বাড়ীর বৈঠকখানার কোণ ভেঙেছে। চাকর নাই, চাকরাণী নাই, বাবুদের ছেলেরা এখন ধান-চালের দোকানদার। আপনার বাড়ী তো অনেক দিন থেকে পতিত। আপনকার জেঠামশায়ের বাড়ীর কথা ভাবলে তো কেঁদে মরি—

—থাক্ অনি, থাক্। এদের কথা আমি জানি। বাইরে থেকেও এদের খবর পেয়েছি। তোমাদের কথা বল।

—আমাদের কথা ? খাঁ-খাঁ বাবু, সব খাঁ-খাঁ ! আমাদের বায়েন-পাড়ায় আমি এখন একা প্রবীণ মানুষ। আর ছোকরা ছেলের মধ্যে একা পাতুর বেটা নাতু। আমার বাবার মিত্যু আপনি দেখে গিয়েছেন। তখন লখাই বায়েন, গোপাল বায়েন, রমন বায়েন, ভোলা বায়েন, শিবু বায়েন—এরা ছিল। এখন এরা সব গিয়েছে- কেউ নাই। ভোলা রমন গোপাল—এদের তিনজনার বংশ সমেত নির্বংশ। বাড়ী ঢিপে-পুরী। বাউরীপাড়ায় মশায় মেয়ের হাট। বেটাছেলেরা পেরায় শেষ। হাবুল, সতীশ, গোপাল, বাঁকা, তিলক, নন্দ, মাধব, শশধর, ছিষ্টে, পেল্লাদ, উপেন, কালাচাঁদ, নোটন, অটল, হরিলাল, ছবিলাল, অবিলাস, খোঁড়া—সব—সব—সব শেষ। সাতকড়িদের নির্বংশ আপনি দেখে গিয়েছিলেন ? সে তো অনেক দিনের কথা—

—সাতকড়িদের কেউ নেই ?

—কেউ না। সাত ভাইয়ের একজনাও না। সে তো অনেকদিনের কথা। সেই পর্রী যেবার পালাল কলকাতার মোছলমান রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে, তার বছুক খানেক দুয়ের পরেই কলেরা হ'ল গাঁয়ে, সেই কলেরাতেই বাড়ী শেষ। থাকবার মধ্যে ছিল বড় ভাইয়ের একটি কন্যে। বেশ সুন্দরী কন্যে। ভদ্দনোকের মত চেহারা। তা সে মেয়েকে আবার সতীশ ছুতোরের বেটা যতীশ ছুতোর বাউরী হয়ে বিয়ে করেছে। এ পাড়ায় তিরিশ চল্লিশ ঘর বাউরী-বাড়ীতে পাঁচটা সাতটা বেটাছেলে—তার মধ্যে যতীশ ছুতোর একজনা।

হাসতে লাগিল অনি। হাসি একে বলা হয়তো যায় না, কিন্তু আর কি বলা যায়—তাও ভেবে গৌরীকান্ত পেলে না। সর্বনাশের পর মানুষ অনেক সময় না-কেঁদে হাসে। অন্তত হাসির মত মুখভঙ্গী ক'রে সঙের মত দাঁড়ায় সর্বসমক্ষে।

অনি হঠাৎ হাসি সম্বরণ ক'রে দার্শনিকের মত উদাস গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে—এবারে শিবের গাজনে ভক্ত মোটে তিনজনা। মানুষের ক্ষ্যামতাও নাই, মতিও নাই। বুঝলেন কিনা—ঢাক মোটে একখানা। কাঁসি বাজাবার নোক নাই—তা আমার ছোট কন্যেটাকে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। কলির শেষ। রণের শেষ ঋণের শেষ। রণ মানে তো যুদ্ধ, তা এই যুদ্ধুতেই সব খতম ক'রে দিয়ে গেল। সেই উনপঞ্চাশ সালে ঝড়, তাপর পঞ্চাশ সালে মড়ক। সেই মড়কেই ছিষ্টি ধসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। গোটা মুলুকেরই এই দশা। তবে এই গেরামের মত দশা কোনও গেরামের লয়।

বলতে বলতে অনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়েছে—কাঁপছে। উচ্চ কম্পিত কণ্ঠে অনি ব'লে উঠল—শাপ, বুঝলেন কিনা মশায়, অভিশাপ কিছু আছে এ গেরামের ওপর। প্রতুল নাই। কল্যেণ নাই। এ গেরাম একেবারে শে—ষ হয়ে যাবে।

এমনই উত্তেজনার মুখে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই নাটকীয়

ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। নাটকীয় সংস্থান নাটক দেখে মানুষ শেখে নি, মানুষের আচরণ অনুকরণ ক'রেই নাটক গ'ড়ে উঠেছে সংসারে। অনির মত একটি মানুষ—যে নাটক দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেও স্বচ্ছন্দে অতি স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনাভরে কথাগুলি ব'লেই একটি প্রণাম ক'রে ঘরের মুখে ঘুরল এবং বেশ দ্রুত গতিতেই চ'লে গেল। যেতে যেতেই ব'লে গেল—যাই মশায়, গাজনের ধুমুলটা সেরে দিয়ে আসি ট্যাং ট্যাং ক'রে। ঢাকে কাঠি মারলেই ডিউটি শেষ। দাও বাবা দক্ষিণে—দিন গেলে আট আনা পয়সা, আড়াই সের চাল।

* * *

গৌরীকান্ত একাই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

অনির কথাগুলির মধ্যে যুক্তি নেই, সার নেই—নিতান্তই মূল্যহীন কথা, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যে অনির হৃদয়াবেগসর্বস্ব বিশ্বাসটা এমনই উষ্ণ এবং সবল যে, গৌরীকান্তকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত ক'রে রেখে দিল। তার কানের কাছে অনির কথাগুলিই বাজতে লাগল—'প্রতুল নাই। কল্যাণ নাই। এ গ্রাম একেবারে শে—ষ হয়ে যাবে।' ওদিকে স্টেশন-রাস্তার উপরে মহাদেব সরকারের বাড়ির সামনে গণ্ডগোলটা যেন বাড়ছে। মহাদেব সরকার হাত নেড়ে বক্তৃতা করছে, বাড়ির ভিতর থেকেই বোধ হয় নারীকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদ উঠছে।

মহাদেবের সামনে দাঁড়িয়ে একজন কেউ যেন মহাদেবের সঙ্গে বচসা জুড়ে দিয়েছে। এ লোকটির কণ্ঠস্বরও সবল এবং তীক্ষ্ণ।

গৌরীকান্ত ওই দিকেই অগ্রসর হ'ল। এখানে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে অনির অভিশাপের কথা আর কতক্ষণ ভাববে সে!

মহাদেব সরকার অনর্গল ব'কে যাচ্ছে। ইংরিজী এবং বাংলা মিশিয়ে বিচিত্র বক্তৃতা।—ওসব হামবাগিজ্‌ম্ আমার কাছে চলবে না। আই ওয়েন্ট টু দি ইউনিয়ন বোর্ড, দেয়ার ওয়াজ নো কুইনিন। আই সেন্ট্ দি গার্ল টু দি চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি—দে গেভ ফোর ডোজেস অব কুইনিন মিকশ্চার; বাট ইট ওয়াজ ওয়াটার। আই

অ্যাম সিওর—ইট ওয়াজ ওয়াটার। দেন দি বয় গট নিউমোনিয়া। আই এগেন সেন্ট দি মাদার টু দি হসপিটাল। সে সেড—দেয়ার ওয়াজ নো বেড ভেকেন্ট। মজা দেখ। নিউমোনিয়া রোগীর জন্যে বেড খালি নেই। ডাক্তার প্রেসক্রাইব করলে—পেনিসিলিন। বললে—হাসপাতালে পেনিসিলিনের ব্যবস্থা নেই, কিনে আনলে তারা দিয়ে দেবে। মজা দেখ। কাজেই রোগী মরল। আই শ্যাল সি। আমি দেখব। দরখাস্ত করব আমি—টু দি সিভিল সার্জন, টু দি ডিরেক্টর অব পাবলিক হেল্‌থ্‌, টু দি মিনিস্টার হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্ট, টু দি চীফ মিনিস্টার, টু দি গভর্নর—অ্যাণ্ড আই শ্যাল রাইট টু প্যাণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। আই শ্যাল সি।

তার সামনের লোকটির চেহারা অদ্ভুত। উস্কুখুস্কু চুল, কালো পোড়া কাঠের মত রঙ, গায়ে ছেঁড়া খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি—তেমনই ছেঁড়া একখানা কাপড়, খালি পা—মূর্তিমান দুর্বাসার মত তার দৃষ্টি। সে বললে—কিন্তু আপনি নিজে পেনিসিলিন কিনে চিকিৎসা করালেন না কেন?

—ওর ছেলের জন্যে আমি পেনিসিলিন কিনে দেব?

—ওর টাকা থেকে। ওর মাইনের টাকা থেকে। কেন দেন নি?

—আমার খুশি। মাইনে এখন আমি দিতে পারব না। অ্যাণ্ড—ওর সঙ্গে মাইনের কোন কথা নাই আমার। সি ইজ এ ফলেন গার্ল—তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছি এই ঢের। এর উপর মাইনে? বাট আই শ্যাল সি। আই শ্যাল মুভ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ।

এই লোকটি আবার চীৎকার ক'রে উঠল—ফলেন গার্ল! কে—কে ওকে পথভ্রষ্ট করেছে? কার পাপে ও ফলেন গার্ল?

—নিজের পাপে।

—না। আপনার ছেলের পাপে। আপনার ছেলে এর জন্যে দায়ী এবং যে-ছেলে মরেছে, সে আপনার ছেলের ছেলে।

—কক্সুরাইনের গর্ভের ছেলে ইজ নেভার এ ফাদার'স সন।

—ভাল। কে আজ ওই ছেলে শ্মশানে নিয়ে যায়, সে আমি দেখছি।

—সি উইল্ ক্যারি হারসেল্ফ।

—আপনি অতি পাষণ্ড, অতি বর্বর। চীৎকার ক'রে উঠল লোকটি।

মহাদেব সরকারও এবার চীৎকার ক'রে উঠল—হোল্ড ইওর টাং, ইউ প্রোফেশন্যাল অ্যাজিটেটর।

—ওই মা নিয়ে যাবে ছেলের শবদেহ?

—আমি তোমার নামে মানহানির নালিশ করব।

হা-হা শব্দে হেসে উঠল অভিযোগকারী।—তোমার মান-সম্মান আছে? মানহানি করবে? আর আমার নামে মানহানির নালিশ ক'রে আদায় করবে কি? জেলে দেবে? খোরাকি লাগবে তোমাকে। হা-হা ক'রে হাসতে লাগল লোকটি। সমস্ত জনতাই এ হাসি উপভোগ করছে। তাদের মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

গৌরীকান্তের মনটা কিন্তু বিষিয়ে উঠল। নবগ্রামের সেই সমাজের এই পরিণতি হয়েছে? স্টেশনের ধারে সদর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই কুৎসিত বিরোধ করতে কারও বাধছে না? একটি পুত্রশোকাতুরা মা তার শিশুপুত্রের শবদেহ সামনে নিয়ে ব'সে আছে, আর বাইরে এরা বিরোধ বাধিয়েছে। একজন বলছে—কে ওই শব নিয়ে যায় দেখব? আর মহাদেব সরকার বলছে—সি উইল ক্যারি হারসেলফ্। ওর মা নিজে ব'য়ে নিয়ে যাবে। কঙ্কুবাইনের গর্ভের ছেলে, ইজ নেভার এ ফাদার'স সন।

ঠিক এই সময়েই পিছন থেকে কেউ বললে—ছি বিজয়, এসব তুমি করছ কি? ছি! শান্ত ধীর কণ্ঠস্বর। গৌরীকান্ত পিছন ফিরে তাকালে, কে মানুষটি এমন সংযত শান্ত কণ্ঠস্বরে কথা বললে? অতীত কালের নবগ্রামের সুর আজও বেঁচে রয়েছে কোন্ মানুষটির মধ্যে?

দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ; মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি—সব সাদা, চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, একখানি বাঁশের ছড়ির উপর ভর

দিয়ে কখন এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। গৌরীকান্ত মুহূর্তে তাঁকে চিনলে, তিনি কিশোরবাবু। এক সময় সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। গৌরীকান্তের বাবা রাধাকান্ত এবং কিশোর একই রাত্রে গ্রাম পরিত্যাগ করেছিলেন দুই বিপরীত মুখে। কিশোরবাবু পরে ফিরে এসেছিলেন সংসারী হয়ে। বেলুড়-রামকৃষ্ণ মঠের শিষ্য তিনি। হঠাৎ গৌরীকান্তের মনে পড়ল—শান্তি কথাবার্তার মধ্যে কিশোরবাবুকে 'কিশোর-মামা' বলেছিল। তখন কথাটা খেয়াল করে নি। এই মুহূর্তে কিশোরবাবুকে দেখে কথাটা মনে পড়ল, বিস্ময় জেগে উঠল।

কিশোরবাবু এগিয়ে এসে ছেঁড়া খদ্দরের জামা-পরা তর্করত ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—এখন ওসব বচসার সময় নয় বিজয়। ছি।

ছেলেটির নাম বিজয়। এই বিজয়? নবগ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলেটিই দেশোদ্ধার করতে প্রথমে জেল খেটেছে? গৌরীকান্তের জ্ঞাতিভাই। গৌরীকান্ত ওকে চেনে না, দেখে নি কখনও। আঠারো বছর বয়সে এই জেলার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়ে দশ বৎসর জেল খেটে কিছুদিন আগে খালাস পেয়েছে। খালাস পেয়ে বিজয় গৌরীকান্তের বাসায় গিয়েছিল দেখা করতে; কিন্তু গৌরীকান্ত বাসায় ছিল না, দেখা হয় নি। একখানা চিরকুট লিখে চ'লে এসেছিল। গৌরীকান্ত সেই চিরকুট পেয়ে তার খোঁজ করেছিল, কিন্তু সন্ধান ক'রে উঠতে পারে নি। দেশের ঠিকানায় পত্রও লিখেছিল, কিন্তু সে-চিঠির উত্তর বিজয় দেয় নি। এই সেই বিজয়?

বিজয় কিশোরবাবুর দিকে তাকিয়ে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞাভরেই ব'লে উঠল—দয়া ক'রে সার্‌মন্‌ ঝাড়বেন না কিশোরবাবু। সার্‌মনে কাজ মহাদেব সরকারের কাছেই বা কি আমার কাছেই বা কি—কারও কাছেই হবে না। ধর্মের কাহিনী চোরেও শোনে না, কালাপাহাড়েও শোনে না।

হেসেই কিশোরবাবু বললেন—চোরেও শোনে, কালাপাহাড় তো

শোনেই। ধর্মের মধ্যে যে অধর্ম দূর করতেই রাজী হয়েছিল কালাপাহাড়। আর ধর্মের কথা শোনাতে পারলে চোরেও শোনে। শশী ডোমের কথা তো জান! ননীঠাকুরের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকে—অভাব জেনে অন্যের বাড়ীতে চুরি ক'রে টাকা রেখে এসেছিল দাওয়ার ওপর। তাতেই বেচারা ধরা পড়েছিল। ঝগড়ার কথা এখন রাখ, কথা শোন—সে সব পরে হবে।

চীৎকার ক'রে উঠল বিজয়—না, আপনি জানেন না ওই পাপিষ্ঠ কি বলেছে! আমি যেচে ঝগড়া করতে আসি নি। শান্তিদিকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিয়েছে।

—শান্তিকে? সে কি দোষ করলে?

—দোষ আবার কি? আর দোষই বা নয় কার ওর কাছে? শান্তি-দি মেয়েদের নিয়ে নববর্ষের মিছিল ক'রে এই দিকে গেলেন—এই দোষ। তিনি কান্নার আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কার কি হ'ল, এই তাঁর দোষ। এই দোষে তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিচ্ছিল। বলে—কার মেয়ে কোথা থেকে এল, এসে বললে—আমি এ গাঁয়ের জামাই সন্তোষ মুখুজ্জের মেয়ে। বাস্, অমনি তাকে স্কাউণ্ড্রেল কিশোর মুখুজ্জে সমাদর ক'রে আশ্রয় দিলে—চাকরি ক'রে দিলে ইস্কুলে। অ্যাণ্ড দ্যাট বদমাস চরিত্রহীন সোয়াইন—সেক্রেটারি অব দি স্কুল কাউণ্ড এ নাইস গেম। শিকার পেয়ে গেল—ছাড়বে কেন? সেই চরিত্রহীনা মেয়েটা আসে আমাকে ঠাট্টা করতে? মহাদেববাবু আমাকে দেখে গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—এই যে, অ্যানাদার লাভার যাচ্ছে। আমি শান্তিদির লাভার! আমি এগিয়ে এলাম। তখন গাল দিতে শুরু করলে ডাক্তারকে, হাসপাতালকে। জওহরলাল নেহরু, বিধান রায় আওড়াতে লাগল। আমি আজ ওকে দেখব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল গৌরীকান্ত। বিস্ময়ে ক্ষোভে দুদিক থেকে তাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে।—'কার মেয়ে কোথা থেকে এল, বললে—আমি এ গাঁয়ের জামাই সন্তোষ মুখুজ্জের মেয়ে।' কে? শান্তি? হ্যাঁ, শান্তির বাপের নাম ছিল সন্তোষ মুখুজ্জে। সে কথা সে জানে। কিন্তু তিনি

এ গ্রামের জামাই ছিলেন। কোন্ সন্তোষ মুখুজ্জে? স্বর্ণবাবুর ভগ্নীপতি —তার বাবার আত্মিক অন্তরঙ্গ—সন্তোষবাবু?

'শান্তি চরিত্রহীনা!' ক্ষোভের আর সীমা রইল না তার? ইচ্ছা হ'ল প্রচণ্ড প্রতিবাদ ক'রে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ ক'রে দ্রুতপদে সে জায়গা থেকে চ'লে গেল। সামনেই স্টেশন। স্টলে চায়ের আসর বসেছে। এখনি আপ ডাউন দুখানা ট্রেন আসবে। বাঁ দিকে ময়ূরাক্ষীর ধার থেকে একখানা মোটর বাস এসেছে যাত্রী নিয়ে। আজ পয়লা বৈশাখ, প্রাদেশিক ছুটি—কোর্ট বন্ধ। সেই কারণে আজ যাত্রী কম। তবুও যাত্রী নেহাত কম নয়। চায়ের আসরে ভদ্রশ্রেণীর লোকের বেশ ভিড় জমেছে। তারা দূরে দাঁড়িয়ে এই কদর্য রস উপভোগ ক'রে হাসছে এবং চা খাচ্ছে। এক কাপের জায়গায় দু কাপ।

গৌরীকান্ত স্টলে দাঁড়াল না। চা খাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্টলটায় দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব। সে এসে প্ল্যাটফর্মের উপর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিচিত্র মনের অবস্থা। এক দিকে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষোভ, অন্যদিকে বিস্ময়বিচিত্র নানা প্রশ্ন। সামনে দক্ষিণ দিকে অবারিত প্রান্তর আর ধানক্ষেত। একেবারে দূরান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত; কোপাই নদীর বাঁকে বাঁকে গ্রামগুলির গাছপালার বেষ্টনী, চৈত্রের ধূলায় ধূসর হয়ে উঠেছে। বসন্তের নবপল্লবের কোমল সবুজকে ঢেকে দিয়েছে। এর মধ্যে তার মন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলে।

হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—দাঁড়ান, দাঁড়ান—

বিজয় ব'লে ছেলেটির কণ্ঠস্বর ব'লে মনে হ'ল। পিছন ফিরে তাকালে গৌরীকান্ত। প্রায় সেই মুহূর্তেই বিজয় স্টেশনে ঢুকে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে লাইন ধ'রে ছুটে চ'লে গেল।—দাঁড়ান।

এবার গৌরীকান্ত লাইনের দিকে তাকালে। লাইনটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চ'লে গিয়েছে। খানিকটা সমতল ভূমির উপর চ'লে ঢালু জমির উপর উঁচু বাঁধের রাস্তা ধ'রে চ'লে গিয়েছে লাইনটা। লাইনের উপর দুটি মেয়ে।

—শান্তিদি! দাঁড়ান!

—শান্তি? ও কি শান্তি? হ্যাঁ, শাড়ির লাল পাড় দেখা যাচ্ছে। শান্তিই তো!

বিজয় ছুটছে। শান্তি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শান্তির কোলে ওটি কি?

পিছন থেকে জবাব এল। হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। শান্তি। মা নিয়ে যাচ্ছে মরা ছেলে। কি করবে? মাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে ছেলের শব। সে ও কি ক'রে দেখবে?

কিশোরবাবু বলছিলেন গ্রামেরই কোন লোককে—ওকে তো ঠিক বুঝতে পারবে না এখানকার লোক। এ জাতের মেয়ে তো এ দেশে নেই। মিছিল ছেড়ে কখন যে ওপাশ দিয়ে মহাদেব সরকারের বাড়ী ঢুকেছে, আমিও জানি না।

গৌরীকান্ত এগিয়ে গেল এবার। নমস্কার ক'রে বললে—আমি গৌরীকান্ত। ভাল আছেন আপনি?

গৌরীকান্ত?—এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোরবাবু তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন।—ফিরে এসেছ তুমি? শান্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে? নারায়ণগঞ্জের নন্দলালবাবুর ভাগ্নী? ওই দেখ। ওই সে যাচ্ছে, এক হতভাগিনী মায়ের মরা ছেলে ব'য়ে নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে।

পাঁচ

গৌরীকান্তের বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না।

ঢাকার বিপ্লবী নন্দলালবাবুর ভাগ্নী শান্তি—সন্তোষ মুখুজ্জে মহাশয়ের কন্যা? এখানকার সেকালের অন্যতম প্রধান জমিদার কৈলাসবাবুর জামাই স্বর্ণবাবুর ভগ্নীপতি সন্তোষবাবু, প্রসন্ন প্রশান্ত সেই গৌরবর্ণ মানুষ সন্তোষবাবু, গৌরীকান্তের বাপের অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই সন্তোষ পিসেমশাইয়ের কন্যা?

কোথায় ঢাকা আর কোথায় নবগ্রাম !

শুধুই কি এইটুকু ?

শ্বশুরের অন্নে পরিপুষ্ট, কিন্তু তাতে তাঁর একবিন্দু আক্ষেপ বা ক্ষোভ বা দীনতাবোধ ছিল না। চরিত্রেও কোথাও দীনতা ছিল না। স্ত্রীরও ইষ্টদেবতার অর্চনা ছিল কর্ম, এবং শাস্ত্রপাঠ ছিল বাকি সময়ের অবলম্বন। জীবনে একমাত্র গৌরব ছিল—কুল-গৌরব। সেই গৌরবকে কোন কারণে কোনভাবে তিনি ক্ষুণ্ণ করতেন না। সমস্ত জীবনটাই যেন ইহকালের সঙ্গে সত্যকারের কোন সম্পর্কই তিনি রাখতেন না। কখনও কোন বিষয়কর্ম্ম করেন নি। ধর্মস্থান ছাড়া কোন সভা-সমিতিতে যান নি। নবগ্রামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠার আমল থেকে রাজপুরুষদের আসা-যাওয়ায় প্রায় সমারোহ প'ড়ে গিয়েছিল। সেই সব উপলক্ষে সভাসমিতিও হ'ত। অন্যদিকে উনিশ শো পাঁচ শালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এসেও নবগ্রামের সমাজ-জীবনের তটভূমিতে আঘাত করেছিল। সন্তোষবাবু এ সম্বে নিমন্ত্রণও পেতেন, কিন্তু কোথাও যেতেন না। এই সন্তোষবাবু। আর শান্তির মা—বিপ্লবী নন্দলালবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদরা ; নাম ছিল তাঁর দেবকী। তাঁদের বাপ ছিলেন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, নিকষ কুলীন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে দশ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন সন্তোষ দেবশর্মার সঙ্গে। সন্তোষ দেবশর্মা ছিলেন প্রসিদ্ধ কুলীন-সন্তান ; মাতুলালয়ে ভাগিনেয় হিসাবেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের টোলে পড়িয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে তখন ইংরিজী শিক্ষার আকর্ষণ যথেষ্ট প্রবল হয়ে উঠেছে। ছেলে নন্দলাল বারো বছর বয়সেই বিদ্রোহের ছোঁয়াচই লাগুক আর বিদ্রোহ তার জন্মগতভাবে স্বভাব ব'লেই হোক—সে তখন ঢাকা পালিয়ে ইংরিজী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। গ্রামের বৈদ্যবংশের শ্রীধর গুপ্ত ঢাকায় কবিরাজি করতেন। শ্রীধর গুপ্তের ছেলে ভূধর ছিল নন্দলালের বাল্যসাথী। শ্রীধর গুপ্ত ছেলেকে ইংরিজী ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন। ভূধর মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসত ; নন্দলালের সঙ্গে কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে যেত, তার কাছে ইংরিজী ইস্কুলের

ঢাকা শহরের সাহেব-সুবার গল্প করত। ইংরিজী-শিক্ষিত বাঙালীদের কথা বলত। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞানের বইগুলি পড়তে দিত, বলত—দেখ না প'ড়ে।

এর পর একদা নন্দলাল ভূধরের সঙ্গে ঢাকা চ'লে গেল গোপনে। ব'লে গিয়েছিল শুধু দিদিকে—দিদি ভাই, ভূধরের সঙ্গে আমি ঢাকা চললাম। ওদের বাড়িতেই থাকব। ভূধর বলেছে—ওর বাবা সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আমি ভাই ইংরিজী ইস্কুলে পড়ব।

দিদি দেবকী উৎসাহিতই করেছিলেন। গোড়া থেকেই তিনি এর পিছনে ছিলেন বোধ করি, এই ভাইয়ের মনে এই বাসনাটি জাগ্রত ক'রে দিয়েছেন তিনিই। ভূধরের মুখে চোখে বেশে-ভূষায় শহরের পরিমার্জনা দেখে তিনিই বলতেন—দেখ্ তো ভূধরের কেমনধারা ধরন! তুই যদি শহরে পড়তিস নন্দ!

এমনি ধরনের বিন্দু সঞ্চয় ক'রে বাসনাটি একটি বেগবতী ধারায় পরিণত হয়ে প্রাচীন বংশটির আধারের আয়তন ছাপিয়ে নূতন পথে ধাবিত হয়েছিল।

বাপ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ভূধরকে দোষী করেন নি। ছেলের উপরেও সে ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। তিনি শ্রীধর গুপ্তকে পত্র লিখলেন—নন্দলালকে কোন রকমে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দাও। শ্রীধর তাঁর স্নেহাস্পদ। তাকে লিখলেন—"নন্দকে বলিবে যে, তাহার শঙ্কার কোন কারণ নাই। আমি তাহাকে কোনরূপ তিরস্কার করিব না। আমি নিজে তাহাকে একবার বুঝাইয়া দেখিব। আমি জানি, আশা নাই। কাল বলবান, এবং ইহাই যেন কালের গতি। মুক্তবেণী ত্রিবেণীতে সরস্বতীর ধারা মজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। তবুও যুক্তবেণী-সঙ্গমে সরস্বতী যতদিন আছেন ততদিন ভরসা আছে যে, মজা-খাতে একদিন স্রোত বহিবে। আমি তাহাকে সেইটুকুই বুঝাইয়া দেখিব।"

দেবকী পত্রবাহকের হাতে চারটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভাইকে।

নন্দলালের বাপ পণ্ডিত বিষ্ণুচরণ শর্মা জামাই সন্তোষকে ডেকে বলেছিলেন—এ টোলের ভার তোমাকেই নিতে হবে বাবা। তুমি প্রস্তুত হও।

নন্দলাল বাড়ি এল। সন্তোষ প্রস্তুত হতে লাগল। এমন সময় ঘটল বিচিত্র ঘটনা। একদিন একখানি পত্র এল সন্তোষের নামে মাতুলালয়ের ঠিকানায়। লিখেছেন সন্তোষের এক বিমাতা; বর্ধমান জেলার এক গ্রামে তাঁর পিত্রালয়, সেইখানেই সন্তোষের বাবা বাস করতেন। তিনি লিখেছেন—"বাবাজীবন, তোমার পিতাঠাকুর সংশয়াপন্নরূপে পীড়িত। তোমাকে দেখিবার তাঁহার বড়ই বাসনা এবং কিছু ঘটিলে তুমিই তাঁহার শেষকৃত্য কর—এইরূপ ইচ্ছাই তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব তুমি পত্রপাঠ রওনা হইবা। ইতি তোমার বিমাতা।"

বিষ্ণুচরণ শর্মা ব্যস্ত হয়ে পাথেয় দিয়ে জামাইকে রওনা ক'রে দিলেন। দেবকী নিজে হাতে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে সে আমলের একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুরে দিলে।

কিশোরবাবু বলছিলেন, গৌরীকান্ত শুনছিল।—মানুষের জীবনে যা ঘটে তার চেয়ে বিস্ময়কর কল্পনা মানুষ করতে পারলে পেরেছে পৌরাণিক যুগের কল্পনায়। ইতিহাসের যুগ থেকে এ পর্যন্ত তা আর হয় না। কিশোরবাবুর বাড়িতে ব'সেই কথা হচ্ছিল। সস্নেহ সমাদর সে প্রত্যাশাই করেছিল এই মানুষটির কাছে। কিন্তু এতখানি স্নেহ সমাদর কল্পনা সে করে নি। একদিন কিশোরবাবুই ছিলেন এ গ্রামের তরুণ নায়ক। টকটকে ফরসা রঙ, লম্বা মানুষটিকে দেখে সত্যই মনে হ'ত অগ্নিশিখা। এমন সুগঠিত দেহ আর গৌরীকান্ত দেখে নি। প্রশস্ত বুক; ক্ষীণ কটী; সরল সবল দীর্ঘ পা-হাত দেখে মনে হ'ত, পুরুষসিংহ একেই বলে। ছ ফিট লম্বা কিশোরবাবু, তাতে আর সন্দেহ নেই। সেকালে কথায়-বার্তায় একটা তীক্ষ্ণ তেজস্বিতা ছিল, অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু এ কিশোরবাবু যেন সে কিশোরবাবুই নন। মানুষটি যেন স্নেহে প্রীতিতে মাধুর্যে অভিষিক্ত হয়ে শরতের নির্মেঘ নীল আকাশের মত উদার এবং

প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। একটা বড় কাচের গ্লাসে চা নিয়ে খেতে খেতে শান্তির কথা বলছিলেন তিনি। আর বার বার বলছিলেন—আরও কিছু খাও তুমি। সারাটা রাত্রিই তো না খেয়ে রয়েছ; আর দুখানা লুচি, কি এক মুঠো তেল মেখে মুড়ি এবং আর এক কাপ চা। কতদিন তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তুমি আসবে। কিন্তু লিখি নি। কোন্ মুখে লিখব? কেনই বা লিখব? তুমি যতই দুঃখ পেয়ে থাক এ গ্রামের কাছে, তবু এ গ্রামকে ছাড়বে কেন? আবার ভেবেছি—না, সে ভালই আছে, এই একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দিয়ে বেঁধে তাকে বিব্রত করব না। দুঃখ দেব না। এখানে এলে দুঃখ পেতে হবে। যে এল সেই পেলে। এই শান্তি—শান্তি এল একদিন হঠাৎ। বললে—আমি সন্তোষবাবুর মেয়ে, ইনি আমার মা। বাবা মরবার সময় একখানা দলিল মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। একটা বাড়ি তিনি কিনেছিলেন। সেটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দলিলের লেখক ছিলাম আমি। তখন শান্তির মায়ের কাছে শুনলাম সমস্ত কথা।

সন্তোষবাবুর বাবার অসুস্থতা নিতান্তই একটা অছিলা।

বিবাহ-ব্যবসায়ী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান অক্ষয়চন্দ্র বিবাহ করেছিলেন পনেরটি। সন্তোষের মা-ই ছিলেন প্রথমা পত্নী এবং স্বদেশীয়া—অর্থাৎ ঢাকা জেলার অধিবাসিনী; বিষ্ণুচরণ শর্মা মশায়ের স্বগ্রামের কন্যা। তাঁকে নিয়েই তিনি প্রথম আট-দশ বৎসর সংসার করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে সফরে বের হতেন কুলপঞ্জী সঙ্গে নিয়ে। আসতেন পশ্চিমবঙ্গে এবং এক শত এক টাকা পণ গ্রহণ ক'রে অরক্ষণীয়া কুলীন-কন্যার পাণি-পীড়ন ক'রে তাদের উদ্ধার করতেন এবং কন্যার পিতৃকুলের জাতিকুল রক্ষা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। তারপর কিছুকাল সেখানে কুলীন জামাতার প্রাপ্য—শ্রদ্ধার পূজা গ্রহণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করতেন। সে সময়েও জামাতৃবিদায়—কাপড় চাদর পাথেয় সম্মানী সে সবেও একান্ন টাকা আন্দাজ পেতেন। বৎসরে দুটি বিবাহ তাঁর প্রায় বরাদ্দ ছিল। কোন বৎসর তিনটিও হয়েছে। এতে সেকালে নিন্দা ছিল না। বরং ব্রাহ্মণ-সমাজে সম্মানই ছিল। পত্নীরা এতে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হ'লেও মুখে

সে ক্ষোভ কোনক্রমেই প্রকাশ করতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে একই সম্প্রদানের আসরে দুই সহোদরার বিবাহ হয়ে যেত একই পাত্রের সঙ্গে; চোদ্দটি বিবাহ পর্যন্ত অক্ষয়চন্দ্র শরৎকালের শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত কলায় কলায় বছরে বছরে ক্রমবর্ধমান। স্বগ্রামে তখন তাঁর অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব'লে খ্যাতি রটেছে। চোদ্দটি পত্নীর মধ্যে প্রথমা পত্নী সন্তোষের গর্ভধারিণী তাঁর গৃহিণী। তাঁর হস্তের সেবা পরিচর্যা এবং গৃহকর্ম ছাড়া আর কিছু পেতেন না বা নিতেন না। বাকি তেরোটি পত্নীর পিতৃগৃহ থেকে বৎসরে অন্তত ছ-সাত শো টাকা আয় হয়েছে। ব্যয় নেই। বিবাহের আসরেই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও ভদ্রজনের সম্মুখে তিনি ঘোষণা ক'রে বলতেন—এই কন্যার পিতার কুল এবং কন্যার ধর্মরক্ষার জন্যেই আমি বিবাহ করছি। কন্যার ভরণপোষণ অন্ন-বস্ত্র আশ্রয় রক্ষণাবেক্ষণ— এর কোন ভারই আমার নয়।

হিসাব অনুযায়ী অল্পদিনের মধ্যেই ষোল কলায় পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু পঞ্চদশ কলাতেই তিনি থেকে গেলেন। অসম্পূর্ণ অক্ষয়চন্দ্র হয়েই র'য়ে গেলেন শেষ শ্বশুরালয়ে। বর্ধমান জেলাতেই শেষ বিবাহ তাঁর। শ্বশুর ছিলেন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, একটি পুত্র, একটি কন্যা। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতাকে বললেন, কন্যার জন্য আমি সম্পত্তির একটি অংশ নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছি। জমি, জমিদারির অংশ, পুকুর, বাগান, পাকা দালানবাড়ির একাংশ সে পাবে। এই দেখ তার দলিল। আমার ইচ্ছা, তুমি এভাবে আর না বেড়িয়ে এইখানেই বসবাস কর।

কিশোরবাবু হেসে বললেন, অক্ষয়চন্দ্র প্রথমটা বাক্যদান করেন নি। বলেছিলেন—দেখি; তা ছাড়া আমার একটা ধর্ম তো আছে। যাদের বিবাহ করেছি—

—যাবে, মধ্যে মধ্যে যাবে। তাতে আমি বা আমার কন্যা বাধা দোব না।—শ্বশুর বলেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র একনাগাড় মাস ছয়েক থেকে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে। বিচক্ষণ ব্যক্তিটি দেখলে, ছ মাসের মধ্যে ঘি এক পলা কমলো না, আসনের

অভাব দূরের কথা—গালিচার বদলে সতরঞ্চির আসনে বসতে হ'ল না, এমন কি, বাড়িতে বড় মাছ এলে তার মাথাটা তাঁর পাতে পড়ার কোন ব্যতিক্রম হ'ল না। তার উপর পঞ্চদশপক্ষীয়া পত্নীটি ছিলেন একাধারে রূপে ও গুণে মনোহারিণী। মেয়েটির রঙ কালো হ'লে কি হয়, যাকে বলে 'তন্বীশ্যামা' তাই। ঠোঁট দুটি লাল ছিল না, কিন্তু তাম্বূলরসে লাল হয়ে থাকত অহরহ। তা. উপর এমন দুটি দুর্লভ সৌন্দর্য তাঁর ছিল, যাতে তাঁর কাছে গৌরাঙ্গীরাও নিষ্প্রভ হয়ে যেত। দুটি বড় বড় চোখ আর ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম। এর সঙ্গে ছিল মেয়েটির মনের জটিল-লতার মত প্রকৃতি। স্বামীকে এমন ক'রে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরার শক্তি সচরাচর দেখা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র বাঁধা প'ড়ে গেলেন। অন্যদিকে দিনে দিনে মেদবৃদ্ধি হয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব'সে থাকার প্রবৃত্তিটাই বেড়ে গেল। ক্রমে ঘোর সংসারী হয়ে উঠলেন অক্ষয়চন্দ্র। দুটি পুত্র হ'ল। এর পর তিনি অপর সকল পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন ক'রে দিলেন। এমন কি সন্তোষ এবং সন্তোষের গর্ভধারিণীর সংবাদ নিতেও বছরে দুখানার বেশী পত্র লিখতেন না। সন্তোষের মা অতঃপর পিত্রালয়ে ফিরে এলেন ছেলেকে নিয়ে। সন্তোষকে বিষ্ণু পণ্ডিতের টোলে দিলেন পড়তে। সে আমলের টোলে বেতন ছিল না। সন্তোষের মিষ্ট প্রকৃতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তার জন্যেই এবং সন্তোষদের কৌলীন্য-শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে তিনি সন্তোষের মাকে ধরলেন নিজের কন্যার জন্য। সন্তোষের মা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই রাজী হলেন। সন্তোষও হাতে পেল আকাশের চাঁদ। ওই শ্যামাঙ্গী কন্যাটিকে সত্যই মনে হ'ত বর্ষার আকাশের মেঘে ঢাকা চাঁদ, সন্তোষের মা ছেলের বিবাহ দিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুচরণের কন্যার সঙ্গে। স্বামীকে লিখলেন—সন্তোষের বিবাহে আপনি না আসিলে কি করিয়া চলিবে ?

অক্ষয়চন্দ্র উত্তর দিলেন—সম্প্রতি আমার দেহগতিক ভাল যাইতেছে না এবং তোমার ভগ্নী উষাবতীর শরীরও খারাপ। সুতরাং এইখান

হইতেই আশীর্বাদ জানাইতেছি। আমার প্রাপ্যাদি আমাকে মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিবা।

সন্তোষের গর্ভধারিণী হেসেছিলেন পত্র প'ড়ে। তারপরই ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি যেন এই বৃত্তি গ্রহণ ক'রো না বাবা। তা হ'লে আমি বলছি—শান্তি পাবে না।

সন্তোষও এ প্রবৃত্তিকে মনে কখনও প্রশ্রয় দেয় নি। শ্বশুরের কাছে সংস্কৃত শিখে টোল খুলবে এই সংকল্পই করেছিল মনে মনে।

হঠাৎ ওই পত্র এল—অক্ষয়চন্দ্রের শেষ অবস্থা, তিনি তাকে দেখতে চান।

এর সবটাই ছলনা।

অকস্মাৎ ঘটনা-বিপর্যয়ে অক্ষয়চন্দ্র বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের শ্বশুর মারা গেছেন বৎসর তিনেক আগে; মাস ছয়েক আগে হঠাৎ এক-মাত্র শ্যালক মারা গেলেন সন্তানসন্ততিহীন অবস্থায়। শ্যালক-পত্নী সম্পত্তির জীবনস্বত্বের মালিক হ'লেও অক্ষয়চন্দ্রের এই দুই ছেলেই ভবিষ্যতে হবেন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু গোল বেধেছে দেবত্র সম্পত্তি ও দেবসেবার অধিকার নিয়ে। দেবত্রের শরিক অক্ষয়চন্দ্রের খুড়শ্বশুর দাবি জানিয়েছেন—দেবত্রের মূল দলিলের শর্তানুযায়ী দেবত্রের অধিকার দৌহিত্র-বংশে অর্শাবে না। কোন শাখা ফলহীন হ'লে, উত্তরাধিকারী না-থাকলে, অন্য শাখার বংশধরেরা সে অংশের অধিকারী হবেন। তিনি মামলা-মকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হলেন। অক্ষয়চন্দ্র উকিল-বাড়ি হাঁটলেন। তাঁরা আশাও দিলেন। কিন্তু ও-পথে তিনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, হাঁটতে তাঁর মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল—খুড়শ্বশুরের বিবাহযোগ্যা কন্যার উপর। কয়েক বৎসর পূর্বে হ'লে এবং এই স্ত্রীটি উষাবতী না হয়ে অন্য কেউ হ'লে হয়তো নিজেই উপযাচক হয়ে বলতেন—বিরোধে কাজ নেই, এক কাজ করুন, আপনার কন্যা অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে, ওকে আমার হাতে সমর্পণ করুন এবং দেবত্রের অংশটাকে দুই ভগ্নীর মধ্যে সম

অংশে বন্টন ক'রে দিন। কিন্তু এ কথা আর বলতে তিনি পারলেন না। অনেক ভেবে পত্নীর জবানীতে ঐ পত্র লিখলেন সন্তোষকে। এবং খুড়শ্বশুরকে গিয়ে বললেন—আপনার কন্যাদায় উপস্থিত, উচ্চ কুল এবং নিখুঁত কুল দেখে বিবাহ দেওয়াই আপনাদের বংশের প্রথা। আমার প্রথম পক্ষের পুত্র সন্তোষ—রূপে গুণে চন্দ্রের পুত্র, বুধের মত পাত্র। তাকে আমি আসতে পত্র লিখেছি। সে আসছে। আপনি তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে উদ্ধার হোন। আর আমার শ্বশুরের অংশের দেবত্র আপনাদের দুই ভাইয়ের দুই কন্যার মধ্যে সম অংশে বন্টন ক'রে দিন। অনর্থক বিবাদে কি লাভ হবে? বিবাদ—সে যুদ্ধই হোক আর মামলাই হোক—তার ফল কি হবে কে বলতে পারে?

বলা বাহুল্য, সম্মোহন বাণ ব্যর্থ হ'ল না। কন্যাদায়গ্রস্ত খুড়শ্বশুর মোহিত হলেন এতে। তাঁর কন্যাটি ছিল প্রায় কৃষ্ণাঙ্গী এবং মুখরা। তার উপর নিজের পুত্রসংখ্যা ছিল সাত সাতটি, ব্যক্তিগত বিষয় যা ছিল তা সাত ভাগ করলে সাত সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ তুল্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই বিনা খরচে দাদার ভাগের অর্ধেক দেবত্রের অধিকারে কন্যাটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়ার কল্পনা তাঁর ভালই লাগল। তবুও তিনি—'ভেবে দেখি, ভেবে দেখি' করছিলেন। কিন্তু সন্তোষ যে দিন এসে পৌঁছল, সে দিন সব আপত্তি ভুলে গিয়ে জামাতা অক্ষয়চন্দ্রের কাছে এসে বললেন—তাই হ'ল বাবাজী। বিবাহের দিন স্থির কর। তবে তোমার সঙ্গে যে শর্তে দাদা বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই শর্ত। তোমার ছেলেকে এইখানে থাকতে হবে এবং আর বিবাহ করতে পাবে না।

অক্ষয়চন্দ্র হেসে বলেছিলেন—খুড়োমশায়, ও-কথাটা কালিদাসীকে বলবেন। ওটা তার দায়িত্ব। আমার পুত্রের দায়িত্ব—আপনি কালিদাসীকে যে সম্পত্তি দিচ্ছেন তার অধিকারী অর্থাৎ আপনার দৌহিত্র-সম্ভব নিষ্পন্ন করা। আমাকে আপনার দাদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন নি। এরূপ

প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমাদের কুলধর্মবিরুদ্ধ। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমাকে আবদ্ধ করেছে উষাবতী। আর আপনাদের সমাদরও বটে—সে কথা অস্বীকার করলে আমার অধর্ম হবে।

ছেলের কাছে অক্ষয়চন্দ্র দাবী জানালেন—পিতৃঋণ শোধ হয় না, তবুও কিছু পরিমাণে হয়। তুমি তাই দাও আমাকে। যদি দাও, তবে তোমার পিতৃঋণ শোধ হ'ল—এ কথা আমি নিজ মুখে বলতে রাজী আছি।

সন্তোষচন্দ্র এসেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাপকে সুস্থ দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, পত্র পেলাম—

—আমি মরণাপন্ন! আমি নিজেই সে কথা লিখতে বলেছিলাম। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়, এ কথা সত্য। প্রায়ই ইচ্ছা হয়। তোমার গর্ভধারিণীকেও দেখতে ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু উপায় ছিল না। বড়ই জড়িয়ে পড়েছি। যাক, সে সতীসাধ্বী নিজে স্বর্গে গিয়েছে, আমাকেও মনস্তাপ হতে রক্ষা করেছে। তার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে একবার ইচ্ছা হয়েছিল—যাই; কিন্তু আবার মনে হ'ল—নাঃ। বেঁচে থাকতেই যেতে পারি নি, আর তার শ্রাদ্ধকর্মে গিয়ে কি হবে?

তারপর সরাসরিই কথাটা পেড়ে বসলেন। বললেন—এখন এই বিপদ উপস্থিত। আমি মধ্যে মধ্যে তোমার পত্রাদি যা পাই তা থেকে আমার অনুমান হয় যে, বিষ্ণু পণ্ডিতের কন্যার প্রতি তোমার স্নেহ খুব গাঢ়। আর তোমার বিবাহের পত্র—তোমার গর্ভধারিণী আমাকে যে পত্র লিখেছিলেন—হস্তাক্ষর কার তা জানি না, তবে হস্তাক্ষর দেখে অনুমান হয় যে, এমন যাঁর হস্তাক্ষর সে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার ক'রেই জেনেছে এবং লিখেছে; তাতে লিখেছিলেন—"আপনি যেন উষাবতীর পুত্রদের বিবাহ পেশা করিতে নিষেধ করিবেন। সন্তোষকে আমি নিষেধ করিলাম।" ঠিক এই কারণেই আমার অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে তোমাকে আনিয়েছি। এখন বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

সন্তোষচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি বলবেন প্রথমটা ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর আকুলভাবে ব'লে উঠলেন—আমাকে মাফ করুন বাবা, আপনার দুটি পায়ে ধরছি আমি।

—সে তুমি সহস্রবার ধর না পায়ে। তাতে তো আমার অপরাধ হবে না। আমার আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধ হবে তোমার। তা ছাড়া আমি তোমার অনিষ্ট করছি না—ইষ্টসাধনই করছি। তুমি সেখানে টোলে অধ্যাপনা ক'রে কি করবে? কি হবে? কি সুখে থাকবে? এখানে দেবত্বের সিকি অংশ, যা তুমি বা তোমার সন্তানেরা পাবে—তার আয় কত জান? বার্ষিক দেড় হাজার টাকা নগদ আয়, তা ছাড়া ক্ষেত-খামার আছে। ব্রাহ্মণের ছেলে—দেবতার সেবার তত্ত্বাবধান করবে, নিজে পূজার্চনা করবে, ইহকাল-পরকাল দুই-ই হবে। আমার কথা কি জান? দেবসেবার অধিকার গেলে আমার পক্ষে আর এখানে থাকা অসম্ভব হবে। বাইরের লোকে যে যা বলবে বলুক। উষাবতীর আকর্ষণ, এ পক্ষের সন্তানদের মমতা, জমিদার শ্বশুরবাড়ী, চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাওয়া—যা বলুক, ওইগুলিই সব নয়; এখানে আসার পর থেকে আমিই দেবমন্দিরের একরকম কর্তা হয়ে রয়েছি। দেবতাগুলির সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আমার। আমার কোন পুত্রবিয়োগ হ'লেও এখানে সে দুঃখ সহ্য ক'রে থাকা সম্ভব, কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেলে আমার পক্ষে এখানে বাস অসম্ভব।

অসহায় সন্তোষচন্দ্রের চোখ থেকে জল গড়াতে শুরু করেছিল। বাপের সঙ্গে তর্ক করবার মত সাহসও তাঁর ছিল না, তাঁর অকপট একতরফা স্বার্থের স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিও খুঁজে পান নি। তবুও বলেছিলো—আমার কথাটা ভেবে দেখুন।

—তোমার কথা নিশ্চয়ই ভেবেছি আমি। নইলে এই সম্পত্তির ভাগ তোমাকে আমি ডেকে দিতে যাব কেন?

—আমি চাই না সম্পত্তি।

—তুমি না চাও, তোমার ছেলেপিলেরা চাইবে।

—না, তারাও চাইবে না।

—চাইবে। তুমি সদ্য যুবক, তোমার দৃষ্টি নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, মানুষের ভোগপিপাসা বাড়ছে। তা ছাড়া, তুমি যদি তাদের বাপ হিসেবে বল—না, চাইবে না তারা; তবে আমি পিতামহ হিসাবে বলব—তারা চাইবে। আর কাঁদছ কেন তুমি? অবশ্য যুবক-বয়সে পত্নীপ্রীতি একটু গাঢ়ই হয়। তবে ওটা কিছু নয়। তা ছাড়া, এটা আমাদের কুলধর্ম। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার না করলেই কৌলীন্যধর্মে পাতিত্য ঘটে—অধর্ম হয়।

অবশেষে ওই মোক্ষম অস্ত্র ত্যাগ করলেন। বললেন—আমি তোমার পিতা, আমার কাছে অবশ্যই একটা ঋণ তোমার আছে। সেই ঋণ তুমি শোধ কর। তুমি যদি চাও তবে আমি সর্বসমক্ষেই সে কথা বলব। তাতেও যদি রাজী না হও, তবে মস্তকে বজ্রাঘাত সহ্যের জন্য প্রস্তুত হও। আমি অভিসম্পাত দেব।

তারপর উষাবতীর গর্ভের দুই ছেলে ধনা ও গণা অর্থাৎ ধনপতি ও গণপতিকে ডেকে বলেছিলেন—দাদার কাছে কাছে চব্বিশ ঘণ্টা থাকবি, বুঝলি।

আবার সন্তোষকে বললেন—কালিদাসীর সেবায় যত্নে পরিতুষ্ট থাক। থাকবে, নইলে চ'লে যাবে, বেঁধে তো তোমাকে কেউ রাখবে না। আমার খুড়শ্বশুর বলেছিলেন সে কথা—এখানে থাকতে হবে, আর বিবাহ করতে পাবে না। আমি তাতে রাজী হই নি। সে পথ তোমার খোলাই আছে।

শুধু ধনা গণাই নয়, আরও কয়েকজনকে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। সন্তোষ যেন না পালায়। কয়েক দিনের মধ্যেই উকীল-বাড়িতে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ সম্পর্কে মীমাংসার দলিল তৈরী করিয়ে একদা রাত্রে স্বতহিবুকযোগে সন্তোষের সঙ্গে কালিদাসীর বিবাহবাসরে পঞ্চজন ভদ্রজনকে সাক্ষী ক'রে সেই দলিল সই করিয়ে পাকা ক'রে

নিলেন। সন্তোষ কোনক্রমে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ ক'রে মন্ত্র পাঠ এবং আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন ক'রে গেল। বাসরে কালিদাসী তাকে একলা পাওয়া মাত্র বললে—হ্যাঁ গা, সে বুঝি খুব সুন্দরী?

চমকে উঠে সন্তোষ বলেছিলেন—কে? কার কথা বলছ?

—তোমার প্রথম বউ একেবারে অপ্সরী? সেই বাঙালিনী?

হাসলেন সন্তোষবাবু। বললেন—কে বললে তোমাকে?

—মরণ। তবে বুড়ো মিন্সের এত কান্না কিসের?

—না না। কাঁদব কেন?

—তবে মুখ এত গোমড়া কেন? আর ধনা-গণার কাছে আমি বুঝি কিছু শুনি নি? ধনা বলে—মাসী, দাদা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

সন্তোষচন্দ্র বললেন—দেখ, আবার যদি কোথাও আমাকে বিয়ে করতে হয়, তবে তোমাকে মনে ক'রে যদি দু ফোঁটা চোখের জলই পড়ে, সেটা কি অন্যায় হবে?

—কি? আবার বিয়ে করবে? বাবা সম্পত্তি দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না? বিয়ে করবে? চাপরাসী পাঠিয়ে দাঙ্গা ক'রে বিয়ে ভেঙে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসব। বিয়ে করবে?

পরের দিন উঠেই সন্তোষচন্দ্র চিঠি লিখলেন শ্বশুরকে। সমস্ত খুলে লিখলেন—"আমাকে আপনারা মৃতই ভাবিবেন। পিতৃঋণ শোধ করিতে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছে। আমার পিতাই আমাকে তাঁহার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলিদান দিলেন।"

কিন্তু কিছুক্ষণ পর নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। যে মৃত সে আবার কোন কালে সংবাদ দেয়! প্রেতমূর্তির দেখা দেওয়ার কথা শোনা যায়। চিঠি লেখার কথা শোনা যায় না।

বিষ্ণুচরণ পণ্ডিত কিন্তু যথাসময়ে সংবাদ পেয়েছিলেন। বিবাহের পরদিন লাল কালিতে লেখা হলুদের ছাপ দেওয়া একখানি পোস্টকার্ড তিনি পেলেন।—

"ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ। যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়, মদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সন্তোষচন্দ্রের সহিত বর্ধমান জেলার — দেবশর্মার (মুখোপাধ্যায়স্য) — বিবাহে''র সংবাদ নিবেদন ক'রে, সবান্ধবে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দেবশর্মণ।

বিষ্ণু পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন এক প্রহরেরও বেশী।

নন্দলাল পত্রখানা কুড়িয়ে নিয়ে গেল দিদির কাছে।

মেয়ে এসে বাবার স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললে—বাবা!

—মা।

—নন্দকে ঢাকায় ইংরেজী স্কুলে ভর্তি ক'রে দাও বাবা।

মনের বেদনা গোপন ক'রেই বিষ্ণু পণ্ডিত বললেন—আবার বুঝি নন্দ ধরেছে? কন্যা যে সংবাদ জেনেছে, নন্দ যে কখন চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, সে খেয়াল তাঁর ছিল না।

মেয়ে বললে—না বাবা, সে কিছু বলে নি। আমি বলছি।

—তোর ইচ্ছে তার ইচ্ছে তো আমি জানি মা। কিন্তু তোরা দুজনেই শ্রীধরের ছেলের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিস, সেটা আমি জেনে কি ক'রে সমর্থন করব?

মেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে—ভূধরকে দেখে নন্দ এমনি হয়—অমন ইচ্ছে হয় নি, তা বলব না। তবে আর সে ইচ্ছে নেই। তোমার জামাইয়ের কথা ভেবে, আমার শ্বশুরের কথা ভেবে বলছি। নইলে আমাদের কুল আছে—শেষকালে কি নন্দ বিয়ের ব্যবসা ক'রে বেড়াবে? টোলে প'ড়ে তো ফল এই!

বিষ্ণু পণ্ডিত চমকে উঠলেন। বুঝলেন, মেয়ে জেনেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সন্তোষ এমন করবে আমি ভাবি নি। আমার সন্দেহ হয়, তার বাবা—

—তাই তো বলছি বাবা, নন্দকে ইংরিজী পড়তে দাও। তুমি যদি মতিভ্রম ক'রে তাকে দুটো বিয়ে করতে বল, তবে সে বলতে পারবে—করব না, করতে পারব না।

বিষ্ণু পণ্ডিত একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন—বেশ, তাই হবে। যে

ধারা ম'জেই গেল, তার এখানে-ওখানে এক-আধটা ডোবা থেকেই বা লাভ কি? তাই যাক নন্দলাল—শ্বেত দ্বীপের জহ্নুমুনির জঙ্ঘা দীর্ণ ক'রে নতুন সরস্বতীর ধারা নিয়ে আসুক এই ভিটের কোলে। তাই হোক।

ছয়

কিশোরবাবু বললেন—সন্তোষবাবুর এখানকার শেষজীবনে আমি তাঁর পরম প্রিয়জন ছিলাম। সে তুমি জান। তিনি সকল কথাই আমাকে বলতেন। বলেন নি এই প্রথম জীবনের কথা। একেবারে মনের মণিকোঠায় গোপন ক'রে রেখেছিলেন। মধ্যে মধ্যে বলতেন—কিশোরচন্দ্র, এ পৃথিবী অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এখানে কারও কাছে কখনও যে কথাটি পরম বেদনার সে কথাটি প্রকাশ ক'রো না। সেটি প্রকাশ করবার একটি স্থান—আপনার ইষ্টদেবতা। তাঁর কাছে প্রকাশ ক'রে তাঁরই কাছে সান্ত্বনা চেয়ো। তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রো—এই যে আমার দুঃখ, এর প্রতিকার কি বল?

তাঁর গ্রামের গল্প বলেছেন—দেশের গল্প বলেছেন। নদীর কথা, ফসলের কথা, সুপারী-নারকেল গাছের কথা, শাকসব্জীর কথা বলতে তিনি শতমুখ হয়ে উঠতেন। মাছের কথায় বলতেন, মাছ আর তোমরা কি দেখলে—কি খেলে? পুঁটি, মৌরলা, কুঁচো চিংড়ি আর দুই-চারটা রুই-কাতল—এই তো আমাদের দেশের মাছ! তাও পাঁচ সেরের বেশি ওজন হ'লেই একদম হৈ-হৈ কাণ্ড! আবার মাছ যদি বিশ সের ওজন ছাড়ল তো ছিবড়ে হয়ে গেল। আর ছাই মাছের রান্নার মধ্যে রান্না অম্বল। বর্ধমানে এলাম—বাবা মাছ ধরালেন—মুড়োটা আমার পাতে দিলে—ঝাল না, ঝোল না, অম্বল; তেঁতুল-গোলার জলে পাক ক'রে চুবিয়ে দিয়েছে। গ্রীষ্মের সময় বলতেন—ওরে বাবা, বঙ্গদেশ লোকে বলে সোনার দেশ—জলে শীতল, দখিনা বাতাসে মধুর, নদী-নালায় পলি-মাটিতে সবুজ ঘাসে যেন মায়ের কোল। সেই বঙ্গদেশের ভিতর এমন

টাই আছে, তা জানতাম না কিশোর। এ ভাই, রাজপুতনার মরুভূমির একটা টুকরো কেমন ক'রে যেন, বোধ করি বলরামের লাঙলের ডগায় লেগে উঠে এসেছে হে! ভাল ছেলের কথা উঠলে বলতেন—আমাদের গ্রামে একটি ছাওয়াল দেখেছি—নন্দলাল। পণ্ডিতের কথা উঠলে বলতেন—আমার গুরু বিষ্ণুচরণ পণ্ডিতকে দেখেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কখনও স্ত্রীর কথা বলেন নি। উনিশ শো নয় সালে নন্দবাবুর যে ষড়যন্ত্র মামলায় আট বৎসরের দ্বীপান্তর হ'ল, সেই মামলার সময় নিত্য যেতেন হেড-মাস্টারের কাছে ইংরেজী খবরের কাগজের খবর শুনতে। সারা সন্ধ্যাটি ব'সে থেকে কাগজখানি নিয়ে আসতেন। আমাকে ডেকে বলতেন—মামলার খবর পড়, আমাকে বাংলা ক'রে বুঝিয়ে দাও। নন্দলালবাবুর প্রসঙ্গ থাকলে শুনতেন আর ঘাড় নাড়তেন। সে ঘাড়-নাড়া কেমন জান? ভগবৎলীলা শুনে ভক্ত যেমন উপলব্ধির ভাবাবেশে ঘাড় নাড়ে—তেমনি। একদিন মামলার খবরের মধ্যে সরকারী উকীলের বক্তৃতায় ছিল—"নন্দলালই হ'ল এই ষড়যন্ত্রের মূল ব্যক্তিদের অন্যতম ব্যক্তি। শহর থেকে দূরে এক অখ্যাত পল্লীর মধ্যে তার পৈতৃক শাস্ত্র আলোচনার ঘরখানিকেই ক'রে তুলেছিল ষড়যন্ত্রের এক প্রধান আড্ডা—কার্যালয়। এমন কি তার সহোদরা ভগ্নীকে পর্যন্ত এই কুটিল এবং ভয়ঙ্কর খেলায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু গভীর রাত্রে যে কোন ষড়যন্ত্রী ওই বাড়ীতে গিয়েছে, সে মৃদুতম আহ্বানে সাড়া পেয়েছে—দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে; অভুক্ত থাকলে সেই রাত্রে সদ্যপ্রস্তুত আহার্যে তৃপ্ত হয়েছে। সে নন্দলাল বাড়ীতে থাকুন বা নাই থাকুন।"

কিশোরবাবু নিজে এবার কয়েকবার ঘাড় নাড়লেন—নাড়লেন ভাগবৎলীলা-কথক ভক্তের অথবা কাব্য-আবৃত্তিরত রসিকজনের মত। বললেন—সেই দিন শুধু বলেছিলেন, প্রথমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসলেন, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন—কিসের দিকে কোন্ দিকে সে জানেন ভগবান। তারপর বললেন—কি থেকে

যে কি হয় কিশোরচন্দ্র, তা কি কেউ জানে? ভাবতে পার, একটা প্রকাণ্ড পণ্ডিতের বংশ—শাস্ত্র ছেড়ে শস্ত্র নিয়ে পড়ল শুধু একটা কুলীনের ছেলের মন্দভাগ্যের ফলে? একটা ব্যাধ একটা পাখী মেরেছিল; পৃথিবীতে আদিকাল থেকে লক্ষ লক্ষ ব্যাধ নিত্যনিয়মিত বহু লক্ষ পাখী মেরে আসছে; তার মধ্যে ওই পাখীটা আর ওই ব্যাধটা থেকে কাব্য সৃষ্টি হয়ে গেল। এ অবশ্য ঠিক তা নয়; এর অন্য অর্থ আছে।

বার বার ঘাড় নেড়েছিলেন সন্তোষবাবু। —আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বুঝেছ।. বুঝতে তো ঠিক পারি নি। বলেছিলাম—কি বলেছেন সন্তোষ দাদামশায়? তিনি বলেছিলেন—বন্ধু হে, তোমাদের গাঁয়ের ধারে ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ সাহেবের গাড়ীর চাকা ভেঙেছিল। আর তার ফলে তোমাদের নবগ্রামে হ'ল হাই ইস্কুল। বুঝেছ কিশোরচন্দ্র, একটা ছড়া আছে—ওপারেতে ধান ফলেছে লম্বা লম্বা শীষ—টুকুস ক'রে ম'রে গেল লঙ্কার রাবণ। শুনে লোকে হাসে। কিন্তু ছড়াটা সত্যই হতে পারে। ভাগ্যে রাবণের এলাকার বাইরে ভাল ধান ফলেছিল—তাই তো রামচন্দ্রের বানর-বাহিনীর রসদ জুটেছিল। এর বেশি কিছু আর প্রশ্ন ক'রো না।

* * * *

সারা জীবনটাই, বোধ করি শেষের কয়েক বৎসর ছাড়া, সন্তোষচন্দ্র এই অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু অসীম সহনশীলতায় তা সহ্য ক'রে এসেছেন এবং একটি প্রশান্ত বৈরাগ্যভরে ইষ্টদেবতার অর্চনায় আত্ম-সমর্পণ ক'রে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

বর্ধমানে বিবাহ ক'রে প্রথম কয়েকটা বৎসর তাঁর অশান্তির আর সীমা ছিল না। জমিদারনন্দিনী কালিদাসী তাঁর জীবন অসহ্য ক'রে তুলেছিল। এমন কলহপরায়ণা নারী তিনি কদাচিৎ দেখেছেন। প্রথমটা সে তাঁকে প্রবল আকর্ষণে আঁকড়ে ধরেছিল। সেও এক অসহ্য ব্যাপার। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, বেশভূষা, এমন কি বাইরে কার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে, কার সঙ্গে হবে না—সে সবই কালিদাসী চতুর্ভুজার মত

নয়, দশভুজার মত হস্তপ্রসার ক'রে ব্যবস্থা করত। ভগবানের অনুগ্রহে বৎসর দুয়েকের মধ্যেই দুর্ভোগের এ ধারাটা পাল্টাল। কালিদাসী হ'ল জননী। ছেলে কোলে পেয়ে তাঁকে খানিকটা রেহাই দিলে। দ্বিতীয় সন্তান হতেই সে তাঁকে একেবারে অনুগৃহীত পোষ্যের পর্যায়ে ফেলে দিলে। তবে চ'লে যাবার অধিকার দিলে না। যাকে কড়ি দিয়ে কেনা হয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে—সে যাবে কোথায়? এর পরই মারা গেলেন কালিদাসীর বাপ। ত্রিরাত্রি অন্তে চতুর্থীর শ্রাদ্ধে বাপকে পিণ্ডদান ক'রেই কালিদাসী আসরে আবির্ভূত হ'ল রণরঙ্গিণীরূপে। বোধ করি পাঁচ দিনের দিন দেবমন্দিরে এসে কলহ শুরু ক'রে দিলে নিজের সহোদরের সঙ্গে। এতদিন প্রতি বেলায় তার বাপের আট আনা অংশ এবং তার চার আনা অংশের প্রসাদ বারো গণ্ডা লুচির মাত্র দু গণ্ডা আসত তার বাড়ী। বাকী দশ গণ্ডা যেত তার বাপের ঘরে—সেখানে অনেক লোক, সাত ভাইয়ের সপ্ত সমুদ্রের সংসার। কালিদাসী গিয়েই হুকুম দিলে—আজ থেকে চার গণ্ডা লুচিই যাবে তার বাড়ী। দু বেলায় আট গণ্ডা লুচি সে গুনে নেবে।

তার কয়েক দিন পরেই তার দৃষ্টি পড়ল আর চার আনার শরিকদের অন্যায় ব্যবহারের উপর—অর্থাৎ জাঠতুতো দিদি এবং সৎশাশুড়ী উষাবতীর অন্যায় হস্তক্ষেপের দিকে। এ পর্যন্ত কালিদাসীর শ্বশুর সন্তোষের বাপই ছিলেন এ দেব-মন্দিরের প্রায় সর্বময় কর্তা। কর্তা অর্থে বিষয় ব্যাপারের ঠিক নয়, পূজা-ব্যবস্থার কর্তা। সেকালে বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনদের ধর্মচর্চা পূজার্চনাই ছিল বড় অবলম্বন। একটা অবলম্বন না হ'লে মানুষ থাকে কি নিয়ে? তা ছাড়া ওতে কৌলিন্যের নয়টা গুণের অনেক কয়টাই প্রকাশ পেত—আচার, বিদ্যা, সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সমাজে প্রতিষ্ঠা, এমন কি তীর্থদর্শনের গুণটা খানিকটা ওরই আওতায় এসে যেত। সত্য বলতে অক্ষয়চন্দ্র নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও ছিলেন। উষাবতীর বিবাহের কিছুদিন পর শ্বশুর খুড়শ্বশুর—দুজনেই জামাইয়ের এই নিষ্ঠা দেখে তাঁকেই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন। এবং পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক জামাতার

দৈনন্দিন তর্পণ ইত্যাদির জন্য এক পোয়া কারণের বরাদ্দ ক'রে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া মৎস্য মাংস—এর ব্যবস্থাও ছিল। সন্তোষের বিবাহের পরও এ ব্যবস্থার কোন ব্যত্যয়ের কারণ ঘটে নি। বরং তখন অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়েছিল। খুড়-শ্বশুর বেয়াই হয়েছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এসে কাছে ব'সে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। সন্তোষের দীক্ষা তন্ত্রমতে হ'লেও তিনি কারণ অর্থাৎ মদ খেতেন না, একটি পিতলের পাত্রে ডাবের জল ঢেলে নিয়ে কারণের কারবার সেরে নিতেন।

কালিদাসী সেদিন এসে এরই উপর হস্তক্ষেপ ক'রে বসল এবং ব'লে বসল—ভেবেছেন, ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমার ভাগসুদ্ধ খাবেন! এতদিন বাবা ছিল ব'লে কিছু বলি নি। আর সে হবে না। শোনো গো পূজারী-ঠাকুর, ওই কারণের অর্ধেকটা আমাদের এঁকে দেবে। বুঝেছ? মধু থাকতে গুড় দিয়ে পূজো কেন? একজন খাবেন সব মধুটা, আর একজন ভেলিগুড় চাটবে? বাঃ, বড় মজার ব্যবস্থা!

কালিদাসী স্বহস্তে একটি পাত্রে অর্ধেক কারণ ঢেলে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল। সন্তোষ পূজার্চনা করতেন বাড়ীতে। সন্ধ্যায় তর্পণের সময় নারকেলের জলের বদলে বাটী কারণ নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—এই নাও।

নাকে গন্ধ অনিবার্যগতিতে প্রবেশ করেছিল, তবুও বিস্মিত হয়ে সন্তোষবাবু বলেছিলেন—এ কি?

—কারণ।

—কি হবে?

—মরণ! কি হবে? কি হয়? তারপর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলেছিল—তর্পণ করবে।

—আমি তো ডাবের জল দিয়ে তর্পণ করি। ও তো আমি খাই না।

—খাও না, খেতে না; আজ থেকে খাও।

—না। ও আমি স্পর্শ করব না। তিনি বিস্মিত হলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলেন না।

—স্পর্শ করবে না? আলবৎ স্পর্শ করতে হবে, খেতে হবে তোমাকে।

ওদিকে ও-বাড়ীতে ঠিক এই মুহূর্তে অক্ষয়চন্দ্রের রূঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।—খাল কেটে কুমীর এনেছিলাম আমি। ছি—ছি—ছি! পূজার উপকরণ ভাগ! পাষণ্ড—বর্বর—

মুহূর্তে কালিদাসী উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলেছিল—খবরদার বলছি, এমন ক'রে গালি-গালাজ করবেন না। ভাল বলছি। ভাগীকে ভাগ দিতে হ'লেই বুক চড়চড় করে, নয়?

সন্তোষচন্দ্র এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন এবং ছি-ছি ক'রে ব'লে উঠলেন—ছি-ছি-ছি! এ তুমি করেছ কি কালিদাসী, এ তুমি করেছ কি?

—ঠিক করেছি। ভাঁগের ভাগ নিয়েছি।

—ভাগ নিয়েছ? লঘু-গুরু নেই?

—না। নেই। ভাগে আবার লঘু-গুরু! ছোট-বড়তে কম বেশি ভাগ কি বড়ই ষোল আনা পাবে, এমন আইন কোন্ ভূ-ভারতে আছে—নজীর দেখাতে পার আমাকে?

—তাই ব'লে বাবার তর্পণের কারণের ভাগ! আমি কারণ ছুঁই না।

—তুমি ছোঁও না, আমার ছেলেরা ছোঁবে। তখন? তখন তো এটা নজীর হয়ে যাবে ধনা-গণা তো তখন নজীর দেখিয়ে বলবে, এ আমাদের ষোল আনা পাওনা। এর ভাগ কখনও ওরা পাবে না। তখন ধনা-গণা 'তারা' 'তারা' ব'লে কারণ পান করবে আর আমার বাছারা দেখে দেখে ঠোঁট চাটবে! তা আমি হতে দোব না। তোমাকে আজ থেকে খেতে হবে কারণ। ও আমি ফেলব কোথা?

সেই রাত্রেই সন্তোষ শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করলেন।

মনে গ্লানির আর পরিসীমা ছিল না। না থাকারই কথা। অবশ্য সংসারে অর্থই নাকি অনর্থের মূল, থাকলেও গ্লানি, না থাকলেও গ্লানি।

এর জন্য বাপে ছেলেতে ঝগড়া একটা অভূতপূর্ব নয়। সিংহাসন নিয়ে হানাহানি, সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মকদ্দমা বাপ-ছেলেতে অনেক হয়েছে। কিন্তু সন্তোষচন্দ্রের প্রকৃতি তেমন ছিল না। তা ছাড়া তাঁর অন্তর্দাহ সেই বিবাহের দিন থেকে সমানে তাঁকে দগ্ধ ক'রে আসছে। রাত্রের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে রেল-স্টেশনের দিকে রওনা হবার সময় ভেবেছিলেন—যাবেন ফিরে দেবকীর কাছে। শ্বশুর গুরু বিষ্ণুচরণ পণ্ডিত দেহরক্ষা করেছেন, তাঁর পারলৌকিক কর্মের সময় নন্দলালের নামে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন। যেতে পারেন নি সন্তোষচন্দ্র, লজ্জাতেই যেতে পারেন নি; লজ্জা নয়, মর্মের গ্লানির জন্য পারেন নি। একখানি পত্র লিখেছিলেন। দীর্ঘ পত্র। নিজের কর্মের জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেন নি, নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চান নি, শুধু গুরুর কথা স্মরণ করেছিলেন, স্নেহ-সমাদরে কথাগুলি শতবার ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লিখেছিলেন। আর কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন সঙ্কোচের সঙ্গে। পরিশেষে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ভগবানের কাছে, তিনি যেন তাদের মঙ্গল করেন। দেবকীকেও স্বতন্ত্রভাবে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও নিজের কৃতকর্মের কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। প্রায় একই চিঠি। তবে পরিশেষে ছিল ক্ষমাপ্রার্থনা।

কিন্তু কোন পত্রেরই উত্তর আসে নি। তার জন্য তিনি বেদনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু কোন ক্ষোভকে প্রশ্রয় দেন নি। ক্ষোভ সঞ্চার হবার মত মনের অবস্থাই তখন তাঁর ছিল না, পিটিয়ে পিটিয়ে জমানো ছাদের মত অবস্থা ক'রে তুলেছিলেন, জলেও সিক্ত হ'ত না, উত্তাপেও ফাটত না।

সেদিন কালিদাসীর আচরণে তাতে প্রথম ফাটল ধরল। কালিদাসী কয়লার চুলো জ্বালিয়ে এমন জমাট ছাদের মত মনটাতেও ফাট ধরিয়ে দিলে। সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে স্টেশন পর্যন্ত যেতে যেতে তাঁর ওই মনের ফাটলের পথ ধ'রে দেবকীর প্রতি স্নেহ-প্রেমের ধারা প্রবেশের পথ পেলে। ফিরে যাবেন ব'লেই সটান এলেন কলকাতায়। কালীঘাটে দেবীদর্শন ক'রে শেয়ালদায় এসে ট্রেন ধরলেন। কিন্তু রাণাঘাটে নেমে পড়লেন। মনের গ্লানি প্রবল হয়ে উঠল। ট্রেনেই শুনলেন—দুজন

ঢাকার লোকেই আলোচনা করছে—সেবার এনট্রান্স পরীক্ষায় নন্দলাল ভট্টাচার্য খুব ভাল ফল করেছে। বিক্রমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত বিষ্ণুচরণ শর্মা-শাস্ত্রীর ছেলে।

একজন বিস্ময় প্রকাশ করলেন—বিষ্ণুচরণ পণ্ডিতের ছেলে সংস্কৃত ছেড়ে ইংরিজিনবীশ হ'ল ? টোল উঠে গেল ?

অন্যজন বললেন—শুধু কি তাই, পণ্ডিতের মেয়ে গতবার এম-ই পরীক্ষা পাস করেছে। গ্রামে টোলের ঘরে মেয়েদের পাঠশালা বসিয়েছে। শুনি নাকি সধবা মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে না। বলে—আমি তো বিধবা। পণ্ডিতের ঘরে তো মাছ মাংস পেঁয়াজের চলন কোন কালেই ছিল না। তাতেও বাধে না।

এর পর রাণাঘাটে নেমে পড়লেন সন্তোষচন্দ্র। স্থির করলেন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তাই হয়েছিলেন। বাংলাদেশেই তীর্থ পরিক্রমা ক'রে ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁকে পথে পাকড়াও করলে এক ঘটক। তিনিও পেশাদার কুলীন, তবে সে পেশায় তখন বাধা দাঁড়িয়েছে তাঁর দন্তহীন মুখ এবং সাদা চুল। তখনও বাংলাদেশে কৌলীন্যের মর্যাদা অটুটই আছে, তবে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজটা উঠেছে। স্বামী-সঙ্গ স্বামীর ঘর মেয়েরা পাক বা না পাক, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের শাঁখা-শাড়ি-মাছ-ভাতের অধিকার দেওয়ার কল্পনায় মানুষ শিউরে উঠছে ; হৃদয় ততখানি প্রশস্ত হয়েছে ; গ্রীষ্মের প্রান্তরে বর্ষার প্রথম বর্ষণে তৃণাঙ্কুর দেখা দেওয়ার মত জীবনের সাড়া জেগেছে।

বৃদ্ধ নিজেও বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। বহুদর্শী ব্যক্তি। সন্তোষচন্দ্রের বয়স তখন নবীন না হ'লেও যৌবন অতিক্রম করে নি। সুপুরুষ সুন্দর মানুষ ; প্রশান্তির আবরণের মধ্যে বিষণ্ণতার আভাস তাঁর দৃষ্টিতে, বাক্যে, ব্যবহারে। সন্তোষচন্দ্রের সঙ্গে ট্রেনের মধ্যেই শাস্ত্রালাপ করছিলেন। গেরুয়া-ছোপানো হ'লেও পরনে তাঁর বাঙালীর মতই ধুতি পিরান চাদর জুতা সবই ছিল। শাস্ত্রালাপের পরেই এল পরিচয়ের পালা। সন্তোষ বাড়ি বললেন—বিক্রমপুর। বৃদ্ধ প্রশ্ন

করতে লাগলেন—বিষ্ণু পণ্ডিতকে চিনতে? রামহৃদয় চক্রবর্তীকে জানতে? বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর ছেলে? অনর্গল নাম ব'লে যেতে লাগলেন। বললেন—বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ছিলেন আমার মাতুল, আবার আমার খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর কন্যার।

চমকে উঠলেন সন্তোষ। বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী তাঁর মাতামহ। এই ব্যক্তিটি তার ভাগিনেয়, অর্থাৎ মায়ের পিসতুত ভাই, আবার ভাসুরও বটেন—এঁর খুড়তুত ভাই বিষ্ণুপদের জামাতা অর্থাৎ তাঁর বাপ অক্ষয়চন্দ্র।

বিস্ময় প্রকাশের আতিশয্যের মধ্যেই সন্তোষচন্দ্র ধরা প'ড়ে গেলেন। তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন—আপনি কি তা হ'লে দীনতারণ মুখুজ্জে মশাই?

ভদ্রলোক হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন—পৌনে ন গণ্ডা বিয়ে ক'রে পঁয়ত্রিশটা অবলাকে তরিয়েছি বটে, তা ছাড়া দীনতারণের কোন লক্ষণই নাই। তবে দীনতারিণী-ভরসা মুখুজ্জে বলতে পার। ব'লেই তিনি গান ধ'রে দিলেন—"দীনতারিণী তারা মা"

অবাক হয়ে গেলেন সন্তোষচন্দ্র। এই বৃদ্ধবয়সে এমন গলা আর গানে এমন দখল? গান তিনি গাইতে পারতেন না। কিন্তু বাজনার শখ ছিল। ট্রেনের বেঞ্চিতেই টোকা দিয়ে ঠেকা দিয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতসারে। সেটুকু দীনু জ্যেঠার নজর এড়ায় নি। তিনি তালের মাথায় থেমে বলছিলেন—বেশ, আসে দেখছি যে! অ্যাঁ! নাও, তা হ'লে ভাল ক'রে বাজাও। নাও, এই রামায়ণখানাই বাজাও। গান শেষ হতেই সন্তোষচন্দ্র প্রণাম করেছিলেন দীনু জ্যেঠাকে। তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছিলেন—আরে গোঁসাই, তুমি কর কি? তুমি সন্ন্যাসী, আমি গৃহী।

—আপনি আমার জ্যাঠামশায় এবং মামা দুইই।

—তার মানে?

—আমি বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর দৌহিত্র, সন্তোষ আমার নাম।

অক্ষয়ের ছেলে তুমি? বিষ্ণু পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে করেছিলে

প্রথম পক্ষে? দ্বিতীয় পক্ষে বর্ধমানে? অক্ষয়ের শেষপক্ষের খুড়শ্বশুরের মেয়েকে? তুমি তো সেখানে সম্পত্তি পেয়েছিলে? হঠাৎ সন্ন্যাসীর ভোল কেন? আঃ, তোমার নাম-চরিত্র এ আমি অনেক শুনেছি হে! ব্যাপার কি বল তো বাবা?

* * * *

এই দীনতারণ মুখুজ্জেই সন্তোষচন্দ্রকে নিয়ে এলেন নবগ্রামে। স্নেহে সমাদরে সন্তোষ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সকল কথাই বলেছিলেন এই আত্মীয়টিকে, নিতান্ত আবেগের বশেই ব'লে ফেলেছিলেন। দীনুবাবু বলেছিলেন—তা এর জন্য সন্ন্যাসী কেন হবে বাবা? আবার বিবাহ ক'রে সংসারী হও। অবশ্য বিক্রমপুরে ফিরে যেতে পার, কিন্তু সে গিয়ে সুখ পাবে না। তোমার বর্ধমানের এই পত্নীটি ভয়ঙ্করী, কিন্তু বিষ্ণু পণ্ডিতের কন্যা তেজস্বিনী, তার উপর তাদের সংসারটারই গোত্র পরিবর্তন হয়েছে। ইংরিজী ঝাঁজ সহ্য করতে পারবে না।

সন্তোষ বলেছিলেন—সেই জন্যেই সন্ন্যাসী হয়েছি। বিবাহ আর আমি করব না।

—ভাল, বিবাহ না কর, কোন ক্ষতি নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি যাচ্ছি আমার এক শ্বশুরালয়ে—নবগ্রামে। সেখানে অট্টহাস ব'লে মহাপীঠ আছে। ভাল গ্রাম, চমৎকার গ্রাম। বর্ধিষ্ণু লোকের বাস। চল আমার সঙ্গে।

তিনি ধ'রে নিয়ে এলেন সন্তোষচন্দ্রকে। নবগ্রামের জমিদার কুলীন কেশব চক্রবর্তীর সন্তান কৈলাসবাবুর জ্ঞাতি ভগ্নীপতি এবং বন্ধু ছিলেন দীনতারণবাবু। কৈলাসবাবুর এক মেয়ে প্রমদা তখন বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে। পাত্রের প্রয়োজন ছিল। দীনতারণবাবুকে সন্ধানের কথা বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন, দেখো মুখুজ্জে, এবার যেন এক নম্বর নমুনার বস্তু না হয়!—অর্থাৎ তাঁর প্রথম জামাতার মত। প্রথম জামাইটি বয়সে তরুণ, রূপও আছে, কুলীনপুত্রের

অহঙ্কার আছে, কিন্তু মদ্যপ এবং চরিত্রহীন। তার উপর মূর্খ। সেকালে বড়লোকের ছেলে বা জামাইয়ের মদ্যপান দোষের ছিল না, চরিত্রহীনতাও না। কৈলাসবাবুর বড় ছেলে স্বর্ণ এবং সে তখন জুড়িগাড়ির জোড়া ঘোড়ার মত এক তালে এক সঙ্গে ছুটছে। তাতে লোকসমাজে চন্দ্রের কলঙ্ক-গৌরবের মত একটা দুর্বিনীত গৌরবও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মূর্খতা ছিল অসহনীয়। সেই কারণেই কৈলাসবাবু ও-কথা বলেছিলেন। তিন-চারটি পাত্রের সন্ধান অবশ্য নিয়েই ফিরছিলেন দীনতারণবাবু, কিন্তু পথে সন্তোষকে পেয়ে তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের পরিচয়েই এই ছেলেটির চিত্তের নির্মলতা অনুভব করেছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞানেরও পরিচয় পেয়েছিলেন, তারপর তার সঠিক পরিচয় পেয়ে আর কোন সংশয় রইল না। তার উপর তাঁর নিজের একান্ত আত্মীয়। সে দিক দিয়েও একটি মমতার উৎস যেন অকস্মাৎ মাটি ভেদ ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পড়ল। কৈলাসবাবু তাঁর বন্ধু। বর্ধিষ্ণু প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাঁর কন্যা প্রমদাও তাঁর জানা মেয়ে। ভাল মেয়ে ; চমৎকার মেয়ে। কথা একটু বেশী বলে, সে একালের বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে মাত্রেই বলে, তবুও শোভনতা আছে, শালীনতা আছে। সন্তোষ অসুখী হবে না। আর প্রমদা লাস্যময়ী মেয়ে, তার শ্রীতে লাবণ্যে মদিরতা আছে একটি, যাতে এই যুবক সন্ন্যাসীটির অঙ্গাবরণের গৈরিক বর্ণ অনায়াসেই গাঢ় লাল পট্টবস্ত্রে রূপান্তরিত হবে নিঃসন্দেহে। কৈলাসবাবুও মেয়েদের বাড়ি দিয়েছেন, জমি বাগান পুকুর জমিদারীর অংশ দিয়েছেন। সন্তোষ অসুখী হবে না।

সন্তোষকে নিয়ে এলেন নবগ্রামে।

কৈলাসবাবু দেখে মুগ্ধ হলেন।

প্রমদাকে দেখে সন্তোষও প্রীত হলেন।

দীনতারণবাবু তাকে বুঝালেন। বললেন, বিক্রমপুর পরগণার সেই গ্রামটি অসহনীয়রূপে উত্তপ্ত। পথের নদীগুলি তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে উত্তাল।

সন্তোষ রাজী হলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই রাজী হলেন। এই কয়েক বৎসরে কালিদাসীর পিত্রালয়ের মানসিক অশান্তি আজ ঘুচে এসেছে, কিন্তু দৈহিক আহারে বিহারের অভ্যাস ঘুচছে না। তার উপর শান্তি-সন্ধানী মন প্রমদাকে দেখে ভাবলে, প্রমদাকে পেলে শান্তি পাবে।

বিবাহ হয়ে গেল।

* * * *

কিশোরবাবু বললেন—এখানকার কথা তো জান! এখানকার কথা তিনি বইয়ে লিখে রেখে গেছেন। তুমি জান কি-না জানি না, তোমার বাবা ডায়রী রাখতেন। সেই ডায়রী তিনি সন্তোষবাবুকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্তোষবাবু শেষ বয়সে নবগ্রামের কথা নিয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এখান থেকে প্রমদাদির মৃত্যুর পর চ'লে গেলেন—তখন আমাকে সেখানি দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি শেষ করতে পারলাম না, তা ছাড়া কিশোর, একালের সকল কথা বুঝি না, সকল মানুষকে জানি না, জানা যায় না, বুঝা যায় না। তাই তো বুড়ো হই, জীর্ণ হই। তাই তো "জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি'র ব্যবস্থা! একালের কথা তুমি লিখো।

—কিশোর!

সম্ভ্রমপূর্ণ নারী-কণ্ঠস্বর। শুনেই কিশোর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

—দিদি?

গৌরীকান্তকে বললেন—শান্তির মা এসেছেন।

শান্তির মা? নন্দলালবাবুর দিদি? সন্তোষবাবুর প্রথমা পত্নী?

সাদা থান প'রে দীর্ঘাঙ্গী দেবকী দেবী এসে প্রবেশ করলেন।

গৌরীকান্তও উঠে দাঁড়িয়েছিল সম্ভ্রমভরে। সে প্রবেশপথের দিকেই তাকিয়েছিল।

ইনিই সেই তেজস্বিনী? ইনিই সেই বহু কাহিনীর, বহু কল্পনার বিস্ময়সৃষ্টিকারিণী দেবকীদিদি? তার কি কোন অবশেষই নেই?

কালো লম্বা একটি মেয়ে।

সাত

গৌরীকান্তের বুঝতে বাকী রইল না যে, দেবকী দেবী সারা জীবনটা এক অনির্বাণ বহ্নিদাহে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়েছেন এবং সে বহ্নিদাহ এমনই প্রচণ্ড যে, তাঁর বাইরেও তার ছাপ ফেলতে বাকী রাখে নি অথবা অবশ্যম্ভাবীরূপেই ছাপটা ছায়ার মত ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনের একটি দু ছত্রে সম্পূর্ণ কবিতা মনে প'ড়ে গেল তার।

বহ্নি যদি বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফুলে ফলে পল্লবে বিকাশে।

দেবকী দেবীর জীবন কল্পিত দাবদাহে দগ্ধ হয়ে গেছে। তাতে কেমন ক'রে যে শান্তি ফুল হয়ে ফুটল সে ভেবে বিস্ময়ের তার আর অবধি রইল না।

দেবকী দেবী গৌরীকান্তের বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে হেসে বললেন—কি বাবা, আমার এই পোড়াকাঠের মত দেহখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছ? ভাবছ এই মানুষের এত গল্প? নন্দ শান্তি এরা অনেক গল্প করেছে তো?

লজ্জিত হয়ে গৌরীকান্ত তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলে; প্রণাম করলেই আশীর্বাদের ধারায় ও-কথাটার মোড় অবশ্যম্ভাবীরূপে ফিরে যাবে। দেবকী দেবী আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু কথাটার মোড় ফিরল না। বললেন—রাজার যুগই নেই। 'রাজা হও' ব'লে আশীর্বাদ করব না। আশীর্বাদ করছি, যে দেবতার সাধনা কর, সেই দেবতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আর যেন পিতৃপুরুষের ভিটেতে তোমার অক্ষয় অধিকার বংশানুক্রমে বজায় থাকে। বাবা, আমার এই পোড়াকাঠের মত দশা—এ দশা আমার ছিল না। আমার পিতৃপুরুষের ভিটে—পিতামহের শিবমন্দির ছেড়ে এলাম, সেই দুঃখে আমি পুড়ে গেলাম—তুমি তো জান বাবা, তুমি তো নন্দর নারাণগঞ্জের বাড়ীতে

গিয়েছিলে। আমি একদিনের জন্যে সেখানে যাই নি। ওই একবার নন-কো-অপারেশনের সময় ছ মাস ছিলাম জেলে, সেই সময়টা ছাড়া আমার ঠাকুরদার শিবের মাথায় জল না-দিয়ে একদিন জল মুখে দিই নি। হঠাৎ কণ্ঠস্বরে সুর বদল ক'রে বললেন—কিন্তু তোমাকে দেখেও তো বুঝবার উপায় নেই যে, তুমি একজন মস্ত লিখিয়ে গৌরীকান্ত, সারা দেশে তোমার নাম-ডাক। পথে-ঘাটে দেখা হ'লে সনাক্ত করবার লোক না থাকলে তুমি হলপ ক'রে বললেও বিশ্বাস হবে না কারুর। নন্দ শান্তির কাছে শুনেছিলাম বটে, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত তুমি। কিন্তু—

কিশোরবাবু কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়েই বললেন—কিন্তু এত নগণ্য সাধারণ, তা কল্পনা করতে পারেন নি?

গৌরীকান্ত এবার হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরবাবুও। গৌরীকান্ত বললে—জানেন না বুঝি, একবার আমাদেরই এক অপরিচিত আত্মীয় আমাকে গৌরীকান্ত ব'লে স্বীকারই করেন নি। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ। তিনি ট্রেনে নবগ্রামের কথাই গল্প করছিলেন, আমি একটু উৎসুক হয়ে নবগ্রামের পাঁচজনের কথা প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিয়ে শেষে বললেন, নবগ্রামের এত খবর রাখেন, কিন্তু একটা বড় খবর রাখেন না? লেখক গৌরীকান্তের বাড়ী নবগ্রাম, এটা জানেন না? ব'লেই গৌরীকান্ত সম্পর্কে গল্প শুরু করলেন। সে সব বিচিত্র গল্প! আমি একটু কৌতুকভরেই জিজ্ঞাসা করলাম—গৌরীকান্তকে চেনেন আপনি? তিনি তো প্রথমেই এক ধমক দিলেন। আপনি কেমন অভদ্রলোক মশাই? গৌরীকান্ত, গৌরীকান্ত! গৌরীকান্তবাবু বলুন। আমি বলছি, তার কারণ সে আমার আত্মীয়। আর আমি তাকে চিনি না? ঠিক এই সময়েই নাটকীয় ঘটনা-সন্নিবেশের মত আমার এবং তাঁর উভয়েরই পরিচিত এক ভদ্রলোক ট্রেনে উঠলেন। বর্ধমান স্টেশনে গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে। হৈ-হৈ ক'রে ভদ্রলোক

আমাদের দুজনের মাঝখানে ব'সে দুজনের সঙ্গেই পালা ক'রে কথা বলতে শুরু করলেন। এঁকে চেনেন না? বিখ্যাত লেখক গৌরীকান্ত। ও, উনি তো আপনার দেশের লোক, আপনার সঙ্গে তো আত্মীয়তা আছে! কিন্তু পরিচয় নেই বুঝি? হঠাৎ আগেকার ভদ্রলোক দুরন্ত ক্রোধে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন—নেভার! কক্ষণো না! হি ইজ নট গৌরীকান্ত। হ'তে পারে না। এ ড্যাম চিট। ব'লেই হন হন ক'রে গাড়ী থেকে নেমে অন্য কামরায় উঠে বসলেন।

সকলেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে দেবকী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তিনি তোমার ছেলেবেলার কত গল্প আমার কাছে করেছেন। তোমার, তোমার বাবার, তোমার মায়ের। প্রায় নিত্যই দিনান্তে একবারও বলতেন নবগ্রামের কথা, নবগ্রামের কথা উঠলেই তোমাদের কথা উঠত। তোমরা তিনজন ছাড়া প্রিয়জন ছিল কিশোর। হয়-তো সব থেকে প্রিয়ই ছিল কিশোর। নন্দ-শান্তি—এদের কাছে তিনি এসব কথা বলতেন না। বলতেন—দেখ তুমি আমাকে মার্জনা করতে পেরেছ, ওরা তো তা পারবে না। ওরা একালের বিচিত্র মানুষ। ওদের আমি ভয় করি। ওদের কাছে কি অন্য শ্বশুরবাড়ীর গল্প করতে পারি?

কথার মাঝখানেই তিনি হাসলেন। বললেন—বিচিত্র মানুষ ওরা, তাতে সন্দেহ নেই। গৌরীকান্তের পরিচয় ওদের কাছে—সে বাংলা দেশের লেখক। তারও যে বাপ-মা ছিল, বাড়ী ছিল—এসব ওরা ভাবতেও পারে না, জিজ্ঞাসাও করে নি কোনদিন।

কিশোরবাবু বললেন—সে অপরাধ থেকে গৌরীকান্তও বাদ যায় না দিদি। সন্তোষদার ছবি দেখেও ওর চেনা উচিত ছিল। শেষ বয়সে সন্তোষদা দাড়ি রেখেছিলেন, তাতে চেহারা খানিকটা বদলেছে বটে, কিন্তু তাঁর চোখ নাক আর ত্রিবলীরেখাঙ্কিত কপালখানি দেখে অন্তত মনে

হওয়া উচিত ছিল যে, এ তো আমার চেনা মুখ। সে ফোটো তো আমি দেখেছি। আমি দেখবামাত্র চিনেছি। রাজার মত ললাট ছিল সন্তোষদার। এমন ত্রিবলী তো আর দেখলাম না। যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের অতি সূক্ষ্ম অস্ত্র দিয়ে কেটে আঁকা।

গৌরীকান্তের মনে প'ড়ে গেল। সত্যই তাই। অথচ তার চোখে এটা তো পড়ে নি!

দেবকী দেবী বললেন—আমিও ওঁর ওই কপাল দেখেই চিনেছিলাম। ছাব্বিশ বছর দেখি নি। বয়সের পরিবর্তন তার উপর সন্ন্যাসীর বেশ, মুখে তখন বেশ দাড়ি গজিয়েছে; হঠাৎ দেখে তো চেনবার কথা নয়! ভোরবেলা উঠে শিবমন্দিরে জল দিতে গিয়েছি, সকাল সকাল সেরে নিয়ে মীটিং করতে যাব। নন-কো-অপারেশনের বাজনা বেজে উঠেছে। নন্দ ঢাকায়। আমাদের অঞ্চলের ভার আমার উপর। মনের অবস্থাই তখন অন্যরকম। ধর্মে দেবপূজায় মন ওঠে না, তবু বাবার অন্তিম আদেশ মনে ক'রে শিবমন্দিরে জল না দিয়ে, ফুল না দিয়ে পারি না। বাবা শেষ মুহূর্তটিতে আমাকে ডেকে বলেছিলেন—নন্দর উপর ভরসা আমি রাখি না মা। হয়তো তোদের দুজনের পরেই এ বংশের শেষ। মহাকালের খেলায় তাতে লাভ নেই, ক্ষতিও নেই জানি। তবু যতদিন তুই আছিস মা, ততদিন আমার বাবার প্রতিষ্ঠা-করা শিব যেন অস্নাত অপূজিত না থাকেন।

* * * *

বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু সম্ভ্রম ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। সকল বিশ্বাসের বুনিয়াদ যেন ভূমিকম্পে ফেটে গিয়েছিল; স্বামীর আচরণের উত্তাপেই সে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। দেবতা পরলোক ধর্ম-জীবন সব কিছুরই উপর অনাস্থা এসেছে তখন, তবুও বিষ্ণু শাস্ত্রীর কন্যার পক্ষে অবজ্ঞা বা ঘৃণা পোষণ করা স্বাভাবিক ছিল না। মৃত গুরুজনের বাঁধানো ছবিকে যেমন ফুল দিয়ে সাজায়, ঝাড়ে, মোছে—ব্যাপারটা অনেকটা তাই দাঁড়িয়েছিল।

শিবমন্দিরের দাওয়ায় সন্ন্যাসী শুয়ে ছিলেন।

নবগ্রামের স্ত্রী মারা গেলেন। শ্যালক স্বর্ণবাবুদের দালানের একাংশে তিনি একান্তভাবে স্বজনহীন একক প'ড়ে রইলেন। প্রথম তিন দিন শ্যালকেরা নিমন্ত্রণ করলেন—এইখানেই খাবেন মুখুজ্জে।

ত্রি-রাত্র পরে ভাইদের অশৌচান্ত হ'ল। তারপর অকস্মাৎ সংসারের একাকীত্বে স্বরূপটা নগ্ন হয়ে মুখ বের ক'রে দাঁড়াল। অশৌচান্তের পর হবিষ্যান্ন রান্না ক'রে তাঁকে কে দেবে? তিনি হেসে নিজেই রান্না করেন হবিষ্যান্ন।

অপরাহ্ণে স্বর্ণবাবু ডেকে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, বাবা মেয়েদের সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন, দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা ভোগ করবে। কিন্তু শুভদার তো—। এখন সম্পত্তি হ'ল আপনার। বর্ধমান জেলায় আপনার দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানাদিও আছে। কথা হচ্ছে, আপনার অন্তে তারাই হবে আপনার উত্তরাধিকারী। সুতরাং—

এই কারণেই সন্তোষবাবুর কাছে স্বর্ণবাবু প্রস্তাব করলেন—অন্তত বাড়ীর অংশটা তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। তাঁদের বাড়ীর ভিতরে অন্য কাউকে অংশীদার হিসেবে প্রবেশ করতে দিতে রাজী নন তাঁরা।

সন্তোষবাবু হেসে বলেছিলেন—জীবনের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। বলেছিলেন তাই—স্বর্ণবাবু, তোমাদের গ্রামে যে দিন এসেছিলাম—সে দিন সন্ন্যাসীর গেরুয়া প'রেই এসেছিলাম। সে গেরুয়া আজও আছে আমার বাক্সের মধ্যে। আর কিছু মনে ক'রো না ভাই, আমার সঙ্গে তোমার কুটুম্বিতার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধনই হয় নি। প্রাণের বন্ধন হয়েছিল রাধাকান্তবাবুর সঙ্গে—সেও নেই। শুভদাও চ'লে গেল। এখন আমার ছুটি। তোমাদের জিনিস তোমরা নাও। ওতে আমার প্রয়োজন তো কিছু নেই। বল, কিসে কি সই করতে হবে, ক'রে দিচ্ছি।

দলিল প্রস্তুত হয়েই ছিল। হাসিমুখেই সই ক'রে দিয়ে সন্তোষবাবু বলেছিলেন—মাধব। মাধব! আজ ভাই তুমি আমাকে মুক্তি দিলে।

পরক্ষণেই মনে পড়েছিল—মুক্তি হয় নি কিছুকাল আগে, শ্যালকদের সঙ্গে মনোমালিন্য কলহে পরিণত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় তিনি

নি। তারই মধ্যে বোধ হয় কাঁপতে কাঁপতেই ছুটছিলেন, হঠাৎ গাছের শিকড়ে পা বেধে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেলেন; গতির মুখে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড বেগে মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে প'ড়ে জ্ঞান হারালেন তিনি।

দেবকী দেবী বললেন—আমাকে যেতে হ'ল। কি হ'ল দেখতে গেলাম। দেখলাম, শুধু অজ্ঞানই হন নি, গায়েও তখন জ্বর।

*   *   *   *

তিন মাস ভুগে তিনি সেরে উঠলেন।

নন্দ বিরক্ত হয়েছিল। আমি নিজেও কম বিরক্ত হই নি। আমার জীবনে তখন বেগ এসেছে, ভিতরে যখন আগুন লাগে তখন মাটিতে পড়ে পুড়ে ছাই হওয়াও যায়, আবার হাউইয়ের মত আকাশে ছুটে বেড়িয়ে জীবনটাকে শেষ ক'রে তবে মাটিতে লুটিয়ে পড়াও যায়। আমার জীবনে তখন হাউইয়ের নেশা চেপেছে। এ সময় কেউ তাকে চেপে ধরলে তাতে আঁচ লাগবে বইকি! সেবা করেছি, ওষুধ দিয়েছি, পথ্য দিয়েছি—কটু কথাও বলেছি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সে মানুষটা নীরব নির্বাক। যন্ত্রণা অসহ্য হ'লে 'মা' ব'লে ডেকে কাতরানো ছাড়া আর কথা বলে নি। কখনও নিতান্ত তৃষ্ণায় বলেছে—একটু জল। কোনদিন অভিমান বা রাগের বশেও বলে নি—আমাকে মরতে দাও। কেন তোমরা সেবা করছ? কেন বাঁচাচ্ছ?

নন্দ বলেছিল—দিদি, আমি বলি কি, ঢাকায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দি।

আমার কিন্তু এটা ভাল লাগে নি। বলেছিলাম—নন্দ, স্বামীসেবার পুণ্যে স্বর্গে যাবার কামনা আমার নেই ভাই, বিশ্বাসও করি না। কিন্তু বিক্রমপুরের শাস্ত্রীদের ভিটে থেকে একজন রুগ্ন মানুষকে ভার বোঝা ভেবে হাসপাতালে পাঠাতে—আমি বেঁচে থাকতে দেব না।

তিন মাস পরে পথ্য পেলেন, এর দিন কয়েক পরে বললেন—এইবার আমাকে মুক্তি দাও দেবকী। আমি বেশ যেতে পারব।

তিক্ত হেসেই আমি বলেছিলুম—ভয় নেই, আমি তোমাকে বেঁধে

রাখতেও চাই নে। তোমার দাম আমার তো অজানা নয়। ঝুটো কাচকে আমি হীরে মাণিক ভেবে আঁচলে বেঁধে রাখব না। আমি বর্ধমানে একটা চিঠি তোমার অসুখের সময় লিখেছিলুম। তারা উত্তর দিয়েছিল—'নবগ্রামে শুভদা দেবী, কেয়ার অফ স্বর্ণভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। তিনি আজ কুড়ি বৎসর হইল—আমাদের এখান হইতে চলিয়া গিয়া শুভদা দেবীকে বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাস করিতেছিলেন। আমাদের এখানে এখন মামলা মকদ্দমা চলিতেছে। কাহারও যাইবার অবসর হইবে না। এই মাসেই তিন চারটি মামলার দিন আছে। ফৌজদারী মামলায় হাজির না হইলে হয় মামলা নষ্ট হইবে, নয় সাজা হইবে।' ✓

দেবকী দেবী বলেছিলেন—যেন কোন 'অমৃত সমান' কথা পাঠ ক'রে বলেছিলেন। কাশীদাসের মহাভারত বা কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ কথার মত। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান—কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।'

বললেন—তারপর হেসে বলেছিলাম, নবগ্রামেও পত্র লিখেছিলাম কিন্তু তার জবাবই আসে নি। তা হ'লে আবারও একটা বিয়ে করেছিলে তুমি? একটা, না আরও কয়েকটা—সে তুমিই জান। কিন্তু এদের যা ভক্তি দেখছি তোমার উপর, তাতে এতদিনের মধ্যে অসুখ হ'লে করতে কি?

তিনি হেসে বলেছিলেন—পঁচিশ বছরের মধ্যে আমার অসুখ করে নি দেবকী।

আমার জন্যেই জমা ছিল? তা ভাল। কিন্তু হঠাৎ তুমি এলে কেন? শুভদা ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে?

শুভদা নেই দেবকী।

নেই? মারা গেছে? সেই কারণেই সন্ন্যাসী হয়েছিলে? তা আমার যন্ত্রণা বাড়াতে এখানে এলে কেন? তীর্থস্থানের তো অভাব ছিল না?

তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম দেবকী।

বার বার অস্বীকার ক'রে আমি দাঁতে দাঁত টিপে ব'লে উঠেছিলাম—না, ক্ষমা তোমাকে আমি করতে পারব না। আর আমার কাছে ক্ষমা চেয়েই বা তোমার লাভ কি? হবে কি? যদি ভেবে থাক, গেরুয়া ছাড়িয়ে তোমাকে আবার নববস্ত্র পরিয়ে এখানে সমাদর ক'রে স্থান দেব, তবে ভুল করেছ। আমি আমার পথ পেয়েছি। তোমার পথে তুমি যাও, আমার পথে আমি যাব। তবে—এতদিন যখন সেবা নিয়েছ তখন আর পনেরো কুড়ি দিন সেবা নাও। শরীরটা আর একটু শক্ত হোক।

দেবকী দেবী বললেন—অদৃষ্ট, নিয়তি, পূর্বজন্মের কর্মফল, জন্মান্তর এ সব আমি ছেলেবেলায় মেনেছি। কিন্তু তার পর সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল, মানতাম না—আজও মানি না বাবা। কিন্তু যা সংসারে ঘটে বাবা, তার একটা পাকচক্র আছে। যতই মনে কর—জোর ক'রে ছিঁড়ে দিলাম বা আলেকজাণ্ডারের তরোয়ালের ঘায়ে বাঁধন কাটার মত তাকে কেটে ফেলতে চেষ্টা কর, ও-জট ছাড়ে না। ভেবেছিলাম মানুষটিকে সুস্থ ক'রে তুলে তাকে তার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব—যাও, তোমার ওই পথ। তারপর আমার পথে আমি চলব। তখন নন-কো-অপারেশনের আন্দোলনে জোয়ার ধরেছে—মনে হচ্ছে, অমাবস্যা কি পূর্ণিমার দেরী নেই। ভরা কোটালের যেন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে! মন আমার ছট্‌ফট্ করছে ছোটবার জন্য। কিন্তু আত্মসম্বরণ করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে—ওই কারণে।

হাসলেন দেবকী দেবী; বললেন—আমি আত্মসম্বরণ করতে চাইলে কি হবে, জোয়ারের টান এসে জোর ক'রে আমায় টেনে নিয়ে গেল। একদিন সকালে খবর এল—নন্দ ঢাকায় গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রামে মিটিং হয়ে গেল। আমায় যেতে হ'ল, সভানেত্রীত্ব করতে হ'ল। সভা শেষ ক'রে ঘরে ফিরছি, পথে পুলিশ এসে আমায় গ্রেপ্তার করলে। পথ

থেকেই চ'লে গেলাম। ওই ওঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লেই আর ঘরে যেতে চাইলাম না। নইলে পুলিশ তাতে অমত করত না। যাবার সময় একজনকে ব'লে গেলাম—রোগা মানুষটা রইল, একটু দেখাশুনা ক'রো। একটু সারলেই তিনি চ'লে যাবেন। তখন ঘরদোরটা দেখো।

ছ মাস জেল হ'ল। ছ মাস পর ঘরে ফিরলাম। নদীর ঘাটে গাঁয়ের লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল ফুলের মালা নিয়ে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে ভিড় ঠেলে পা বাড়ালাম। দেখলাম, সবার পিছনে দাঁড়িয়ে উনি। সেদিন যে কি তিক্ত হয়ে উঠেছিল আমার অন্তর, সে তোমাকে কি বলব? সবার সামনেই বললাম—আজও তুমি যাও নি?

তিনি হেসে বললেন—কাল যাব। আজ তুমি এলে—

—কেন? তার কি দরকার ছিল?

বললেন—তোমায় ধ'রে নিয়ে গেল, খবর পেয়ে নদীর ঘাট পর্যন্ত কোনরকমে যখন সেদিন এলাম, তখন তোমাদের নৌকো চ'লে গিয়েছে। তাই যেতে পারি নি। আর, ঘরদোর আগলানো, শিবের পূজা—এর ব্যবস্থা দেখলাম—যাঁরা করতে চাইলেন তাঁদের দিয়ে ঠিক হচ্ছে না। তাই থেকে গিয়েছি। কাল যাব আমি।

* * *

তারপর কাল গেল, পরশু গেল, দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল—তিনি গেলেন না, আমিও যেতে দিতে পারলাম না।

কি যে হ'ল, কোথায় যে ছিল এত আক্রোশ, এত রোষ, এত ক্ষোভের মধ্যেও আমাদের ভালবাসা কি ক'রে যে বেঁচে ছিল তা বুঝতে পারি নি বাবা। তুমি সন্তানের মত কিশোর, আমার দেওর বল দেওর, সহোদর বল সহোদর—তোমাদের সামনেও সে ভালবাসার কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে না। পৃথিবীর সামনেও বলতে আমার লজ্জা নেই। বাবা, ছাব্বিশ বছর পরে প্রৌঢ় বয়সে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুজনের প্রথম মিলন হ'ল, সে দিন সারাটা রাত তিনি যত কেঁদেছিলেন—আমি তত কেঁদেছিলাম।

ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে কে ডাকলে—কিশোরবাবু!

কর্কশ কণ্ঠস্বর। সে ডাকে এই স্মৃতিকথার আসরটি যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সুর, সূত্র, স্বপ্ন সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেল।

কিশোরবাবু চমকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বিজয়ের গলা। দিদি, আপনি উঠুন। শান্তি বোধ হয় ফিরল শ্মশান থেকে।

বোধ হয় নয়, শান্তিই ফিরেছে। সে ভিজে কাপড়ে ভিজে এলো-চুলে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল।

—মা! বৈশাখী রৌদ্রে সব প্রায় শুকিয়ে এসেছে, চুলগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চোখ দুটি হয়ে উঠেছে টকটকে রাঙা।

এতক্ষণে গৌরীর খেয়াল হ'ল, আজ ১৩৫৫ সালের নববর্ষ—১লা বৈশাখ। সুদীর্ঘ কাল—বোধ হয় ষোল বৎসর পর সে তার পিতৃপুরুষের বাসভূমি নবগ্রামে ফিরেছে। পরাধীন দেশের বিদেশী রাজশক্তির ক্রীতদাসের মত জমিদারপ্রধান বিকৃতসমাজ নবগ্রাম থেকে একদিন সে প্রায় বিতাড়িত হয়েছিল, আজ সে ফিরেছে স্বাধীন নবগ্রামে, সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে ফিরেছে নাটকের নায়কের মত। এখানে এসে সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য—ষোল বছর পর বিচিত্র ঘটনাসংস্থানে দেখা পেয়েছে শান্তির। নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বিক্রমপুরের বিপ্লবী নন্দলালবাবুর ভাগ্নী শান্তি। তার মুগ্ধ পাঠিকা। প্রগাঢ় স্নেহের পাত্রী। তার প্রতি অনুরাগ বা আনুরক্তি নয়; স্নেহ—সত্যকারের স্নেহ। আরও বিস্ময়ের কথা, সন্তোষ পিসেমশাইয়ের মেয়ে শান্তি। আশ্চর্য এবং বিচিত্র যোগাযোগ!

দেবকী দেবী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—পয়লা বৈশাখ ভাল শুরু করলি!

শান্তি ক্লান্ত হয়ে ব'সে পড়ল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হাঁ, ভাল, খুব ভাল।

গৌরীকান্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল—এ কি অবসন্নতা তার মুখে, তার সর্বাঙ্গে! পরক্ষণেই মনে হ'ল, শুধু অবসন্নতাই নয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো ছায়ার মত একটি বিষণ্ণতা তার সর্বাঙ্গে ফুটে

উঠেছে। বৈশাখের তৃতীয় পহরে উত্তাপক্লিষ্ট গাছের পাতাগুলি ম্লান হয়ে পড়ে; কিন্তু তার সঙ্গে যে গাছের মূলে মর্মান্তিক অস্ত্রাঘাত হয়েছে, কি কোন পোকায় যার শিকড় কেটেছে, তার পত্রপল্লবের বিষণ্ণ অবসন্নতার সঙ্গে পার্থক্য অনেক। কি হ'ল শান্তির? এই বৈশাখের রৌদ্রে তেতে পুড়ে ম্লান ক'রে তার সর্দিগর্মি হয় নি তো? সান্‌স্ট্রোক্? সে ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে বললে—কি হ'ল শান্তি? শরীর খুব খারাপ মনে হচ্ছে? এ কি চেহারা হয়েছে তোমার?

একসঙ্গে দেবকী দেবী এবং কিশোরবাবু এবার শান্তির দিকে তাকালেন। দুজনেই একসঙ্গে শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—শান্তি!

শান্তি ম্লান হেসে বললে—না, হয় নি কিছু।

বিজয় দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠল—ওই শয়তান—ওই মহাদেব—'কু কথায় ভরা মুখ কণ্ঠভরা বিষ'—ফিরে আসবার পথে আবার ওঁকে অপমান করেছে। আমি ঘুষি মেরে ওর দাঁত ভেঙে দেবার জন্যে গিয়েছিলাম কিশোরবাবু, কিন্তু শান্তিদি—শান্তিদিই আমাকে দিব্যি দিলেন।

গৌরীকান্তের পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত আবার একটা উত্তেজনা ব'য়ে গেল। সকালে সে নিজের কানে শুনেছে মহাদেব সরকারের গালাগাল।

দেবকী দেবী স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিশোরবাবু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন।

গৌরীকান্ত শান্তিকেই প্রশ্ন করলে—কেন ,মি বিজয়বাবুকে নিষেধ করলে শান্তি?

শান্তির চোখ থেকে এবার জল গড়িয়ে পড়ল। দুটি বিশীর্ণ জলের ধারা ধীরে ধীরে নেমে এল গাল বেয়ে। সে তারই মধ্যে আবার হাসলে, বললে—ওই হতভাগিনী মেয়েটির জন্যে গৌরীদা। নইলে আমি ঢাকার মেয়ে, ছোরা মারতে জানি, যুযুৎসু শিখেছিলাম, তার উপর মামার শিষ্যা আমি, ভয় আমার নেই—সে-কথা আপনার চেয়ে ভাল ক'রে আর কেউ

তো এখানে জানে না। কিশোর মামাও জানেন না। আমি ঘুষি মারতাম না, এক চড় কষিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ওই হতভাগিনীর জন্য পারলাম না।

কথা শেষ ক'রেও সে প্রগাঢ় করুণার সঙ্গে ঘাড় নাড়লে।

বিজয় ব'লে উঠল—আশ্চর্য মেয়ে কিশোরবাবু। এমন লজ্জাহীন মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখি নি। সরকারের ওই পাষণ্ড ছেলেটার জন্যে মরতে পারে। শান্তিদি বলেছিলেন—তুমি আর ও-বাড়ি ঢুকো না। আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে যাতে পার, তেমনি ক'রে তৈরী ক'রে দেব তোমাকে। মেয়েটা পথে রাজী হ'ল। কিন্তু সরকারের বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সরকারের ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, ছুটে গিয়ে তার পায়ে আছাড় খেয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। লাথি মারলে শুয়ারের বাচ্চাটা, কিন্তু তবু উঠল না। শান্তিদি ডাকলেন—উঠে এস, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি ভাবলাম হাত ধ'রে তুলে আনব; দু পা এগিয়ে গেলাম; মেয়েটা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, না—না—না, আমি যাব না। কান্নার আওয়াজ পেয়ে মহাদেব সরকার বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে আবার আরম্ভ করলে—এ হারলট্, দুশ্চরিত্রা।

শান্তি উঠে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল।

কিশোরবাবু বললেন—বিজয়, থাম। থাম। মহাদেব সরকারের কথা থাক্।

—কেন? কষ্ট পাচ্ছেন?

—আঃ, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞানই হবে না হে? দিদির সামনে—! অর্থাৎ দেবকী দেবীর সম্মুখে।

দেবকী দেবী প্রশান্ত মুখেই বললেন—মিথ্যে অপবাদে হিংসার অভিশাপে আমি দুঃখ পাব না ভাই। নন্দলালের দিদি যতদিন ছিলাম ততদিন নিদারুণ ক্রোধ ছিল আমার। কিন্তু তাঁর কাছে দীক্ষা নিলাম, শিক্ষা পেলাম, তাতেই সহগুণ পেলাম। ভেবো না তোমরা, শান্তি বা আমি

মিথ্যে অপবাদে দুঃখ খানিকটা পাব, লজ্জা পাব না, মাথা হেঁট করব না। আর—

ব'লে যে কথাটা আরম্ভ করলেন দেবকী দেবী, সে কথায় বাধা দিলেন কিশোরবাবু। বাধা দিয়ে বললেন—থাক্ দিদি, ও কথা। আমি হাত জোড় করছি আপনার কাছে।

দেবকী দেবী বললেন, কিন্তু কথাটা যে বলতেই হবে কিশোর। গৌরীকান্ত তো শুনবেই। আমি না বললেও লোকে ওর কানে তুলে দেবেই ভাই। তা ছাড়া—

একটু হাসলেন দেবকী দেবী। হেসেই বললেন—সত্য গোপন করতে নেই কিশোর।

কিশোরবাবু বললেন—যা সত্য তা স্বীকার করতে হয়, সে কথা মানি দিদি, তাতে লজ্জা নেই সেও জানি। তবু ও কথাটা আপনাকে মুখে বলতে আমি দেব না। আমি বলব গৌরীকান্তকে।

ঠিক এই মুহূর্তেই কিশোরবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল শান্তি। তার মুখ চোখ এখনও লাল হয়ে রয়েছে। পয়লা বৈশাখের প্রথম দেড় প্রহরের রোদ তাকে যেন ঝলসে দিয়েছে। এখনও সে সুস্থ হতে পারে নি। সে বললে—চল মা, আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। যা বলবার কিশোর মামা ওঁকে বলবেন। চল। চললাম গৌরীদা। আজ নিমন্ত্রণ করেছিলাম আপনাকে। কিন্তু ফেরত নিয়ে যাচ্ছি।

বিজয় অদ্ভুত। ওর ওই হাড়সর্বস্ব দেহে ক্লান্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। বললে—চলুন। পৌঁছে দিয়ে আসব। অক্ষয় মুখুজ্জের দরজার সামনে হয়ে যেতে হবে। সেটা আবার মহাদেবের চেয়েও বদমাস। চলুন।

দেবকী দেবী বললেন—তুমি বাড়ী যাও বিজয়। অক্ষয় মুখুজ্জে তোমাকে দেখে তো ভয়ে চুপ ক'রে থাকবে না বাবা।

বিজয় বললে—কিন্তু আপনারা তো চুপ ক'রে থাকবেন। গালাগালি খেয়ে মাথা হেঁট ক'রে গিয়ে বাড়ী ঢুকবেন।

শান্তি হেসে বললে—চলুক মা বিজয়, বেচারার ঝগড়া ক'রে এখনও তৃপ্তি হয় নি। অক্ষয় মুখুজ্জে কু-কথা বললে ও খানিকটা চীৎকার ক'রে আনন্দ পাবে। কেন বেচারাকে এমন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে?

বিজয় বললে—এবার কিন্তু দিব্যিটিব্যি দেবেন না বলছি। দিলে মানব না। চ'লে গেলেন তিন জনে।

গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়েই ব'সে রইল।

কিশোরবাবু বললেন—লোকে বলে, শান্তি কুমারী অবস্থাতেই সন্তানের জননী হয়েছে। ক' মাস আগে, বোধ করি মাস চারেক আগে, ওরা এখানে যখন এলেন—তখন শান্তি অত্যন্ত রুগ্ন। আর দেবকী দেবীর কোলে মাস দুয়েকের একটি শিশু।

শান্তি কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে—আমার সন্তান নয়। শুধু এইটুকু ছাড়া আর কোন কথা বলবার নেই আমার।

দিদি বলেন—ওর বেশী আমাকেও শান্তি কিছু বলে নি। কলকাতায় এসে শান্তি কিছুদিন রেফিউজিদের মধ্যেই কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিল। ওর থেকেও রুগ্ন দেহে একদিন ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এল আমার কাছে। ফিরে এসেছে আট মাস পরে। কিন্তু শান্তিকে আমি জানি। তাকে অবিশ্বাস আমি করি না।

—ওদের সঙ্গের লোক যারা তারাও ওই কথাই বলেছে।

—সঙ্গের লোক? বিস্মিত হ'ল গৌরীকান্ত।

—দেবকী দিদিদের সঙ্গে আরও পনের জন লোক, চারটি পরিবার এসেছে। হাসলেন কিশোরবাবু। সকলেই সন্তোষদার জ্ঞাতি গোষ্ঠী। সন্তোষদা এখানে একখানি একতলা দালান করেছিলেন, মনে আছে তোমার?

—মনে আছে বইকি। এই তো কিছুক্ষণ আগেই সন্তোষ পিসে-মশাইয়ের কথা মনে করতে গিয়ে সব মনে পড়েছে। সেই বাড়ীটুকু ভরসায় দেবকী দেবীর সঙ্গে ওঁদের ওখানকার কয়েকটি পরিবারই এখানে এসেছে। মাথা বাঁচাবার সামান্য একটা আশ্রয় পেলেই এখন যথেষ্ট।

তারপর যা হয় হবে। চারটি পরিবারে আঠারো জন লোক। শান্তি এবং দেবকী দেবীকে নিয়ে কুড়ি জন।

—কুড়ি জন? সেই ঘরখানিতে?

—হ্যাঁ! এখন অবশ্য দু দলে ভাগ হয়েছে। একদল নন্দ মাস্টারের প'ড়ো বাড়ীখানা ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে গেছেন। একটি বিধবা দুটি ছেলে নিয়ে বিজয়দের বাড়ী রান্নার কাজ নিয়েছে। বলতে বলতে হাসলেন কিশোরবাবু। হেসে বললেন—নন্দ মাস্টারের বাড়ীর দল এখন দেবকীদিদিদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের মন্ত্রণাদাতা পেট্রন হ'ল এখন মহাদেব সরকার। শান্তির এ নিন্দা রটনা প্রকৃত পক্ষে তারাই করেছে। মহাদেব সরকার সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ ক'রে অহরহ উদ্‌গিরণ করছে।

গৌরীকান্ত চুপ ক'রে ব'সে রইল।

নন্দবাবুর ভাগ্নী, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁর কাছেই শান্তির দীক্ষা; দেবকী দেবীর মেয়ে শান্তি। তার সম্পর্কে এ কথা ভাবতেও মন যেন অপরাধ বোধ করে। তবুও মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠল। এই দেশ-জোড়া রক্তাক্ত বিপর্যয় এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে হয়তো—। শিউরে উঠল সে। পরক্ষণেই সে মন থেকে শান্তির কথা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলে। কি প্রয়োজন তার?

আট

দিন বিশেক পরের কথা। বিশে বৈশাখ। গৌরীকান্ত আপনার বাড়ীর দাওয়ার উপর ব'সে ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার বৎসর পয়লা বৈশাখ আসতে হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আবেগের বশেই হঠাৎ চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই টেনে স্যুটকেসে পুরে বিছানাও একটা যেমন তেমন বেঁধে স্টেশনের পথে দোকান থেকে একটা মশারি কিনে নিয়ে নবগ্রামে

এসেছিল। স্বাধীন দেশের প্রথম পয়লা বৈশাখের সূর্যোদয় নবগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখবে। গত সনেরই আগস্টে তাকে নবগ্রামের লোকে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু সে সে-আহ্বানে সাড়া দেয় নি। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তির দিন আর আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। অনেক দুঃখ পেয়ে সে একদিন নবগ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। উনিশ শো তেত্রিশ সনের কথা। তারপর উনিশ শো আটচল্লিশ। তার অপরাধ, নবগ্রামে উনিশ শো তিরিশ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সে-ই আরম্ভ করেছিল, তার নেতৃত্ব করেছিল। তারপর এই সুদীর্ঘ কাল সে নবগ্রামে আসে নি। সে দিন কেউ তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি। কেউ দুঃখ করে নি। অবশ্য কয়েকটি মানুষ ছাড়া। তিন জন। গৌরীকান্তের খুড়ীমা অর্থাৎ বিজয়ের মা, বিজয় আর কিশোরবাবু। দেশ স্বাধীন হওয়ার দিনে, পনেরই আগস্ট নবগ্রামের লোক তাকে যখন সসম্ভ্রম আহ্বান জানিয়েছিল তখন বোধ হয় এই কারণেই সে প্রত্যাখান জানিয়েছিল। কাজ অবশ্য তার ছিল। কলকাতাতেই তার উপর বৃহৎ কর্মের ভার পড়েছিল। কিন্তু কলকাতাতে তার স্থান পূরণ করবার লোকের অভাব হ'ত না। এই দীর্ঘ কয়েক মাসে তার মন বোধ হয় অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। তাই হঠাৎ ছুটে এসেছে নবগ্রামে। ইচ্ছা ছিল, দিন কয়েক থেকেই সে চ'লে যাবে। কিন্তু কিশোরবাবু বিজয় বিজয়ের মা এরা আপত্তি তুললেন।—না, সে হয় না। বিজয়ের মা বললেন—এখানেই তোর জন্ম। এইখানেই তোকে বাস করতে হবে। না করলে, অপরাধ হবে তোর। বিজয় বললে—না, তোমার বিষয় দেবসেবা এ সব তুমি বুঝেসুজে নাও। এ আর আমি কত বইব? এতেই তোমার অনেক নষ্ট হয়েছে। গুণীবাবুদের বাগানের পাশে ডাঙা ছিল পাঁচ বিঘে, ওরা সেটা ঘিরে নিয়েছে। বামুনডাঙার চৌকীদারী চাকরাণ তোমার ছ আনা আমার দশ আনা ছিল, আমার অংশটা ওদের বিক্রী করেছিলাম; ওরা ওদের অংশের টাকা দিলে না; ষোল আনা টাকা দাখিল করতে হবে; তোমাকে লিখলাম, তুমি উত্তরই দিলে না,

গেল নীলেম হয়ে। এসব তুমি বুঝেসুঝে নিয়ে যা ভাল ব্যবস্থা হয় ক'রে যাও।

কিশোরবাবু বিজয়কে সমর্থন করলেন, বললেন—এর প্রয়োজন আছে গৌরীকান্ত। একবার দেখে নেওয়া উচিত।

এ সব কথা দোসরা বৈশাখের কথা। গৌরীকান্তের আসার দ্বিতীয় দিন।

গৌরীকান্ত সেদিন বলেছিল—দেশের মাটি দেশেই আছে, ও তো যাবার নয়। ওর মালিকানার উপরেও আমার লোভ নেই। সম্পত্তি পৈতৃক, পিতামহ সম্পত্তি করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেবকীর্তিও করেছিলেন। বিজয়ের সংসার বেড়েছে, সম্পত্তি বাড়ে নি বরং ক্ষয়ই হয়েছে। দেবসেবাও ওর বাড়ির মেয়েছেলের উদ্যোগেই চলে। ওরাই যা হয় করবে। ওকেই বরং সেব'য়েত ক'রে দেবোত্তর ক'রে দেব। আমাকে আর দেখতে বলবেন না। আমি এসেছি দু-চার দিনের জন্যে। দু-চার দিন পরেই চ'লে যাব।

বিজয় কিন্তু কালাপাহাড়। সে বলেছিল, ওর মধ্যে আমি নেই। মা যতদিন আছে, দেবতাফেবতা ততদিন। মাও মরবে, আমিও সব জলে ভাসিয়ে দেব। ও সব আমি পারব না। আমাকে সেবায়েত ক'রে-ট'রে ও সব কিছু ক'রো না তুমি। আমি আদালতে গিয়ে জবাব দিয়ে আসব। তার চেয়ে আর কিছু যদি ভাল কাজ কর তো কর। এমনি দু-এক বিঘে জমি যদি আমাকে দাও তো দিয়ো। এখন জমির দাম বেড়েছে পাঁচ-সাত শো টাকা বিঘে—বেচে কিছু টাকা পেলে একটা বন্দুক কিনব আর কিছুদিন ভাল ক'রে খাব। হেসে উঠে কথা শেষ করেছিল।

সে হাসি যেমন-তেমন হাসি নয়। অট্টহাসি। বিজয়ের মা ছেলের আচরণে দুঃখ এবং লজ্জা পেয়ে উঠে চ'লে গেলেন। কিশোরবাবু ধমক দিয়ে বললেন—থাম হে বিজয়। ছি—ছি—ছি! কি যে সব বল?

বিজয় কোন কিছুকেই বা কোন ব্যক্তিকেই গ্রাহ্য করে না। সে

কোন উত্তর না দিয়েই উঠে চ'লে গেল। একটু বিষণ্ণ হাসি গৌরীকান্তের মুখে ফুটে উঠল। বিজয়কে সেই এই পথে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। উনিশ শো তিরিশ সালে ওর বয়স বছর বারো। মনে আছে, সে দিন ছিল রথযাত্রার দিন। সেই দিনটিই নির্দিষ্ট হয়েছিল। একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার দিন। গৌরীকান্ত মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ রথের মেলার কাছাকাছি একটা দু-রাস্তার মোড়ের মাথায় বিজয় কোথা থেকে এসে গৌরীকান্তের পাশে দাঁড়িয়ে পতাকাটা ঘাড়ে তুলে সকলের থেকে বেশী চীৎকার ক'রে ধ্বনি তুলে একেবারে নেতা না হোক, উপনেতার আসন অধিকার করেছিল এবং গৌরীকান্তের সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে এক মেয়াদে জেল খেটে একেবারে ভিত পোক্ত ক'রে বেরিয়ে এসেছিল। এর পর পড়বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পড়া হয় নি। তাতে ওর কোন গ্লানি নেই। নিজে যা বোঝে তাই বিজয়ের বেদ। আসল বেদের মতামত যদি তার বিরোধী হয় তবে তাকেও সে মানে না।

কিশোরবাবু বললেন—বিচিত্র! এটাকে নিয়ে যে কি করা যায় তা বুঝতে পারি না।

তিনি গলা চড়িয়েই ডাকলেন—বিজয়!

বাইরে থেকে বিজয় জবাব দিলে—আমার সময় নেই কিশোরবাবু, সাঁওতালদের পঞ্চায়েত আছে।

শেষের কথাগুলির শব্দের তারতম্য শুনে বুঝতে বাকী রইল না যে, বিজয় তার ভাঙা বাইসিক্লে আরোহণ ক'রে চ'লে গেল।

কিশোরবাবু বললেন—দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ছলটার অর্থ হ'ল মিথ্যে। বিজয়ের কিন্তু সত্যই কাজের অভাব নেই। সত্যই নেই। সাঁওতালদের পঞ্চায়েত বসবে, বিজয়কে থাকতেই হবে। না হ'লে যদি পঞ্চায়েত ভুল বিচার করে!

কিছুক্ষণ পর কিশোরবাবু উঠলেন। তাঁর সন্ধ্যার সময় হয়ে আসছে। বললেন—তুমি ভেবে দেখ গৌরীকান্ত, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে

আমি তোমাকে আটকাব না। তবে তোমার বিষয়টুকুর একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে যাও। আমার মত যদি শোন তবে সম্পত্তি এবং দেবসেবার ভার তুমি দলিল ক'রে তোমার খুড়িমার নামে দিয়ে যাও, নইলে ও আর কিছু রাখবে না।

গৌরীকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। সেকালে তাদের অর্থাৎ তার বাপ এবং বিজয়ের বাপের সম্পত্তির কথা উঠলে লোকে বলত—সোনার সম্পত্তি।

চাষের জমি, কিছু জমিদারি, পুকুর, বাগান মোটমাট চার পাঁচ হাজার টাকা আয় ছিল। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী গোপীচন্দ্রের অভ্যুত্থানের পূর্ব কাল পর্যন্ত লোকে তারিফ ক'রে বলত—সোনার সম্পত্তি। তার কারণ সম্পত্তিগুলির মধ্যে তিনটি মহল ছিল নবগ্রামের তিন দিকে। অর্থাৎ তিন দিকের প্রভুত্ব। লোকে বলত—ছাদে দাঁড়িয়ে তদারক করা চলে। তারপর গোপীচন্দ্র ষোলকলায় যখন প্রকাশিত হলেন তখন তাঁর সম্পত্তির আয় সত্য সত্যই লক্ষ টাকা। এক লক্ষ থেকেও বেশী। তখনই রাধাকান্ত প্রভৃতিদের সম্পত্তি গিলটি সোনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে গিলটিটুকুর মধ্যেও যে ধাতুটুকু আছে, সে সীসেই হোক আর পিতলই হোক আর লোহাই হোক, তাই থেকে এখনও কয়েকটা মানুষের স্বচ্ছন্দে জীবন কেটে যেতে পারে।

তারপর বললে—থাকা আমার সম্ভবপর হবে না কিশোরবাবু। সম্পত্তির কথা যা বললেন তাই ক'রে দিয়ে যাব। হয়তো একটু আধটু বদল করতে পারি। সে আপনাকে কাল বলব। ভেবে দেখি একটু।

ভেবে দেখতে চেয়েছিল সে শান্তি এবং দেবকী দেবীর কথা। এই দুজনেরও সংস্থান ক'রে দিলে হয় না? কোথায় যেন একটা মমতা আছে। বড় ভাল মেয়ে শান্তি। নন্দবাবুর ভগ্নী দেবকী দেবী। সন্তোষ পিসেমশাইয়ের স্ত্রী কন্যা। আজ আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছে নবগ্রামে। কিন্তু সংকোচ যেন তাঁর কণ্ঠরোধ করলে। বিজয়দের পুরোটা না দিয়ে তার কিছুটা ওদের দিলে লোকে বাঁকা হাসি হাসবে। শান্তির যে দুর্নাম রটেছে

সেই দুর্নামের বোঝা বাড়বে। মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। সন্তোষ পিসেমশাই এবং তার বাবা দুজনে আলাপ করতেন। গান গাইতেন সন্তোষবাবু তানপুরা নিয়ে, বাবা বাজাতেন। সন্তোষবাবু খাতা থেকে কাহিনী প'ড়ে শোনাতেন, বাবা শুনতেন। সন্তোষ পিসেমশাইয়ের সে কাহিনী এখনও মনে আছে। আজ সে নিজে লেখক। কিন্তু সে আজও সে কাহিনী স্মরণ ক'রে বিস্মিত হয়। সত্যই সে কাহিনী বিস্ময়কর। সন্তোষ পিসেমশাই এক মঙ্গলকাব্য রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিষ্ণুমঙ্গল কাব্য। মধ্যে মধ্যে দুজনে আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলতেন। মনে পড়ছে পিসেমশাই তাকে কোলের কাছে নিয়ে সমাদর ক'রে মধ্যে মধ্যে বলতেন—রাধাকান্তবাবু, আঃ, আমার যদি একটা কন্যা থাকত হে! তোমার ছেলেকে জামাই করতাম।

রাধাকান্তবাবু হেসে বলতেন—সে হ'লে আমি নিজে যেচে যেতাম।

সেই স্মৃতি তার বাসনাকে একদিকে যেমন প্রবল ক'রে তুলছে, অন্য দিকে তার সংকোচকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বলতে যেন লজ্জা বোধ করছে সে।

ভাবতে ভাবতেই এ কয়দিন কেটে গেছে। আজও সে মনের কথা বলতে পারে নি। কুড়ি দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যেই বাড়িঘরের আবর্জনা সাফ হয়েছে, ফুটোফাটা মেরামতও হয়েছে; ঘরের ভিতরটায় দু-একটা গর্ত যা ছিল সে খুঁড়ে বালি-চুন-সুরকি দিয়ে বন্ধ করেছে। বন্ধ করবার আগে কার্বলিক অ্যাসিডে ভেজানো কাটা খড় তার মধ্যে পুরেও দিয়েছে এবং বন্ধ করবার পরও এমনি অ্যাসিড-মাখা খড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চারিদিকে। শান্তি সেদিন বলেছিল—যে আপনার আগলাদার, যে গর্জন, যে ফণা! কথাটা নিতান্ত অমূলক নয়, পরিষ্কারের সময় দুটো গোখরো সাপ বের হয়েছে। কিশোরবাবু কিন্তু তাদের মারতে দেন নি। বেদে দিয়ে ধরিয়ে দূরে নদীর ধারে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। দু-চারজনে ব্যঙ্গ করেছিল। কেউ কেউ বলেছিল—এদিকে তো পড়াশুনো অনেক করেন শুনি, কিন্তু আজকালকার দিনে এ কি রকম ব্যবস্থা শুনি?

কিশোরবাবু বলেছিলেন—দেখ বাপু, সাপ নিয়ে ঘর নবগ্রামে আমরা সবাই করি। গোটা দেশটাতেই তাই। আজ ব'লে নয়, পুরুষানুক্রমে। কিন্তু বলতে পার, কজন সাপের কামড়ে মরেছে? যাক না নদীর ধারে, ছেড়ে দেবে, সেখানে ওরা যা হয় ক'রে বাঁচবে। আর এ বাড়িতে সাপ আমি মারতে দেব না। রাধাকান্তদার ডায়েরী আমি পড়েছি। সাপের মুখের সামনে দিয়ে আমি চ'লে গিয়েছি। সে আমার কোন অনিষ্ট করে নি। সাপ যেখানে দংশনোদ্যত হবে, সেখানে মেরো, আমি আপত্তি করব না। ঘরে লোক ছিল না—ওরা বাস নিয়েছিল। আজ লোক এসেছে, ওদের চ'লে যাওয়ার সুযোগ দাও। অন্তত আমি বলব তাই।

গৌরীকান্তের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তার বাবা বলতেন—কালের প্রতীক হ'ল সাপ। তার পিতামহও একবার গোপীচন্দ্রকে নিষেধ করেছিলেন সাপ মারতে। বলেছিলেন—ওই কথাই। আরও বলেছিলেন—দিনের বেলা মানুষের অধিকারকে মেনে নিয়ে ওরা গর্তে লুকিয়ে থাকে ভাই, ক্ষুধায় আহার করে না, তৃষ্ণায় জল পান পর্যন্ত করে না। রাত্রে মানুষ ঘুমোয়—ওরা বের হয় ক্ষুধার খাদ্য অন্বেষণে। তোমার সামনে প'ড়ে গিয়ে বিব্রত হয়েছে, একটু স'রে পথ দাও—ও চ'লে যাক।

এর মধ্যে হয়তো একালের বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে অনেক কিছু হাস্যকর ব'লে মনে হতে পারে; এর বিরুদ্ধে নূতন কালের যুক্তিতে অনেক বাঁকা কথাও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলা যায়, এবং প্রয়োজনের অঙ্ক ক'ষে ওই বিষধর সরীসৃপগুলির জীবন বা বাঁচার অধিকার অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ ক'রে বাতিল ক'রেও দেওয়া যায়। বলা যায়, তার থেকে ওকে মেরে ওর চামড়া ছাড়িয়ে কাজে লাগালে প্রয়োজনের দিক থেকে বেশী লাভবান হওয়া যায়। সবই সত্যি। তবুও এর মধ্যে এমন একটি বিচিত্র মন, বিচিত্র দৃষ্টি আছে, যা চিরকাল অন্য দেশ থেকে পৃথক।

* * *

স্বল্প একটু হাসি ফুটে উঠল গৌরীকান্তের মুখে। মনে প'ড়ে গেল তাদের বংশের একটি প্রবাদের কথা। তাদের বংশ নয়, তারা যে

বংশের দৌহিত্র হিসাবে এই গ্রামে এসে বাস করেছিল, তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল, তাঁদের কুলপ্রবাদের কথা। তার বাবার ডায়েরীতে প্রথমেই আছে সুদীর্ঘ একটি বংশ-পরিচয়—সেই পরিচয়ের মধ্যে কাহিনীটি সে পড়েছে। কাহিনীটি এ অঞ্চলে সকলেরই প্রায় জানা। সকলেই, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের সকলেই, দাবী করে যে, এ কাহিনী তাদের বংশের কাহিনী। প্রমাণস্বরূপ গ্রামের দক্ষিণ দিকের মাঠ মহানাগের মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ওই মাঠে তাদের পূর্বপুরুষের অংশ ছিল। প্রবাদ এই সাপ নিয়েই। সেই প্রবাদবশে এ অঞ্চলে গোখুরা সাপ মারলে তার মুখাগ্নি করতে হয়। গোখুরা সাপ নাকি ব্রাহ্মণ! কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব গোস্বামী প্রভুর কালের কথা।

নয়

বিচিত্র কাহিনী।

কালের পটভূমি সুদূর দ্বাপর কাল পর্যন্ত প্রসারিত। স্থানের পটভূমি রাঢ় বঙ্গের নবগ্রাম থেকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রবাদ, প্রতিহিংসাপরায়ণ অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপাণ্ডবের পুত্রকে বধ করলে শোকাতুরা দ্রৌপদীর ক্রন্দনে এবং পুত্রশোকে বিচলিত ভীম অশ্বত্থামাকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাকে অনুসরণ করলেন। অশ্বত্থামা নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মশির বাণ। অর্জুনও ভীম এবং নিজের পক্ষকে রক্ষা করবার জন্য নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মশিরাস্ত্র। দুই দিব্য অস্ত্র আকাশে উঠে মুখোমুখী হয়ে অনল বর্ষণ করতে লাগল। পৃথিবী থরথর ক'রে উঠল কেঁপে। আকাশ থেকে দেবতা যক্ষ রক্ষ কিন্নর, পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্ত থেকে মুনি ঋষি চীৎকার ক'রে উঠলেন—অস্ত্র সংহরণ কর। অস্ত্র সংহরণ কর। সাধারণ মানুষ কীটপতঙ্গ জীবজন্তু লতাগুল্ম বনস্পতি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'রে উঠল। অর্জুন অস্ত্র সংহরণ করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার প্রাণপণ চেষ্টাতেও অস্ত্র ফিরল না, সম্বৃত হ'ল না।

অশ্বথামা লজ্জিত হয়ে কাতরভাবে বললেন—আমি ক্রোধান্ধ হয়ে কঠিন হিংসায় অস্ত্রত্যাগ করেছি; আমি হারিয়েছি ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মশির অস্ত্র আমার হিংসায় হবে বৃত্রাসুরের মত আসুরী অস্ত্র। আমি কি করব?

অস্ত্র তখন আসুরী ক্রূরতায় ক্রূর। পঞ্চপাণ্ডবের সম্মুখে পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ক্রূরতায় বক্র ব্রহ্মশির তখন শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত পাণ্ডবদের পরিত্যাগ ক'রে প্রবেশ করল অভিমন্যুর বিধবা উত্তরার গর্ভে। গর্ভে তাঁর পাণ্ডববংশধর পরীক্ষিত। আর্তনাদ ক'রে উঠলেন উত্তরা কঠিন যন্ত্রণায়; গর্ভস্থ ভ্রূণ কেঁদে উঠল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করলেন তাঁর গর্ভে। ক্রূর ব্রহ্মশিরকে নিয়ে এলেন বের ক'রে,—নিক্ষেপ করলেন তাকে, অভিশাপ দিলেন—'তুমি ক্রূর কুটিল বিষাক্ত সরীসৃপে পরিণত হও। অস্ত্র প্রশ্ন করলেন—কোন্ অপরাধে তুমি আমাকে এমন অভিশাপে অভিশপ্ত করলে? তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমাকে আমার অপরাধ কি তাই বল?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি ব্রহ্মশির অস্ত্র, ব্রাহ্মণ। প্রতিভায় তুমি উদ্ভূত। অতি সূক্ষ্ম অথচ অমোঘশক্তি নীতিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তুমি সেই নীতিকে লঙ্ঘন করেছ। অশ্বথামা তোমাকে নিক্ষেপ করেছিলেন—পঞ্চ-পাণ্ডবের বিনাশার্থে। তুমি আমার শক্তিকে অতিক্রম করতে না পেরে বক্রপথে কুটিল গতিতে পার্শ্বাপসরণ ক'রে সুরক্ষিত নারী উত্তরার গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা ক'রে পাণ্ডববংশের উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছিলে। তোমার মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রতিভার যদি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে অনায়াসেই তোমার অপরাধ উপলব্ধি করতে পারবে।

অস্ত্র বললে—কৃষ্ণ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের উৎস—মহাশক্তি মহামায়ার চৈতন্যস্বরূপ; অনাদ্যন্ত তমিস্রার মধ্যে তুমিই জ্যোতি, জীবনে তুমিই চেতনা চৈতন্য। জীবনমানসে তুমিই বুদ্ধি বোধি; তুমিই জ্ঞান, তুমিই প্রজ্ঞা। তুমিই ন্যায় তুমিই নীতি। এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞে তুমি নির্বিকার নিরপেক্ষ রূপে অবস্থান করেছ। পাপপঙ্ককে ধ্বংস করতে পুণ্যাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এ মহামারণে সারথ্য করেছ। তুমি নিজে

বিবেচনা করে বল, এই ধ্বংস-যজ্ঞ কি হিংসার প্রভাবকে দূরে রাখতে পেরেছে? এই যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা, সে কি রক্তসিক্ত হয়ে বর্ণ ও গন্ধের দ্বারা, শবাকীর্ণ দৃশ্যের দ্বারা হিংসার প্রভাবকে ব্যক্ত করছে না? তুমি কি নিজে মহামতি ভীষ্মের শরনিকরে জর্জরিত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রধারণ কর নি? সে ক্রোধ কি হিংসার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি?

চকিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ঠিক এই মুহূর্তেই শোনা গেল কুরু-শিবির থেকে নির্গত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং শত পুত্রবধূ বহু শত পৌত্রবধূদের বিলাপধ্বনি। তাঁরা আসছেন রণক্ষেত্রে; মৃত প্রিয়জনের দেহসন্ধানে। নতমস্তক হলেন পাণ্ডবেরা, শঙ্কিত হলেন, চঞ্চল হলেন। শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একটি এবং ধীর স্থির নির্বাকার হয়ে সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হলেন।

গান্ধারী এসে অভিসম্পাত দিলেন—পাণ্ডবদের দিলেন না, দিলেন নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে। অভিসম্পাত দিলেন—তুমি যেমন পাণ্ডবদের জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছ, নির্বিকারত্ব অবলম্বন ক'রেও সারথ্যকর্ম ক'রে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছ; তেমনি তোমার জ্ঞাতিবর্গও তোমার দ্বারাই বিনষ্ট হবে। তারপর তুমি নিজেও নিহত হবে; অমাত্য জ্ঞাতি ও পুত্র হীন হয়ে বনচারী হতে হবে তোমাকে। সেই অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে কুটিল উপায়ে নিহত হবে তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ একবার সেই বহুদূরে নিক্ষিপ্ত অভিশাপগ্রস্ত ব্রহ্মশির অস্ত্রের পথের দিকে চাইলেন। সে অস্ত্র তখন বহু বহু দূরে—হেমন্ত রাত্রির কক্ষচ্যুত উল্কার মত প্রচণ্ড বেগে ধাবিত। লোকচক্ষু হতে অদৃশ্য। ভগবান কৃষ্ণ মনে মনে বললেন—তিষ্ঠ।

সেইখানেই তখন সেই অস্ত্র এক মহাবিষধর ভুজঙ্গের আকার ধারণ ক'রে পতিত হ'ল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী গান্ধারীর দিকে চেয়ে সহাস্য-মুখেই বললেন—দেবি, আমার কর্তব্য আপনি নির্ধারিত ক'রে দিলেন। বললেন—আপনার বাণী অমোঘ। আপনার মধ্যে এই মুহূর্তে আমি সেই মহাশক্তিকে প্রতিভাত দেখছি। যিনি সূর্যের জ্যোতির পরিধিকে বেষ্টন

ক'রে তমসারূপে অবস্থান ক'রে একদিকে জ্যোতিকে সম্যকরূপে বিকশিত করেন—অন্যদিকে যিনি প্রতি মুহূর্তে সূর্যকে গ্রাসে সমুদ্যত রয়েছেন, তিনিই আপনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং এ অভিশাপ অভিশাপ নয়—মহাশক্তির অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়মের নির্দেশ। জীবনচৈতন্যের নূতন উদয়ের জন্য কুটিল চক্রান্তে আমার জীবনাবসান একটি কালের দিনান্ত।

* * *

এখানে প্রবাদ—ওই ব্রহ্মশির অস্ত্রের নাগজীবন ও শাপমোচন নিয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন 'তিষ্ঠ' বলেছিলেন, তখন মহাস্ত্র নাগরূপে রূপান্তরিত হতে হতে শূন্যপথে এই মহানাগের মাঠের উপর দিয়ে চলেছিল। ভগবান 'তিষ্ঠ' বলতেই মহাস্ত্র ব্রহ্মশির—মহাবিষধর নাগরূপ পেয়ে এই মাঠের বুকে পড়ল। মাঠটি ছিল শস্যশ্যামল; মধ্যে ছিল একটি কাজল-কালো জল-টলমল দীঘি। মধ্যে মধ্যে ছিল পল্লবঘন ফলবান বৃক্ষ; এখানে ওখানে নানা বর্ণের ফুলে ভরা লতাগুল্ম; গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী; গুল্মের চারিপাশে লালে লাল নানা বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি। দেবলোক থেকে ছড়িয়ে দেওয়া ফুলের পাপড়ির মত উড়ে বেড়াত। তখন এই মাঠের নাম ছিল অন্য। কেউ বলে—অমর কুণ্ড, কেউ বলে—শ্যাম কুণ্ড, কেউ ব'লে কিছু।

ব্রহ্মশির নাগ হয়ে সেখানে প'ড়েই ফণা তুলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং এই স্নিগ্ধশ্যামল পরিবেশ দেখে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সেই নিশ্বাসে প্রথমেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রজাপতিগুলি ও পুষ্পসম্ভার। তারপর শুকাল গাছের পাতা, পুড়ে ছাই হ'ল বিহঙ্গমকুল; সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল মাঠের শস্য। তারপর শুকাল জল। ক্রমে ক্রমে এই মাঠখানা হয়ে গেল জলহীন ধূসর বিষবাতাসে জর্জর মরুভূমি। আকাশে মেঘ ওঠে—মহানাগের মাঠের উপর সে মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শূন্যলোক দিয়ে কোন পাখী যদি মহানাগের মাঠ অতিক্রম করতে যায়, মুহূর্তের মধ্যে সে পাখীর পাখা পুড়ে যায়—সে

পাখী প'ড়ে যায় মাটিতে। এই গণ্ডীর মধ্যে কোন স্থলচর প্রবেশ করবামাত্র বিষনিশ্বাসে জর্জরিত হয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, নাগ তাকে নিশ্বাসে আকর্ষণ করে। হিংস্র উল্লাসে দংশন ক'রে তার উপর ফণা তুলে দাঁড়ায়। নাগ হ'ল কালের প্রতীক। তার পরমায়ুর নাকি পরিমাণ নেই। তার উপর এই ব্রহ্মশির মহানাগ অভিশাপগ্রস্ত। সে শাপমোচন না-হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে কেমন ক'রে? চ'লে গেল দ্বাপর। কলিযুগ এল। সে যুগেরও চ'লে গেল কতকাল। অকস্মাৎ একদিন; কিছুদিন আগেই বর্ষচক্র শেষ হয়ে নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়েছে। তখন সূর্য মেষরাশিস্থ, গ্রামে গ্রামে ভগবান বিষ্ণুর চন্দনযাত্রার পার্বণ চলেছে।

বৈশাখ মাস। তিথি পূর্ণিমা। মহানাগ পূর্ণচন্দ্রের শীতল রশ্মির দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ একটা বাতাস উঠল। সেই বাতাসে যেন কিসের স্পর্শ। নাগের জর্জর দেহ শীতল হ'ল যেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর আকারের কিছু যেন এসে পড়ল সেখানে। বোধ করি তারই নিশ্বাসের আকর্ষণে। কিন্তু আশ্চর্য, বস্তুটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল না। নাগ ক্রুদ্ধ হ'ল—তার অহঙ্কার আহত হ'ল; কি এমন বস্তু কি, তার শক্তি যে, ব্রহ্মশিরের নিশ্বাসেও তা পুড়ে ছাই হয় না? মুহূর্তে ফণা তুলে সে দংশন করলে সেই বস্তুটিকে। ঢেলে দিলে তার বিষ। যে বিষ কণ্ঠে ধারণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয়কেও বিবশ হতে হয়েছিল, সেই বিষ। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! বিষে সিক্ত হয়েও সেই বস্তুটি পুড়ে গেল না। নাগ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই বস্তুটির দিকে। বস্তুটি একটি বীজ। কোন গাছের বীজ। ধীরে ধীরে নাগ চিনলে, এটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ। সে ক্রুদ্ধ হয়ে আবার তাতে বিষ ঢাললে। আশ্চর্য, বীজটি সেই বিষরসে সিক্ত হয়ে যেন পুষ্ট হয়ে উঠল। চন্দ্র তখন অস্তশিখরলগ্ন হয়ে হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছেন। আবার নাগ দংশনোদ্যত হ'ল। তখন সেই বীজ বাঙ্মুখর হয়ে উঠল; বীজ কথা কইলে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হল ব্রহ্মশির। বীজ বললে—মহানাগ, তোমার বিষে আমাকে তুমি দগ্ধ করতে পারবে না। কারণ অমৃতরসে আমি অভিষিক্ত। যে বৃক্ষে

আমার জন্ম, তার বীজও ছিল অমৃতরসে অভিষিক্ত। তোমার বিষরস আমাকে দগ্ধ করবে না, আমাকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করবে।

ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠল ব্রহ্মশির। সে গর্জন ক'রে বললে—মিথ্যা কথা। ব'লেই সে আবার দংশন করলে, দংশনের পর দংশন। অতি ক্ষুদ্র সর্ষপাকার বীজ, দংশনের বেগে ফণার আঘাতে মাটির মধ্যে হারিয়ে গেল।

মাটির মধ্য থেকে বীজের কথা শোনা গেল—আমি অঙ্কুরিত হচ্ছি ব্রহ্মশির। আমার যে বৃক্ষে জন্ম, সেই বৃক্ষের বীজ অভিষিক্ত হয়েছিল—দ্বাপরের চৈতন্যপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুতে এবং শরাহত তাঁর পদারবিন্দের শোণিতে।

—শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুতে? তাঁর শোণিতে? মিথ্যা। মিথ্যা। আমি তাঁকে জানতাম। অশ্রু তাঁর চোখে অসম্ভব। অসম্ভব নয়, মিথ্যা নয়। পরম সত্য।

দেবী গান্ধারীর অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হন আত্মকলহে। বলদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করলেন। ভগবান প্রবেশ করলেন অরণ্যে। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় ঘন গুল্মের অন্তরালে। উপবেশন করলেন গান্ধারীর অভিশাপে। এক ব্যাধ তাঁর রাঙা পাখানিকে হরিণের রক্তাভ জিহ্বা ভ্রম ক'রে শরাঘাতে আহত করলে। ভগবান তখন লীলা-জীবনের কথা স্মরণ করছিলেন। শর এসে তাঁকে আঘাত করলে। তিনি সবলে উৎপাটিত করলেন সে শর। রক্ত উৎসারিত হ'ল। সে রক্ত যেখানে পড়ল সেখানে পড়েছিল একটি ফল, ওই অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলেন তিনি ধরিত্রীর মৃদু ক্রন্দন। তিনি বুঝলেন, তাঁর বিরহকল্পনায় ধরিত্রী কাঁদছে। তিনি আহ্বান করলেন ধরিত্রীকে।

ধরিত্রী এসে দাঁড়ালেন। পুরুষোত্তমের অবস্থা দেখে কাতর আর্তনাদে কেঁপে উঠলেন ধরিত্রী। বললেন—কুরুক্ষেত্রের রক্তের জ্বালার

দাহে আমার যন্ত্রণার আর শেষ নেই। পুরুষোত্তম, এর উপর তোমার রক্ত তুমি ঢেলে দিলে, এর দাবদাহ আমি সইব কি ক'রে?

পুরুষোত্তমের মুখে স্মিতহাস্য—কিন্তু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুটি অশ্রুবিন্দু। বললেন—কল্যাণী, আমার রক্ত দিয়েই তোমার কুরুক্ষেত্রের রক্তের দাহের উপর প্রলেপ দিলাম। এ ছিল অনিবার্য। দেবী গান্ধারীর শোকতপ্ত অন্তরের অন্তরাল থেকে আদি শক্তির নির্দেশ। কল্যাণী, পাপীকে সংহার ক'রে পাপকে বিনাশ করতে চেয়েছিলাম। বিরাট কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা। পাপাশ্রয়ী বহু মানুষ হত হয়েছে। কিন্তু পাপ? শেষ কি পাপ এসে আশ্রয় করলে আমার ঘরের মানুষদের—যদুবংশকে? সুরাপানে উন্মত্ত, বিলাসে সম্ভোগে পরস্পরে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে গৃহযুদ্ধে মত্ত হ'ল, তারা বিনষ্ট হ'ল;—হিংসাকে উন্মত্ত উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট দেখে এসেছি—প্রভাসের কূলে। তুমি অনুভব করতে পারছ না? তাঁর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল। পড়ল হাতের সেই রক্তসিক্ত বটফলটির উপর। ধরিত্রী বললেন—পারছি। তবু সান্ত্বনা, পুরুষোত্তম আমার বুকে জীবন্ত বিগ্রহের রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। এর পর আমার কি হবে বলতে পার?

পুরুষোত্তম বললেন—তপস্যা কর। আমি তো কুরুক্ষেত্রে বলেছি, আবার আমি আসব। প্রয়োজন হ'লে, সময় হ'লে আহ্বান এলে যুগে যুগে আমি এসেছি—আসব।

ধরিত্রী ম্লান হেসে বললেন—আবার কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করবে প্রভু?

—জানি না। চৈতন্য নব কলেবরে কোন্ রূপ ধরবেন? তুমি তপস্যা আরম্ভ কর। তোমার অন্তরকামনাকে প্রকাশ কর।

লীলা সম্বরণ করলেন—দ্বাপরের পুরুষোত্তম চৈতন্যস্বরূপ মানব-জীবনের ভাববিগ্রহ। প'ড়ে রইল তাঁর সেই অশ্রু ও রক্তসিক্ত বটফলটি।

ধেয়ে এল সমুদ্র—বক্ষে ধারণ করবে পুরুষোত্তমের নশ্বর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে উঠল ঝড়। সেই ঝড়ের বেগে ফলটি উঠল শূন্যমার্গে। এসে পড়ল বিষ্ণুপাদপদ্মমহিমায় মহিমান্বিত গয়াক্ষেত্রের কাছে।

অঙ্কুরিত হ'ল সেই বীজ। পরিণত হ'ল মহাদ্রুমে। আজ এতকাল পর অকস্মাৎ মহাদ্রুমের পল্লবে পত্রে শিহরণ জাগল। ফলে ফলে স্পন্দন জাগল। উল্লসিত হ'ল মহাদ্রুম এক অজানিত উল্লাসে। বাতাস এল এক অভিনব গন্ধ বহন ক'রে। মহাদ্রুম প্রশ্ন করলে বাতাসকে—এ কোন্ গন্ধ তুমি নিয়ে এলে বহন ক'রে? এ কিসের গন্ধ? কার গন্ধ? বাতাস বললে—এ এক নবজাতকের গাত্রগন্ধ। হিমাচলের পাদদেশে উদ্যানভূমিতে বৃক্ষচ্ছায়াতলে এক মহিয়সী নারী এক পুত্র প্রসব করেছেন। এ তারই গাত্রগন্ধ। মহাদ্রুম, সেই গন্ধে আমার অঙ্গে অঙ্গে জাগল অপরূপ আনন্দ-উল্লাস। সেই উল্লাসে আমি চঞ্চল হয়ে হলাম প্রবাহিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন এক আকর্ষণে ধাবিত হয়ে এলাম এই অভিমুখে। হে দ্রুম, তুমিই তো আমাকে আকর্ষণ করেছ।

মহাদ্রুমের পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনিতে এক মহাসঙ্গীত জেগে উঠল। কাণ্ডে কাণ্ডে আন্দোলন জাগল। ফল বৃন্তচ্যুত হয়ে ফাটল, আমি বীজ হয়ে বাতাসে ভাসলাম। মহানন্দে ভেসে চলেছিলাম। আকৃষ্ট হলাম তোমার আকর্ষণে। পড়লাম এখানে। হে নাগ, আমার সর্বাঙ্গে অমৃতের শক্তি। তোমার বিষে আমার ধ্বংস হবে না। আমি অঙ্কুরিত হচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, কোন দৈবনির্দেশে তোমাকে ছায়া এবং আশ্রয় দেবার জন্যেই আমি এখানে এসে পড়েছি। আমা থেকে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আমি তোমার কল্যাণ করব। তোমাকে ছায়া দেব।

নাগ ক্রোধভরে তার উপর আবার বিষোদ্গার করলে।

* * *

আশ্চর্য।

ব্রহ্মশিরের সেই বিষ-দগ্ধ প্রান্তরে, যেখানে তৃণাঙ্কুর জন্মায় না, বর্ষণ হয় না, শূন্যমার্গেও কীট পতঙ্গ বিহঙ্গ যেতে পারে না, সেইখানে জন্মাল এক বটবৃক্ষ। ব্রহ্মশির নাগ প্রত্যহ তাকে দংশন করে। তবু সে মরে

না। পল্লব বিস্তার ক'রে ছায়া ফেলে আহ্বান করে—হে নাগ, আমার ছায়াতলে এসে আশ্রয় নাও। বিশ্রাম কর।

নাগ ঘৃণাভরে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

অকস্মাৎ আবার এল এক পূর্ণিমা-তিথি। অশ্বত্থ বৃক্ষ তখন তরুণ। তার তরুণ কাণ্ডে শ্যামল কোমল পত্রপল্লবে জাগল অভূতপূর্ব আনন্দ-শিহরণ।

কি হ'ল?

বাতাস ব'লে গেল—হিমাচলের পাদদেশে উদ্যানভূমিতে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই শিশু বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। নবযুগের পুরুষোত্তম পরম চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হয়ে অশান্তিজর্জর পাপতাপদগ্ধ পৃথিবীর বুকে মানুষের অন্তরলোকে অমৃত পরিবেশন করলেন। চৈতন্যের নবজন্মের সূচনা হ'ল মানুষের জীবনে। হিংসা ক্রোধ থেকে উত্তরিত হবে মানবসমাজ অহিংসায় অক্রোধে প্রেমে। তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করলেন—সেই মহাদ্রুমের ছায়াতলে, যে মহাদ্রুমের বৃন্তাগ্রে তুমি, হে বৃক্ষ, বীজরূপে জন্মলাভ করেছিলে। তাই আজ এই পুণ্যতিথির পরমক্ষণে তোমার সর্বাঙ্গে জেগেছে এই মহোল্লাস। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, তোমার পল্লবপত্রমর্মরে জাগছে এক অপূর্ব সঙ্গীতের অস্পষ্ট আভাস?

সত্যই জাগছিল সেই সঙ্গীত।

সে সঙ্গীতে স্তব্ধ হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রইল সেই মহানাগ। দংশনোদ্যত হয়েও সে যেন অবশ হয়ে গেল—দংশন করতে, নিজের ফণাকে নিক্ষেপ করতে পারলে না।

সঙ্গীত থামল।

তখন গর্জন ক'রে উঠল মহানাগ। এ দিকে দিন দিন চারিপাশের ব্রহ্মণ্য সমাজে জাগল ক্রুদ্ধ কোলাহল—এ পাপ। এ অধর্ম। উদূখল ও মুষলে শস্যবীজ চূর্ণ করবার সময় ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বলতে লাগলেন—নাস্তিক ব্রাহ্মণ-বিরোধী বুদ্ধের মস্তক চূর্ণ কর। মস্তক চূর্ণ কর।

নাগ ব্যঙ্গহাস্য হাসলেন। গর্জন করলেন। উপহাস ক'রে বললেন—হে বৃক্ষ, ওই শোন।

*　　　　*　　　　*

তারপর কত কাল চ'লে গেল।

কত পরিবর্তন। কখনও ওই অশ্বত্থ বৃক্ষের পল্লবে উল্লাস জাগে। কখনও শুষ্ক উত্তপ্ত প্রখরতায় ঝ'রে যায় পাতা। অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে থাকে মৃত বনস্পতির মত। তাকে উপহাস করে মহানাগ। ক্রুদ্ধ বিক্রমে প্রচণ্ড উল্লাসে সে গর্জন ক'রে ফেরে। দগ্ধ করে মৃত্তিকা। দগ্ধ করে বায়ুস্তর। চারিদিকে জাগে বিভীষিকা। প্রশ্ন করে বনস্পতি অশ্বত্থকে—কই, কোথায় সেই অমৃত? কোথায় সে শান্তি?

বনস্পতি বলে—আমি তো অনুভব করছি। তুমি কেন করছ না? কলিঙ্গবিজয়ী চণ্ডাশোকের নবজন্মের কথা স্মরণ কর। অর্ধপৃথিবীব্যাপী ধর্মবিজয়ের গৌরব স্মরণ কর। মহারাজ হর্ষবর্ধনের কথা স্মরণ কর। এই তো—এই রাঢ়ভূমে মহারাজ ধর্মপালের স্মৃতি তো সগুস্মৃতি। এখনও তো বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাহিনীতে পরিণত হয় নি! তোমার বিষদগ্ধ গণ্ডীর বাইরের মানুষের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ। অধিক কি, তোমাকে যিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনিই তো নবচৈতন্যে এই সত্য স্বীকার করেছেন।

নাগ বলে—মিথ্যা কথা। এ সে নয়।

বনস্পতি বলে—এ সেই।

নাগ বলে—জিজ্ঞাসা কর কোন ব্রাহ্মণকে। সেই তো জানে শাস্ত্রতত্ত্ব।

বনস্পতি বলে—বাতাসে ভেসে আসে তাদের অতি গোপন নিশ্বাসের ফিসফিসানি—সে তুমি বুঝতে পার না। আমি পারি। তারা গোপনে তাই বলে। অন্তরে তাই বিশ্বাস করে।

—না, করে না।

—করে।

ব্যঙ্গ ক'রে নাগ বলে—কণ্ঠ উচ্চ ক'রো না। এ কথা শুনতে পেলে সেনরাজারা তোমার মূলচ্ছেদ ক'রে বিরাট কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমাকে পুড়িয়ে ভস্ম এবং অঙ্গারে পরিণত করবে।

তখন পালবংশের পতন ঘটেছে। রাজত্ব চলছে সেনবংশের।

* * * *

অকস্মাৎ একদিন। ওই নাগের মাঠের গণ্ডীর অনতিদূরবর্তী অজয় নদের জলস্রোতের কল্লোলধ্বনি আশ্চর্যরূপে সঙ্গীতময় হয়ে উঠল।

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতা-গুলি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল—সে সঙ্গীতের ধ্বনিকম্পনে।

নাগও যেন কেমন ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল।

বনস্পতি প্রশ্ন করলে—কি হ'ল? তোমার এমন ভাবান্তর কেন?

নাগ বললে—বুঝতে পারছি না কি হ'ল! বনস্পতি, কুরুক্ষেত্রে যে দিন পার্থসারথি আমাকে অভিশাপ দিয়ে নিক্ষেপ করেন এখানে—সে দিন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। আজও অবধি অহরহ আমি শুনি সেই শঙ্খের গর্জন। আজ যেন সেই ধ্বনির পরিবর্তে বাঁশীর সুর শুনতে পাচ্ছি। কি হ'ল বুঝতে পারছি না। জান, বনস্পতিস্বরূপে আমি ব্রাহ্মণ-প্রতিভার মহাতেজময় অস্ত্র—আমি যখন নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছি, তখন বিশ্ব দগ্ধ হয়েছে; সমুদ্রে পড়লে সমুদ্র আবর্তিত হয়েছে আমার তেজে; তার উপর ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ অশ্বত্থামার হিংসা আমাকে ক্রূর ক'রে তুলেছে। শান্তি আমার পক্ষে অসহনীয়, সংসারে যা মধুর তা আমার কাছে তিক্ত বিষাক্ত মনে হয়। কিন্তু আজ যেন কি হয়ে গেল আমার! বনস্পতি, তুমি তো বাতাস থেকে বার্তা শুনতে পাও। কে এমন গান গাইছে বলতে পার?

কান পেতে শুনে অশ্বত্থ বললে—অজয়তীরে কেন্দুবিল্বগ্রামে কবিরাজ গোস্বামী রসশেখর কবি জয়দেব। তারপর একদিন দেখা গেল—ওই বিষদগ্ধ প্রান্তরের গণ্ডীসীমায় একটি মানুষকে। সে যেন এই প্রান্তরের গণ্ডীর দিকেই এগিয়ে চ'লে আসছে।

অশ্বত্থ কম্পিত হয়ে পত্র পল্লব আন্দোলিত ক'রে মর্মর ভাষায় শঙ্কা ভ'রে বললে—তিষ্ঠ। থাম। আর অগ্রসর হ'য়ো না।

বিবর থেকে নাগ অনুভব করলে—মানুষ আসছে। ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা তুলে সে বেরিয়ে এল। বিষনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে নাগের মাঠের বায়ুস্তরে দাহিকাশক্তি বিস্তার ক'রে রক্ত নেত্রে চেয়ে রইল।

মানুষটি তবু এগিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়—সে গান গাইছে। স্তবগান—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

সঙ্গীতমূর্ছনা বিস্তার করলে সেই বিষদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে। বিষধর ব্রহ্মশির ফণা অবনত ক'রে প্রণাম জানালে প্রলয়পয়োধি-পারাবারে জীবনদেবতার প্রথম আবির্ভাবকে। মহাবিচিত্ররূপিণী মহাশক্তির প্রথম চৈতন্যোন্মেষকে।

তারপর ফণা তুলে বললে, হে আগন্তুক, তিষ্ঠ। আর তুমি অগ্রসর হ'য়ো না। যেহেতু না তুমি দেখছি ব্রাহ্মণ। বক্ষদেশে তোমার উপবীত দেখছি। কণ্ঠে তোমার চেতনাময় পুরুষের স্তবগান শুনছি। এবং আমি আজ নাগদেহ প্রাপ্ত হ'লেও আমার উদ্ভব ব্রাহ্মণ-প্রতিভায়। ব্রহ্মতেজোদ্ভূত আমি। অন্যথায় অপর কোন জাতি হ'লে তোমাকে আমি বিষনিশ্বাসে দগ্ধ করতাম। আমি হিংসার দ্বারা আচ্ছন্ন, অভিশাপে আমি বিষাক্ত। তুমি আর অগ্রসর হ'য়ো না। আমি আত্মসম্বরণ করতে সক্ষম হব না। তুমি ফের। দাঁড়াও।

গায়ক ব্রাহ্মণ কিন্তু নিরস্ত হ'ল না। গাইতে গাইতে সে এগিয়ে আসতে লাগল।—

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

নাগ নিজের স্বভাবধর্মে আগন্তুকের উপর ভয়ঙ্কর আক্রোশ অনুভব করলে। চোখের দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল। নিশ্বাস প্রখর হ'ল। দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা ঘন ঘন প্রসারিত হতে লাগল। তার বিশাল ফণা প্রসারিত ক'রে সে দংশনোদ্যত হয়ে দাঁড়াল; সগর্জনে পরিত্যাগ করলে ভয়ঙ্কর বিষনিশ্বাস। ব্রাহ্মণ গায়ক তবু নিরস্ত হ'ল না। সে অগ্রসর হ'ল। কণ্ঠে তার সেই স্তবগান—

কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

এবার নাগ ক্রুদ্ধ বিক্রমে ধাবমান হ'ল। সে দংশন করবেই। আর সে ক্ষমা করবে না।

ব্রাহ্মণ তখন সবে শেষ করছে অষ্টম চৈতন্যপুরুষ-বন্দনা। সমীপবর্তী হ'ল নাগ। ব্রাহ্মণ বললে—দাঁড়াও হে মহানাগ, অভিশপ্ত ব্রহ্মশির। আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার হিংসাকে তুমি সম্বরণ কর।

নাগ বললে—সম্বরণ করা অসম্ভব। কারণ এই আমার স্বভাব-ধর্ম। এতে আমার অধর্ম নেই। ব্যতিক্রমেই আমি নিন্দাভাজন হব; অপৌরুষ ও ভীরুতার অপবাদে আমার তেজমহিমা অপযশগ্রস্ত হবে। যে চৈতন্যরূপী পুরুষের স্তবগান তুমি করছ, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। তিনি ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়দের ক্ষমা করেন নি। রাম-রূপে রাক্ষসদের বীর্যবলে সংহার ক'রে অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন। অষ্টম অবতারে কুরুক্ষেত্রে উদ্ধত দাম্ভিক ক্ষাত্রশক্তির বিনাশসাধন করেছেন। ব্রাহ্মণ তুমি, আমার নিষেধ অমান্য ক'রে উদ্ধতভাবে আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করেছ। তোমাকে দংশন ক'রে শাস্তিদান করা আমার চৈতন্যময় পুরুষের নির্দেশ।

ব্রাহ্মণ বললে—হে মহানাগ, চৈতন্যময় পুরুষ নব আবির্ভাবে বোধির নববিকাশে উত্তরণ করেছেন। হিংসা থেকে অহিংসায় বহির্লোকের যজ্ঞকাণ্ড শেষ ক'রে মর্মলোকে নূতন যজ্ঞ প্রজ্বলিত করেছেন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

নাগ বক্রভাষায় তাকে নিন্দা ক'রে বললে—তুমি তা হ'লে ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ? সেই নাস্তিক্যবাদী যজ্ঞকাণ্ডবিরোধী বুদ্ধের শিষ্য? কে বললে—বুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষ? ব্রাহ্মণেরা তাকে স্বীকার করে না।

ব্রাহ্মণ বললে—করেছে। আমি নিজে ব্রাহ্মণ। এই গ্রামেরই অধিবাসী। কেন্দুবিল্বে চৈতন্যময় পুরুষের প্রসাদধন্য তাঁর কবিসত্তার অংশোদ্ভূত কবিরাজ গোস্বামী মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর শিষ্য। বুদ্ধকে নবম চৈতন্যময় পুরুষ ব'লে তিনি উপলব্ধি ক'রেই এ স্তোত্র রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ উত্তরণে উত্তরিত হতে সাধারণ মানুষের কয়েক সহস্র বৎসর লাগবে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে নবযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী আমাকে তোমার কাছেই প্রেরণ করেছেন। বলেছেন, তোমার গ্রামের সান্নিধ্যে বিষদগ্ধ প্রান্তরে ব্রহ্মশির অভিশাপগ্রস্ত হয়ে হিংস্র নাগরূপে অবস্থান করছে। তার শাপমোচনের কাল সমাগত। আমার এই স্তবগান রচনায় বুদ্ধকে উপলব্ধি ক'রে রাঢ়ের বুদ্ধি ও জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণ-সমাজ নবচৈতন্যে উপনীত হতে চলেছে। পূর্ণ ও সম্যক উপলব্ধিতে বিলম্ব আছে। তবুও স্বীকৃতির লগ্নেই ব্রহ্মতেজোদ্ভূত ব্রহ্মশিরের শাপমোচন হবে। তুমি গৃহপ্রত্যাবর্তনের পথে এই স্তব গান ক'রে তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ ক'রো। বুদ্ধের করুণা, অহিংসার শক্তি নাগের বিষ ও হিংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। হে নাগ, তুমি চৈতন্যময় পুরুষের নবজন্মের অহিংসা ও করুণার মহিমা উপলব্ধি কর—হিংসাকে সংবৃত কর, তাকে বিগলিত কর। অভিশাপ থেকে মুক্ত হও।

নাগ স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হ'ল, তার সর্বাঙ্গে যেন অনির্বচনীয় প্রীতি ও তৃপ্তির শিহরণ ব'য়ে যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ বললেন—কুরুক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহে ধরণীর বক্ষ দাবদাহে দগ্ধ হয়েছে। পাপীর বিনাশে পাপের বিনাশ হয় নি। পাপ মানব-মনের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে। কুটিল কৌশলে বিকৃত ন্যায়ের নামে আত্ম-প্রকাশ করেছে। চৈতন্যময় পুরুষ এবার তাই নবজন্মে নূতন সাধনায়

পাপকে বিগলিত করতে উদ্যত হয়েছেন। তুমি গ্রহণ কর সেই সাধনা। প্রণাম কর চৈতন্যের নব মহিমাকে।

নাগের চোখ থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এল। অশ্বত্থের পত্র-পল্লবে মর্মরধ্বনির মধ্যে জাগল সেই বহু বৎসর পূর্বের পূর্ণিমা তিথির সেই অনির্বচনীয় সঙ্গীত। অনতিদূরে অজয়ের জলকল্লোলে সঙ্গীত-ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হ'ল। ঊর্ধ্বে আকাশের নীল মহিমাকে আবৃত ক'রে যে ধূলিস্তরের ধূসরতা সূর্যের তাপপ্রখর হয়ে বহুকাল আবৃত ক'রে রেখেছিল এই প্রান্তরকে, সে যেন ঘনশ্যাম ছায়ায় প্রসন্ন হ'ল। শোনা গেল—মহাকালের ডমরুধ্বনির মত গুরুগুরু ধ্বনি। মেঘ উঠল প্রান্তরে। ঝরঝর হ'ল বর্ষণ। ব্রাহ্মণ তারই মধ্যে গান গেয়ে চললেন। তারপর কাটল মেঘ, উঠল সূর্য, প্রসন্ন কিরণে ঝলমল ক'রে উঠল বহুকালের ধূলিধূসর প্রান্তর; অশ্বত্থবৃক্ষে দেখা দিল নূতন মুকুল। নাগ বললে—আজ থেকে আমি নিজের বিষকে নিজে গ্রহণ করব। সেই তপস্যায় আমি আসন গ্রহণ করলাম এই বনস্পতির পাদদেশে। হে মহামহিমান্বিত মহাদ্রুমের বংশধর, আমার তপস্যায় তুমি আমার সহায় হও। মুকুলিত বনস্পতি বললে—তারই জন্যই আছি আমার জন্ম এখানে।

তপস্যায় রত হলেন নাগ। বিষকে করলেন সংহরণ। সে বিষে নিজে হতে লাগলেন জর্জরিত। ওদিকে চারিদিকে জাগতে লাগল তৃণাঙ্কুর। লোকে বিস্মিত হ'ল। কি হ'ল? নাগের কি হ'ল? অবোধ তৃণাঙ্কুরলোভী পশু প্রশ্ন করলে না। এগিয়ে এল। তৃণভোজন ক'রে ফিরে গেল গ্রামে। মানুষ আরও বিস্মিত হ'ল। আকাশপথে অবাধে উড়তে লাগল পাখীর ঝাঁক। মানুষেরা এবার এগিয়ে এসে দেখলে—মহাভুজঙ্গরূপী ব্রহ্মশির সমাধিমগ্ন অশ্বত্থতলে।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন এই গ্রামের অধিবাসী সেই কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য ব্রাহ্মণ গায়ক। পরমানন্দ ঠাকুর। সামবেদান্তর্গত কুথুমীশাখৈক ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্থ পরম বৈষ্ণব পরমানন্দ ঠাকুর। এসে দেখলেন—সমবেত মানুষেরা সমাধিমগ্ন মহানাগের দেহ

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত জর্জরিত ক'রে দিয়েছে। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে আঘাত করেছে। তিনি 'হায়' 'হায়' ক'রে উঠলেন। বললেন—করেছ কি তোমরা? ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও।

তারপর ডাকলেন—মহানাগ, ব্রহ্মশির!

নাগ এবার ধীরে ধীরে মাথা তুললে, বললে—গুরু! আমি হিংসাকে সম্বরণ করেছি। চৈতন্যময় পুরুষের নূতন প্রকাশ-মহিমা উপলব্ধির পরমানন্দে আমি সকল আঘাত সহ্য করেছি। আমার মুক্তির সময় সমাগত। আমি অনুভব করছি—মুক্তি অদূরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সে আসতে পারছে না—আমার গুরুদক্ষিণার কার্য শেষ হয় নি ব'লে। তুমিই আমার গুরু। তুমি আমাকে দীক্ষা দিয়েছ। আমার অধিকারের এই ভূখণ্ড তুমি দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ কর। আমার মুক্তি হোক।

ব্রাহ্মণ বললেন—তথাস্তু।

বলবামাত্র একটি দিব্যজ্যোতি সেই মহাভুজঙ্গের দেহ থেকে নির্গত হয়ে আকাশলোকে বিলীন হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বর্ষণ হতে লাগল অমৃতের মত জলধারা। মেঘগর্জনের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল দশাবতার-স্তোত্র—

জয় জগদীশ হরে।

কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

* * *

এই প্রবাদ। এই প্রবাদবশেই গৌরীকান্তদের বংশে সাপ মারা নিষেধ। গৌরীকান্তেরা অবশ্য পরমানন্দ ঠাকুরের বংশোদ্ভূত নয়, তাঁদের বংশের নাকি দৌহিত্র। গৌরীকান্তদের বংশ শাক্তের বংশ। পরমানন্দ ঠাকুর ছিলেন বৈষ্ণব, পরমভাগবত রসশেখর জয়দেব গোস্বামীর শিষ্য। ঠাকুর-বংশের আর কেউ অবশিষ্ট নেই। সে বংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলে—ওই যে গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে 'ঠাকুরপাড়া', যে ঠাকুরপাড়ায় কেবলমাত্র মুসলমান বাস করে—ওই ঠাকুরপাড়াই ছিল

পরমানন্দ ঠাকুরের বংশের পাড়া। ওইখানেই তাঁরা বাস করতেন। এ অঞ্চলের মুসলমানদের গুরুস্থানীয় মিয়া-বংশের যে ভিটা, সেই ভিটাই ছিল পরামানন্দের ভিটা। এককালে নাকি এই মিয়া-বংশের কয়েকজন এই ভিটার প্রভাবে বৈষ্ণব হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা ইসলাম পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু মাংসাহার করতেন না। কেউ কেউ বলে—তাঁরা যোগাভ্যাস করতেন। ঠাকুর উপাধিও তাঁরা কেউ কেউ গ্রহণ করেছিলেন। মিয়া-বংশের সিদ্ধপুরুষ গুলমহম্মদ ঠাকুরের নাম এখনও লোকে মনে রেখেছে। পাথুরে পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্বকোণে তাঁর কবরে এখনও লোকে মানত ক'রে প্রদীপ জেলে দেয়, বাতি জেলে দেয়। ভিক্ষুকেরা সারি বেঁধে ব'সে থাকে আঁচল পেতে, লোকে মুঠোভরে চাল ডাল ভিক্ষা দিয়ে থাকে।" প্রবাদের সঙ্গে ইতিহাস আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছে।

* * *

প্রবাদটিকে স্মরণ ক'রে গৌরীকান্ত কাগজ কলম নিয়ে লিখে ফেলেছিল ; অতি সুন্দরভাবে সুকৌশলে মহর্ষি বেদব্যাসের রচনার একটি সুতোকে টেনে বের ক'রে নিয়ে প্রবাদটিকে নিপুণ বয়নে বুনে জুড়ে দিয়েছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নের গণ্ডী পার ক'রে দিয়েছে। অবিশ্বাস করতে চাও—মহাভারত-অবিশ্বাসের পাতকের ভাগী হবে। প্রবাদটিকে লিখতে গিয়ে গৌরীকান্ত নিজেও খানিকটা সুতো জুড়ে দিয়েছে। ইতিহাসের সুতো। প্রবাদের মধ্যে সবই আছে, নেই কেবল বুদ্ধের আবির্ভাবের গুরুত্ব। কিন্তু নাগের সঙ্গে ঠাকুরের কথার মধ্যে বুদ্ধ-বন্দনা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ আছে।

গৌরীকান্ত ভাবছিল—শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ-বন্দনা দিয়ে শেষ করলে কেমন হয় ? ভাবতে ভাবতেই উঠে গিয়েছিল বাথরুমে। বাথরুম, মানে পুবদিকের বারান্দার খানিকটা ছেঁচা বাঁশের থলপ বা দরমা দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে।

বেরিয়ে এসে দেখলে, শান্তি ব'সে আছে। টেবিলের উপর থেকে সগুলেখা কাগজখানা টেনে নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছে।

দশ

গৌরীকান্ত বললে—আমাদের গ্রামের সাপ সম্বন্ধে প্রবাদের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। সেই প্রবাদের কথাটা মনে প'ড়ে গেল। সেইটে লিখলাম। বিচিত্র নয়!

পড়তে পড়তেই শান্তি বললে—খুব বিচিত্র! ব'লেই সে আবার পড়ায় মন দিলে। একটি অতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছুর স্পর্শ গৌরীকান্তের চেতনাকে সচকিত ক'রে তুললে। সে স্পর্শ ছিল শান্তির কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। শান্তির মুখের দিকে তাকালে সে। চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে শুধু মসৃণ ললাট আর ঘন কালো ভুরু দুটি। কপালে সূক্ষ্ম কটি রেখা পড়েছে। ভুরু দুটি সেই সূক্ষ্ম রেখা কটির টানেই ঈষৎ কুঁচকে না উঠে পারেনি। এটুকুকে কৌতূহলের পরিচয় মনে করেই নিত গৌরীকান্ত, যদি না এই সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছুর স্পর্শের আভাস সে অনুভব করত অন্তরে অন্তরে।

সে ডাকলে—শান্তি!

—বলুন। মুখ না তুলেই উত্তর দিলে শান্তি।

—কথার মানে আর কথার সুর দুই মিলিয়ে কেমন যেন ঠেকল। অন্য কেউ হ'লে প্রশ্ন করতাম না—তুমি ব'লেই জানতে চাচ্ছি।

শান্তি এবার মুখ তুললে, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে তার মুখ সমুজ্জ্বল—ভুরু দুটি ঈষৎ উঁচু হয়ে উঠেছে—ঠোঁটের কোণে হাসির বক্র রেখা দেখা দিয়েছে। চোখের তারা দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাসিটি কথার সঙ্গে জড়িয়ে গেল, বললে—লেখকেরা নিজেদের লেখা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। কারণ থাকলে তো কথাই নাই—অকারণেও সন্দেহ ক'রে বসে—মনে করে বোধ হয় লেখার নিন্দে করছে।

—না। হাসলে গৌরীকান্ত।—অকারণ নয়। মায়ের চোখে ছেলে দেখে অন্যের হাসির ভুল মানে কখনও ধরা পড়ে না। মা হ'লে বুঝবে।

ভুরু দুটি টান হয়ে উঠল—ভঙ্গি পাল্টে গেল; সুইচ বন্ধ করলে বিদ্যুতের আলো নিবে ঘর যেমন চকিতে অন্ধকার হয়ে যায়—তেমনি ভাবেই শান্তির কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্তে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। শান্তি বক্রহাসি হেসে বললে—রোগা ছেলে সম্পর্কে কিন্তু মায়ের অহঙ্কার থাকে না। কানা ছেলেকেও পদ্মলোচন বলে মায়ে—কিন্তু রোগগ্রস্ত ছেলেকে রোগা বললে রাগে না, বরং ছেলের রোগ নেই বললেই তার দুঃখ হয়। ওখানে মায়ে আশ্বাসই চায় যে, রোগ যেন ভাল হয়। লেখাটি আপনার রুগ্ন গৌরীকান্তদা।

—সেই তো জানতে চাইছিলাম। কিছু যেন একটা আবিষ্কার করেছ—যার আভাস তোমার কথার সুরে বেজেছে। সেটা আমার কান এড়ায় নি।

—এ সব লিখে কত কাল আর মানুষদের অন্ধবিশ্বাসে জিইয়ে রাখবেন? আমাকে ইদানীং অনেকে বলেছে—গৌরীকান্তবাবুর মনের ইস্পাতে মরচে ধরেছে। হয়তো বা শেষ হয়ে গেছেন তিনি। মিথ্যে বলে নি তারা। এ সব লিখে কি হবে? মনগড়া মিথ্যের ঝুড়ি। আধা আধ্যাত্মিক আজগুবি। সাপেও কথা কয় না, গাছেও কথা কয় না। পুরাণের দোহাই পেড়েও কারও অভিশাপে কোন অস্ত্র মহানাগ হয় না। এমন কি আসামের নাগা জাতের কোন অস্ত্রবিদকে টেনে এনে গোঁজামিল দিয়েও সত্য ব'লে প্রমাণ করা যায় না।

বিস্মিত হ'ল গৌরীকান্ত। শান্তির চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে—যেন জ্বলছে। উত্তেজনায় মুখের শ্যামবর্ণ রঙের উপর রক্তাভা দেখা দিয়েছে। সবিস্ময়ে গৌরীকান্ত বললে—কিন্তু এ তো আমার কল্পনা করা কিছু নয় শান্তি। এ তো নবগ্রামের প্রবাদ কাহিনী। এ প্রবাদকে মুছে দিতে চাইলেই বা দেবে কি ক'রে? এর সঙ্গে এখানকার বাসীন্দাদের জীবনধর্ম কুলধর্ম আচার ব্যবহার হাজারো বাঁধনে বাঁধা রয়েছে। তুমি হয়তো লক্ষ্য কর নি, আমাদের বাড়ীর শক্তিপূজা,

দুর্গাপূজা কালীপূজায় বলিদান নেই। আমরা শাক্ত, কিন্তু ওই ঠাকুর-বংশের দৌহিত্র হিসেবে আমরা তাঁদের কোন এক বংশের উত্তরাধিকারী ব'লে শক্তিমন্ত্রের উপাসক হয়েও আচারে ধর্মে বৈষ্ণব।

শান্তি তিক্ত হেসে আকাশের দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—আপনার জীবনের গোড়াটা আমার মামার মত। মামা গোঁড়া পণ্ডিত বাড়ীর ছেলে—সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত ভগ্নিপতি আমার বাবার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সংস্কৃত না প'ড়ে ইংরিজী পড়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস থেকে রেভ্যুলিউশনের শিক্ষা নিয়েও তার জন্যে মনের জোর খুঁজতে গীতা পড়তেন। বিজ্ঞান প'ড়েও রোজ সকালে উঠে ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ব'লে সন্ধ্যে করতে বসতেন। সে ওই গোড়াকার ক'বছরের বংশধারার প্রভাবের ফলে। আপনিও ঠিক তাই—গোড়াকার সেই নবগ্রামের ঠাকুর-বংশের দৌহিত্র-বাড়ীর শিক্ষার প্রভাবে এ-কালের লেখক হয়েও কিছুতেই সেকালকে অতিক্রম করতে পারছেন না!

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে যেন হঠাৎ সে ব'লে উঠল—মুছে যাবেন, গৌরীকান্তবাবু, মুছে যাবেন আপনি।

গৌরীকান্ত সবিস্ময়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কোন্ শান্তি? এ যেন নূতন কেউ শান্তির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছে।

শান্তি বললে—আমার মুখের দিকে এমন ক'রে তাকিয়ে কেন গৌরীকান্তবাবু? আমি যা বলেছি তা আপনার বুঝতে না-পারার কথা নয়।

—কিন্তু এ কথাগুলি তোমার মুখে নতুন। তোমার যে পরিচয় আমি জানি তাতে এ কথা তোমার নয়। তাই কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ তুমি কোন নতুন তুমি।

—আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘকাল পরে দেখা গৌরীকান্তবাবু। এতকালের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘ'টে গেল পৃথিবীতে, আমাদের অবস্থাতেই কি ঘটল তা অন্তরে অন্তরে অনুভব না করতে পারলেও চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আশীবিষ বলে বোধ হয় কাঁকড়া বিছেকে—কাঁকড়া বিছের

বিষের জ্বালা কামড় না-খেলে বোঝা যায় না—তা জানি, কিন্তু যাকে কামড়ায় তার ছটফটানি দেখলেও কিছুটা অনুমান করা যায়। সুতরাং এতকাল পরে পুরনো আমির বদলে নতুন আমিকে দেখলে অবাক হবেন কেন?

গৌরীকান্ত হাসলে।

—হাসলেন যে?

—নির্বোধে বুদ্ধিমানদের চেয়ে বেশীবার হাসে শান্তি। আমি নির্বোধ। তোমার সঙ্গে যেদিন এখানে এসে প্রথম দেখা হ'ল সেদিন তুমি গৌরীকান্তদা তোমার প্রিয় লেখক ব'লে হেসে সম্ভাষণ করলে—আমি নির্বোধ, বিগলিত হয়ে হাসলাম। আজ গৌরীকান্তবাবু ব'লে সম্বোধন ক'রে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলে, নূতনকালের সত্য পরিচয় প্রকাশ করলে—সুতরাং আর একবার হাসলাম। তুমি চ'লে গেলে আর একবার হাসব—একলা একলাই হাসব। আমি কি নির্বোধ, ভেবে হাসব।

উত্তপ্ত হয়ে উঠল শান্তি—মুখের উপর রক্তোচ্ছ্বাসের ছটায় সে উত্তাপ দূরের আগুনের লালচে আভার মত বর্ণচ্ছটায় আত্মপ্রকাশ করলে।

গৌরীকান্ত হাসতে হাসতেই বললে—তুমি চ'লে গেলে হয়তো অনেকক্ষণ ধ'রে হাসব শান্তি।

শান্তি বললে—কেন? এখানে এসে আমার নামে যে কুৎসা রটেছে তা শুনেও আমার পরিবর্তনের কথা—

বাধা দিয়ে গৌরীকান্ত বললে—কুৎসা তো কুৎসাই। সে তো চিরকাল মিথ্যা।

—কিন্তু আমি যে শিশু সন্তান কোলে নিয়ে রুগ্ন দেহে এখানে এসেছিলাম সে তো মিথ্যে নয়। কুমারী অবস্থায় আমি সন্তানের মা হয়েছি—এ রটনার পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে? বিশেষ ক'রে এ সত্বেও যখন আমি বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করি না?

—কি বলছ তুমি শান্তি ? ছি ! চুপ কর, মাথা ঠাণ্ডা কর।

—মাথা আমার আপনার চেয়ে ঠাণ্ডা রয়েছে গৌরীকান্তবাবু। হাসতে চেষ্টা করলে শান্তি।

—তা হ'লে এমন অসংলগ্ন কথা তুমি বলতে না। যে কথা বললে তুমি, তার সঙ্গে আমাদের আলোচনার সম্পর্ক কি ? তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ।

—না। দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে শান্তি বললে—আমি ঠিক বলছি। যারা আপনাদের এই আজগুবি অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক প্রবাদে বিশ্বাস করে না, নূতন সত্যকে যারা চায় তাদের বিরুদ্ধে এই তো আপনাদের বিশ্বাস। তারা যে হেতু ঈশ্বর মানে না সে হেতু তারা আচারভ্রষ্ট, তারা কোন নীতি মানে না !

—না। বাধা দিলে গৌরীকান্ত। বললে—তোমার সম্পর্কে সে আমি ভাবি না—ভাবতে পারি না।

—কেন বলুন তো ?

—বিশ্বাসের কথা শান্তি। থাক্, ও নিয়ে আলোচনা থাক্। আমার বিরুদ্ধে যত নালিশই থাকুক তোমার—তোমার বিরুদ্ধে কোন নালিশই করব না। নেইও কোন নালিশ।

একটু চুপ ক'রে ব'সে রইল শান্তি। তারপর বললে—জানেন আমার নামে একটা দরখাস্ত হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাছে। কপি পাঠিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে এডুকেশন মিনিস্টার পর্যন্ত। তাতে এই অপবাদ জানিয়েই নতুন অপবাদ জানিয়েছে যে, স্কুলের সেক্রেটারী গুণীবাবুর সঙ্গে সম্প্রতি আমার প্রণয়খেলা চলছে, সেই হেতু সমস্ত গ্রামের আপত্তি সত্ত্বেও আমি স্কুলের চাকরীতে বহাল রয়েছি। এনকোয়ারির জন্য বোধ হয় স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গৌরীকান্ত বললে—আমার গ্রামের লোকেরাই এ দরখাস্ত করেছে—এ লজ্জা আমারও। কিন্তু এর জন্যে তুমি কিছুমাত্র ভেবো না। কিশোরবাবু—গুণী—

ঘাড় নাড়লে শান্তি। কথার মাঝখানেই কথার উপর কথা ব'লে উঠল। বললে—আমি তার জন্যে আপনার কাছে কিন্তু আসি নি।

—আমি তা বলি নি ভাই।

—কাল রাত্রে কিশোর মামা আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। আপনি তাঁকে কি বলেছেন?

—কি বলেছি? বিস্মিত হ'ল গৌরীকান্ত।

—বলেছেন, আমার মা যদি আপনার অংশের দেবসেবার ভার নেন তা হ'লে এখানকার বাড়ী এখানকার জমিজমার কিছুটা দিয়ে আপনি কৃতার্থ বা ধন্য না নিশ্চিন্ত এমন একটা কিছু হন।

—কথা হয়েছিল, কিন্তু এ কথা তো বলতে আমি বলি নি শান্তি।

শান্তি বললে—জানেন, সেদিন আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম, বাজারে চক্রধারী দত্তের দোকানের বারান্দা থেকে কে একজন বললে—ওরে জানিস, ইনি আমাদের গৌরীবাবুর পুরনো ভালবাসার লোক। সেই জন্যে এত জায়গা থাকতে এখানে। ভোজ লাগল ব'লে।

ছি—ছি—ছি! গৌরীকান্ত মাথা হেঁট করলে।

শান্তি ব'লেই গেল—আপনার কাছে গোপন করব না, আমার মন—। হঠাৎ থমকে গেল। শান্তি বললে—একজনের সঙ্গে আমি বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ রয়েছি। আমি যে শিশুটিকে কোলে ক'রে এখানে এসেছিলাম—সে সন্তান তাঁর।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গৌরীকান্ত। নির্বাক হয়ে রইল। কোন বাক্য সে খুঁজে পেলে না।

শান্তি বললে—তাঁর প্রথম প্রিয়ার গর্ভের সন্তান। মেয়েটি ছিল আমার বান্ধবী সহকর্মিণী। সন্তান গর্ভে নিয়ে সে রোগে পড়ল। কেউ কোথাও নেই—কে সেবা করবে? আমাকে থাকতে হ'ল তার কাছে। সে মারা গেল সন্তান রেখে। পুরুষটির আকর্ষণ চুম্বকের মত—ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ, ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য, তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি

তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তিনি কাল রাত্রে এসেছিলেন, তিনিও আমাকে ওই প্রশ্ন করলেন। কথাটা তাঁর কানেও গিয়েছে।

—কে বললেন? তোমার মা?

—না। বাজারের গুজব, বাতাসে ভেসে গিয়ে পৌঁছেছে বোধ হয়।

—বাজারে এ গুজব তুলবে কে? এক কিশোরবাবুর সঙ্গে কথায়-কথায় কথাটা আমি তুলেছিলাম। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম—পৈতৃক বিষয়ের কথা, বংশের কীর্তি এবং সেই কীর্তিরক্ষার কথা। সম্পত্তি তাঁদের, দেবসেবা তাঁদের। ভাবছিলাম যখন দায়িত্ব পালনের শক্তিই নেই, অবকাশও হবে না, তখন নামেই বা কেন সে সম্পত্তির মালিক সেজে আগলে থাকি? বিজয়ের মা খুড়ীমাই সব করেন—বিজয় সম্পত্তি দেখাশোনা করে; ওরা জ্ঞাতি—ওরাই নিক। কিন্তু কিশোরবাবু বললেন, তাতে খুড়ীমা যদ্দিন তদ্দিন, বিজয় দেবতাতে বিশ্বাসও করে না অবিশ্বাসও করে না; তা ছাড়া সম্পত্তি রক্ষা করার পরিশ্রম ওর কাছে ঝামেলা, বিক্রী ক'রেই আনন্দ ওর। হঠাৎ মনে হ'ল তোমার মায়ের কথা, তোমার কথা।

—সে কথা নয় গৌরীকান্তবাবু।

—গৌরীদাদা বলতে তোমার বাধছে কেন শান্তি? কানে বড় কটু ঠেকছে। তোমার মুখে ওই ধারার সম্বোধন শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে এসেছ আজ।

—না। আজ সমস্ত মিথ্যে অভিনয় দূরে রেখে সোজা কথা কইতে এসেছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে গৌরীকান্ত বললে—তার মানে, সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়াই।

—হয়তো তাই। যাঁর কথা বলছিলাম, তিনি ওই বাজারের গুজবটা শুনেছেন। ওই ভোজের কথাটা।

এবার গৌরীকান্ত হেসে উঠল। বললে—বল তো তাঁর সঙ্গে

দেখা ক'রে যে কোন হলপ ক'রে আমি বলতে পারি যে, তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই।

—না, তা বলবার দরকার নেই। তবে এই ধারার অকারণ দাক্ষিণ্য দেখাবার প্রস্তাব করবেন না।

একটু হেসে শান্তি বললে—নবগ্রামে এসে কিশোরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কিশোরবাবু আপনার বাড়ীটা দেখিয়ে বললেন—এইটি গৌরীকান্তের বাড়ী। লেখক গৌরীকান্ত মুখুজ্জে। চমকে উঠলাম। গৌরীদার বাড়ী! বাবা যে বাড়ীটুকু করেছিলেন তার দখল সংমায়ের ভাইপোরা দিলেন না। শুনলাম, আইনেও পাব না। ওঁদের সঙ্গে জবরদস্তির ক্ষমতাই বা কোথায়? কিশোরবাবুর কথা শুনে বললাম—গৌরীদার বাড়ী! তাঁর সঙ্গে তো আমার অনেক পরিচয়। তা হ'লে এই বাড়ীতেই থাকব আমরা। তাঁকে চিঠি লিখছি—তিনি নিশ্চয় খুলে দিতে বলবেন। তিনি সেদিনও সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন—না। তার থেকে গুণীবাবুদের আশ্রয় ভাল।

গুণীবাবুদের আশ্রয় ভাল? কথাটা মনের মধ্যেই আলোড়িত হ'ল। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল গৌরীকান্তের। কিন্তু কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল। পর-মুহূর্তেই তার মনে হ'ল, এই ব্যক্তিটি যিনিই হোন—তার সম্পর্কে যে ধারণাই পোষণ করুক—এ ক্ষেত্রে কিন্তু সে নির্ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। একচুল ভুল করে নি। গুণীদের আশ্রয় নিয়ে ঠিকই করেছে। ভাল বাড়ী পেয়েছে, পাকা মিলানো দোতলা বাড়ীর নীচের তলার কখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছে গুণী। এখানকার আপার প্রাইমারি গার্লস স্কুলটিকে মাইনর স্কুলে পরিণত ক'রে শান্তিকে চাকরী দিয়েছে। গৌরীকান্তকে আপনার জন ঘোষণা ক'রে তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে আশ্রয় হয়তো একটা মিলত, কষ্ট খুব হ'ত না, কিন্তু চাকরীটা নিশ্চয় মিলত না। সে কিশোরবাবু চেষ্টা করলেও না। এবং নবগ্রামে শান্তিরা থাকতে পারত কি না তাতেও সন্দেহ আছে। এখানকার লোকদের বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠত। কালই তার কাছে

এসেছিলেন—রাধাশ্যাম ভট্‌চাজের স্ত্রী। গুপীদের বাড়ীর পাশেই ওঁদের বাড়ী। দুটি বিধবা মেয়ে, একটি বেকার ছেলে। মেয়ে দুটি এ-বাড়ী ও-বাড়ী স্বচ্ছল ঘরের আচারপরায়ণা বিধবাদের জন্য খাবার জল তুলে দেয়। যাদের বাড়ীতে দেবসেবা আছে তাদের বাড়ীর দেবতার ভোগ রান্না করে। তাদের চ'লে যায় একরকম ক'রে। কিন্তু প্রৌঢ়ার নিজের এবং ছেলের অন্ন সংস্থান হয়েছে সমস্যার কথা। তিনি এসেছিলেন কিছু সাহায্যের জন্য। এসে যত গালাগাল দিয়ে গেলেন দেশের শাসনকর্তাদের, তার চেয়েও বেশী দিলেন এই শান্তিদের। শাসনকর্তারা একচোখো, তাদের বিচার নেই, বিবেচনা নেই। ওই পাপ আপদ, ওই বাঙাল দেশের যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারাই হয়েছে—পুষ্যিপুত্তুর। মাস গেলেই সরকারী তহবিল থেকে টাকা পাচ্ছে। কেন? ওরা পাবে কেন? আমরা পাব না কেন?

রেফিউজি হিসেবে সরকারী মাসিক সাহায্য পায় শান্তির সঙ্গে যারা এসেছে তারা। এরা পায় না। আরও অনেক অভিযোগ।

ভালই করেছে। গুপীর আশ্রয় নিয়ে ভালই করেছে শান্তি।

গৌরীকান্ত একটু ম্লান হেসে বললে—তাই হবে শান্তি। এমন কোন কথাই আমি আর উচ্চারণ করব না ভাই। আমার বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল।

কি ছিল গৌরীকান্তের কণ্ঠস্বরে, শান্তির আয়ত চোখ দুটি মুহূর্তে জলে ভ'রে উঠল। চোখ দুটো ফেটে যেন উৎসের মত জল বেরিয়ে এল। ঠোঁট দুটি তার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

তাড়াতাড়ি সে মাথাটি হেঁট করলে। চোখের জল কে জানে কেন—শান্তির নিজেরই অজ্ঞাতসারে লজ্জার হেতু হয়ে উঠেছে। চোখের জল গৌরীকান্তকে সে দেখাতে চায় না। চোখ থেকে জল টপটপ ক'রে মাটিতে ঝ'রে পড়ল। কিন্তু আঁচল দিয়েও মুছতে পারলে না। গৌরীকান্ত দেখতে পাবে। জানতে পারবে তার চোখের জলের কথা। অকস্মাৎ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

গৌরীকান্তও স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল, সেও তাকিয়েছিল অন্যদিকে—শান্তির দিকে সে তাকায় নি। তার নিজের মনের কাছেই অনির্দিষ্ট কিছু যেন ভাবছিল সে। শান্তি অকস্মাৎ এমন ভাবে উঠে যেন ছুটে পালিয়ে যেতেই ওর চমক ভাঙল।

—শান্তি! চকিত চেতনার প্রেরণাতেই সে ডেকে উঠল—শান্তি!

কি হ'ল শান্তির? দাঁড়িয়ে উঠল। পর-মুহূর্তেই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও ফেললে—একটু ম্লান হাসিও হাসলে। মমতা প্রীতি স্নেহ প্রেম এগুলো তো মিথ্যে নয় সংসারে! এর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা তো সহজ নয়! কিন্তু! কিন্তু শান্তির মত মেয়ে যে মানুষটিকে এমন ভাবে ভাল বেসেছে—সে মানুষটি কে? কেমন? মানুষটি যে সাধারণ মানুষ নয়, তাতে তার সন্দেহ নেই। শান্তি তার প্রথম প্রিয়তমার সন্তানকে কোলে নিয়ে এসেছিল—লোকে এতবড় অপবাদটা তাকে দিয়েছে, তবু সে বাদ-প্রতিবাদ কিছু করে নি, কথাটাও প্রকাশ করে নি; নিজের মায়ের কাছে পর্যন্ত করে নি। অসাধারণ তার আকর্ষণ এবং বুদ্ধির দিক দিয়েও সে ক্ষুরধার বাস্তব-বুদ্ধির অধিকারী। নির্ভুল তীক্ষ্ণ বিচারে—হিসাব ক'রে গুণীর আশ্রয়ই বেছে নিয়েছে সে শান্তিকে। শান্তির কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, এত সব কথা দেবকী দেবী জানেন না, কিশোরবাবুও জানেন না। জানলে কিশোরবাবু কখনও শান্তিকে এমন ভাবে গ্রহণ করতেন না। সে সন্তোষবাবুর কন্যা হ'লেও না।

এগার

এনকোয়ারির সময় শান্তি নাম করলে শুধু বান্ধবীর। বন্ধুর নাম মুখে উচ্চারণ করলে না। বললে—সে সন্তানটি আমার এক বান্ধবীর। তিনি বিবাহিতা মেয়ে; স্বামী পাকিস্তানে। সেখানে তিনি আটকে আছেন নানা কারণে। আসবার উপায় নেই। আমি যে রেফেউজি কলোনীতে

স্কুল করতে চেষ্টা করছিলাম—সেইখানে তিনিও ছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তাঁর বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল না। স্বামীকে ঠিক ভালবাসতে পারেন নি তিনি। এখানে যাকে ভালবাসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তারপর—

আবার চুপ করলে সে। আবার বললে—হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিল; না হ'লে হয়তো বিবাহবিচ্ছেদ ক'রে তাঁরা সুখী হ'তে পারতেন। আর এ কথা প্রকাশ পেলে অর্থাৎ তাঁর স্বামী জানলে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পাবেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যুশয্যায় ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—নিশ্চিন্ত থাক তুমি ভাই। তোমার ছেলে আমি নিলাম। নিজের সন্তানের মতই মানুষ করবার চেষ্টা করব। তাতে কলঙ্ক যদি রটে তো আমার রটবে—সে আমি বরণ ক'রে নেব। তোমার নাম কোন দিন প্রকাশ পাবে না। এ আপনারা বিশ্বাস করতে হয় করুন—না হয় করবেন না। আমাকে ডিস্‌মিস্ করুন।

এনকোয়ারির জন্য সদর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিলেন এস-ডি-ও, শিক্ষাবিভাগের ডিস্ট্রিক্ট ইনস্‌পেক্টর আর এসেছিল গুণীবাবু—নবগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালী বাড়ীর উত্তরাধিকারী। গুণীবাবুদের প্রকাণ্ড পাকাবাড়ী, সে বাড়ী একটি দুটি নয়—চারখানা প্রাসাদের মত অট্টালিকা শূন্য প'ড়ে রয়েছে। ঠাকুরবাড়ী, কাছারী-বাড়ী, আস্তাবল, সে সব নিয়ে রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা। সব প'ড়ে রয়েছে। ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরেরা আছেন, পুজার ব্যবস্থা আছে, পার্বণগুলিও যথানিয়মে হয়, কাছারীবাড়ীতে অল্প ক'জন কর্মচারী থাকেন এখানকার বাড়ী ঘর পুকুর বাগান তদারকের জন্য। বড় বড় দীর্ঘ সুন্দর বাগান। কীর্তি গুণীবাবুদের এখানে প্রচুর। হাই স্কুল, গার্লস স্কুল, টোল—মোট কথা গুণীবাবুদের সমৃদ্ধিতেই নবগ্রামের সমৃদ্ধি। ইংরেজ আমলে তাঁদের ছিল অপ্রতিহত প্রতাপ।

শুধু প্রতাপই নয়, এখানকার সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা ছিলেন দেবতার তুল্য। বিরোধ ছিল—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষুদ্র, জমিদার-সম্প্রদায় ছিল তাদের বিরোধী। সেই বিরোধের পরিণামে—গুণীবাবুরা নবগ্রাম ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। সে আজ বারো বৎসর হয়ে গেল। সাধারণ লোকে হায় হায় করেছিল, মধ্যবিত্তরা নিজেদের জয় হ'ল ঘোষণা ক'রে উল্লসিত হয়েছিল। গুণীরা এখন সদর শহরে বাড়ী করেছে। এক অংশ থাকে কলকাতায়। গুণী সদরে থাকলেও সে-ই এখনও এখানকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছে, সেখান থেকে তাকে তাড়াতে কেউ পারে নি। কংগ্রেস রাজত্বে কংগ্রেসী বিজয়েরও সে সাধ্য নেই। গুণীই গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী। প্রেসিডেন্ট, কিশোরবাবু। কিশোরবাবুকে প্রেসিডেন্ট গুণীই করেছে।

তদন্তটা প্রকাশ্য তদন্ত নয়। গুণীই তা হতে দেয় নি। বেনামী দরখাস্তখানার নকল যদি মন্ত্রী-দপ্তর পর্যন্ত না পৌঁছুত—তা হ'লে গুণী এ নিয়ে তদন্তই হতে দিত না। প্রকাশ্য তদন্ত নয় ব'লেই ব্যাপারটা সর্বসাধারণে জানত না। জানানো হয়েছিল কিশোরবাবুকে এবং শান্তিকে। কিশোরবাবুর বাড়ীতেই স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। কর্মসূচীতে ছিল স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা আলোচনা এবং উন্নতির উপায় নির্ধারণ।

কিশোরবাবু সর্বাগ্রে বললেন—আমি আন্তরিকভাবে শান্তির কথা বিশ্বাস করি। শান্তি অসৎ মিথ্যাবাদিনী—এ কথা কেউ হলপ নিয়ে বললেও আমি বলব, সে হলপ ক'রেই মিথ্যা বলছে।

গুণী সায় দিলে, কিশোরবাবুর কথা সমর্থন করলে।—আমিও তাই বলি। নবগ্রামের মিথ্যা দরখাস্তের কথা সরকারী দপ্তরে অজানা নয়। দরখাস্তখানা ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল।

কিশোরবাবুর হাই ব্লাড-প্রেসার, সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য এই সরল উদার আদর্শবাদী মানুষটির এ স্বভাব চিরকালের;

উত্তেজনার বশে কিশোরবাবু চেয়ারে বসেন নি, তিনি পায়চারি করছিলেন। গুণীর কথা শেষ হতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—এ আমাদের প্রকাশ্য তদন্ত নয়। হ'লে আর একজন বিশিষ্ট লোক আমাদের কথার সমর্থন করত। আমরা শান্তিকে নতুন দেখছি। তার বাপ আমার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন—কিন্তু তার সঙ্গে আমার পরিচয় নতুন। গৌরীকান্ত শান্তিকে অনেক দিন থেকে চেনে। শান্তির মামা নন্দবাবুকে সে জানত। নারাণগঞ্জে ওঁদের বাড়ী সে গিয়েছে, সেখানে থেকেছে। সেও ঠিক এই কথাই বলবে।

গৌরীদা?—সবিস্ময়ে গুণী প্রশ্নই করলে।

ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও তাঁরাও ওই প্রশ্ন করলেন—লেখক গৌরাকান্ত-বাবু?

—হ্যাঁ। সে এখানে রয়েছে। এবার পয়লা বৈশাখ ফিরে এসেছে গ্রামে।

—হ্যাঁ, তা জানি। এখান থেকেই আমরা গৌরীদার ওখানেই যাব। ওঁরা সকলেই দেখা করতে ব্যস্ত। কিন্তু গৌরীদা শান্তি দেবীকে জানেন? কই মিস মুখার্জী, এ কথা তো শুনি নি? বলেন নি তো?

শান্তি একটু হেসে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে—যে লোক নিজের গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছেন, নিজের লোকদের ভুলেছেন, যিনি আজ বহু পরিচয়ে ধন্য, তিনি আমার মত নগণ্য পরিচয়ের কাউকে চেনেন ব'লে স্বীকার যদি নাই করেন—সেই ভয়ে কথাটা কাউকে বলি নি। গৌরীবাবু আসবার আগে পর্যন্ত কাউকে বলি নি। কিশোর মামাকেও না।

গুণীর মুখে অকস্মাৎ একটু মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। সে রেখা মৃদু হ'লেও কারুর অগোচর রইল না। সকলেই বোধ করি গুণী কি বলে শোনবার জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়েছিল। হাসিটি বিচিত্র। সেই কারণেই চোখ তাতে নিবদ্ধ হয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টি এবং মুখের হাসি দুই মিলে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। সে হাসিতে শান্তি

অকারণেই লজ্জিত হ'ল। পর-মুহূর্তেই সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল এবং প্রশ্ন করল—আপনি হাসলেন কেন?

—তখন আপনার বাবা বেঁচেছিলেন?

—না। আর আমার বাবার পরিচয়েও ওঁর সঙ্গে সে সময় আমার পরিচয় হয় নি। মামার পরিচয়েই সাক্ষাৎ পরিচয়; নইলে পরিচয় লেখক-পাঠক হিসেবে। আমরাও ওঁকে জিজ্ঞাসা করি নি—কোথায় বাড়ী, কোন্ জেলা, কোন্ গ্রাম। এখানে এসে শুনলাম—লেখক গৌরীকান্তের বাড়ী এখানে।

—বিচিত্র ব্যাপার তো!

—কেন? এর মধ্যে বৈচিত্র্যটা কোথায়? বাংলাদেশের লেখক—তার বাড়ী বাংলাদেশ। ঠিকানা জেনেছিলাম, কলকাতায় থাকেন।

—তবু খানিকটা আছে বৈচিত্র্য। গৌরীদার বাবা আর আপনার বাবা অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শুনেছি দুজনে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতেন। গল্প, শাস্ত্রালোচনা অনেক কিছু। তাঁদেরই ছেলে আর মেয়ে দুজনকে চেনেন,—অবশ্য আলাপ পরিচয় কত অন্তরঙ্গ তা আমি জানি না;—অথচ পরস্পরের বাপের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা জানেন না। এতে খানিকটা বিচিত্র কৌতুক বা যোগাযোগের বৈচিত্র্য রয়েছে বইকি।

গুণীর এতক্ষণের সব কথাবার্তার মধ্যেই একটু হেঁয়ালির সুর ছিল—যাতে সকল শ্রোতারই মনে খানিকটা কৌতূহল জেগে উঠছিল। কিন্তু কোথাও তার মধ্যে এতটুকু তীক্ষ্ণাগ্র কিছু ছিল না, যা খোঁচা দেয়—অস্বস্তির উদ্রেক করে—গ্লানিকর কিছু ছিল না, যা মনের মধ্যে মানুষকে ঘর্মাক্ত করে। কথাগুলির শেষের দিকটা এমন প্রসন্ন এবং মধুর হয়ে উঠল যে, কিশোরবাবু একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন—সে কথা আমি কতবার বলি। তা ছাড়া তোমরা বোধ হয় জান না, সন্তোষদা শেষ বয়সে নবগ্রামের প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ ক'রে একখানি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অনেকটা লিখেছিলেন। এখান থেকে যখন চ'লে যান তখন অসম্পূর্ণ খাতাগুলি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

ভাই কিশোর, আমরা তো টোলে-পড়া সেকেলে পণ্ডিত—এ আমার ভাল হয় নি। তুমি লিখো। তুমি পারবে। তাতে যা পড়েছি সে যোগাযোগ আরও বিচিত্র। সে খাতাখানা আমি এমন যত্ন ক'রে কোথায় রেখেছি যে, শান্তিরা এখানে আসা অবধি আমি খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, তবু পেলাম না। তবে হারিয়ে যায় নি। হারাবে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও চুপ ক'রেই ছিলেন। এস-ডি-ও প্রবীণ, ম্যাজিস্ট্রেট নবীন। তদন্তের আলোচনাটা—গৌরীকান্তের নামোল্লেখে খানিকটা অসংলগ্ন হয়ে পড়লেও একেবারে অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। কিশোরবাবু আলোচনাটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে নবগ্রামের প্রাচীন কাহিনীতে এনে ফেললেন। কাজের মানুষ কাজ করতে এসে কাজের কথার বাইরে গেলেই সতর্ক হয়ে ওঠে। শাসন-বিভাগের কর্মচারীদের এ বিষয়ে সচেতনতায় বৈশিষ্ট্য আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি কথার ছেদ পড়তেই ব'লে উঠলেন—একটা কথা। অর্থাৎ প্রাচীন কাহিনীর আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন।

গুণী এবং কিশোরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা তো এর সঙ্গে গৌরীকান্তবাবুর মতামতটাও যোগ ক'রে দিতে পারি। মিস্ মুখার্জীকে উনি অনেক দিন থেকে জানেন এবং তাঁর মত লোকের বিশ্বাসের গুরুত্ব—দুটোতে মিলে খুব মূল্যবান হবে। আপনার নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই মিস্ মুখার্জী?

—আপত্তি আমার নেই। কিন্তু আমি সেখানে যাব না।

—না, তা বলব না আপনাকে। আপনাকে আসামীর মত খাড়া রেখে তাঁর সাক্ষী নেব না। আপনি বাসায় চ'লে যান।

তারপর একটু হেসে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না যেন। এ দরখাস্তের তদন্ত হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের নিয়ম। আমরা চেয়েছিলাম—পেয়েছি। তার ভাল মন্দ দুইই ভোগ করতে হবে।

কিশোরবাবু একটু হেসে আপন মনে আবৃত্তি করলেন রামায়ণের

শ্লোক—বাল্মীকি যে বাক্য বলে রামচন্দ্রকে সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন সেই শ্লোক তিনি আবৃত্তি করলেন—

"বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।
নোপাস্নীয়াৎ ফলস্তস্যা তুষ্টৈবং যদি মৈথিলী ॥"

শান্তি নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। দরজা খুলে দিলে গুণী নিজে। মেয়েদের জন্তে উঠে দরজা খুলে দেওয়া, কি তাদের একটু এগিয়ে দেওয়া এসব রীতিনীতি সম্পর্কে কিশোরবাবু নিতান্তই অজ্ঞ এবং উদাসীন।

* * * *

নবগ্রামের পথ ধূলিধূসর। দু পাশের বাড়ী জীর্ণ। সমৃদ্ধি যখন জীর্ণ হয়ে জঞ্জালে পরিণত হয় তখন রূপ হয় অতি সকরুণ। নবগ্রামের এক কালের সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ-বাড়ীগুলির সেই দশা।

নবীন ম্যাজিস্ট্রেটটি সেই দেখতে দেখতে চলেছিলেন। মৃদুস্বরে গুণীকে বললেন—প'ড়ো ভিটেগুলিতে রেফিউজিদের বাস করানো যায় না গুণীবাবু?

গুণী কথার জবাব তাঁকে না দিয়ে প্রশ্ন করলে কিশোরবাবুকে—কিশোরবাবু!

কিশোরবাবু পথে একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, অন্তমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিলেন। গুণীর ডাকে মুখ তুলে তাকালেন, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—আমাকে বলছ?

গুণী হেসে ফেললে। কিশোরবাবুর রকম-সকম দেখে গুণীর হাসি পায়। বিচিত্র মানুষ! বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসির সঙ্গে বক্তব্যটুকুকে দ্রুত মিশিয়ে দিয়ে বললে—ডি-এম একটা চমৎকার প্রস্তাব করেছেন। বলছেন—এখানকার যে সব ভিটে প'ড়ো হয়ে গেছে, প'ড়ে আছে, সেই সব ভিটেতে রেফিউজিদের বাস করালে হয় না! অবশ্য গভর্ণমেন্ট একটা দাম দেবেন ভিটের। যারা মালিক তারা ক্ষতিপূরণ পাবে।

কিশোরবাবু মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন—গুণী, যেদিন দেশ ভাগ হ'ল, সে দিন আমি সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম। আসুক পূর্ব

বঙ্গের হিন্দুরা, আমাদের পতিত ভিটে নতুন ক'রে গ'ড়ে উঠুক। এক মুঠো অন্ন আমরা আধ মুঠো ক'রে ভাগ ক'রে খাই।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিশোরবাবু—১৯০৫ সালে দীক্ষা নিয়েছিলাম স্বদেশমন্ত্রে। তার আগে স্বামীজীর মন্ত্রে আসন গ্রহণ করেছিলাম সাধনার। আমি তো দিব্যচক্ষে দেখি, পূর্ববঙ্গের সমাগত হিন্দুদের সমস্যার এই একমাত্র সমাধান। ১৯০৫ সাল হ'লে এ সমাধান এক দিনে হয়ে যেত। জান, তোমাদের অতিথি-ভবনের সামনে সভা করলাম। বিলিতী কাপড় বর্জন করব। পোড়াও বিলিতী কাপড়। এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের সব বিলিতী কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল; কিন্তু ১৯৫০ সাল—১৯০৫ সাল থেকে অনেক পৃথক, অনেক আলাদা।

চিরকালের ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী আজীবন কুমার এই মানুষটির স্বভাবই এই। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে আর রক্ষা থাকে না। একলাই ব'কে যাবেন। এই কারণে গুণী আড়ালে কিশোরবাবুকে বলে—চন্দ্রবাবু। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবু।

গুণী মৃদুস্বরে ডি-এমকে বললে—এই হ'ল! এ লেকচার আর থামবে না। এ চন্দ্রবাবুর সেই আদর্শ দেশলাইয়ের কাঠি—চট ক'রে জ্বলবে, কিন্তু একটু একটু ক'রে জ্বলবে, অনেকক্ষণ ধ'রে জ্বলবে—প্রদীপ জ্বালাবে—উনোন ধরাবে—কাপড়ে ধরাবে—কাপড় বেয়ে চালে ধরবে—দাউ দাউ ক'রে জ্বলবে।

কিশোরবাবু ব'লেই গেলেন—আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম, লোকে আমাকে পাগল ব'লে উপহাস করেছে। ছোট মহাদেব সরকার অ্যাণ্ড ছোট অক্ষয় মুখুজ্জে। আমি বলেছিলাম প্রতি দশ বিঘে জমিতে, মানে যার দশ বিঘে জমি আছে, সে এক বিঘে জমি দিক—বিশ বিঘেতে দু বিঘে, এক শো বিঘেতে দশ বিঘে—আর যার যা ভিটে প'ড়ে আছে দিক; দশ বিঘের কম জমি যাদের—তাদের বাদ দিয়েছিলাম।

কিশোরবাবু হিসেব ক'রে গেলেন—মৌজা নবগ্রামে চাষের জমি আছে আড়াই হাজার বিঘা। অনাবাদী জমি ভিটে আর পুকুর পাঁচ শো

বিঘে বাদ দিয়ে দু হাজার বিঘে জমি থেকে অন্তত দেড় শো বিঘে জমি পাওয়া যেত। প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে দশ বিঘে হিসেবে জমি দিয়ে পনের ঘর উদ্বাস্তুকে বাস করানো যেত। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে এইভাবে পাঁচ ঘর দশ ঘর পনের ঘর বিশ ঘর উদ্বাস্তুকে বসবাস করিয়ে, কিশোরবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। পরিশেষে বললেন—এটা কি একটা সমস্যা গুণী, অন্তত এই দেশের পক্ষে? কিন্তু আমরা যে বেঁচে নেই—আত্মহত্যা ক'রে প্রেত-যোনিতে প্রেতের তাণ্ডব ক'রে বেড়াচ্ছি। আমরা আত্মাকে হত্যা করেছি। আমরাই গুলি ক'রে মেরেছি মহাত্মাকে—ভারতবর্ষের সনাতন আত্মাকে।

থামলেন কিশোরবাবু। দীর্ঘ বক্তৃতা ক'রে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ওদিকে গৌরীকান্তের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিলেন সকলে। গুণী ডাকলে—গৌরীদা! কোথায়? অতিথি এনেছি।

—গুণী! এস—এস ভাই। গৌরীকান্ত বাড়ীর ভিতর থেকেই আহ্বান জানালে।

বাড়ীর ফটকে ঢুকেই দেখা গেল, গৌরীকান্ত বাড়ীর সামনে খোলা জায়গায় একটি বাঁধানো চত্বরের উপর শতরঞ্চি বিছিয়ে ব'সে আছে। আরও একজন কেউ ব'সে আছে। লম্বা মানুষ—দেহের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে শরীর শীর্ণ—মাথায় লম্বা রুখু চুল—লোকটি পিছন ফিরে গৌরীকান্তের মুখোমুখি ব'সে ছিল। বাঁধানো চত্বরটার গায়ে একখানা বাইসিক্ল ঠেস দিয়ে খাড়া করা ছিল।

গৌরীকান্ত উঠে দাঁড়াল অভ্যর্থনা জানাতে। লোকটিও উঠে দাঁড়াল। ছোট একটি নমস্কার ক'রে বাইসিক্লখানি টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুরল।

কপিলদেব!

গুণী সবিস্ময়ে বললে—কপিলদেববাবু? আপনি কখন এলেন? কোথা থেকে এলেন?

হেসে মাথার রুখু চুলগুলি হাত দিয়ে ঠেলে কপিলদেব বললে—এঁর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলাম। আচ্ছা—

কপিলদেব আর কোন কথা না ব'লেই তার বাইসিক্লে চেপে চ'লে গেল। ওই একটিমাত্র 'আচ্ছা' শব্দে বক্তব্যের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তার একটি বিচিত্র চরিত্ররীতি ফুটে উঠল।

বারো

কপিলদেব পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, কিন্তু এ জেলার পুরনো রাজনৈতিক কর্মী। দশ-বারো বছর আগে, কি তারও বেশী আগে, এ জেলায় এসে নদীর ধারে খানিকটা জায়গা নিয়ে একটা ফার্ম খুলেছিল। নিতান্তই খোলস ছিল সেটা। এখন খোলসটা নেই। অনেক আগেই সে ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে। কপিলদেব এই জেলাতেই থেকে গেছে। যারা একেবারে এ দেশের সব কিছুকে মিথ্যা বিকৃত ব'লে বিশ্বাস করে, একেবারে অত্যাধুনিক পাশ্চাত্ত্য মতবাদকে কায় মন ও বাক্যে যারা গ্রহণ করেছে, সে তাদেরই একজন। গুণী কপিলদেবকে অনেক দিন থেকেই জানে। ইংরেজ আমলের শেষ পঞ্চাশ বৎসর গুণীদের বংশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধির সময়। রাজ-দরবারে বিভিন্ন দপ্তরের কর্তারা তাদের কাছে নানা কাজে সাহায্য নিয়েছেন এবং বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র হিসাবে দুর্ভাবনার এবং উৎকণ্ঠার খবরাখবর তাদের কাছে গোপনে ব্যক্ত ক'রে সান্ত্বনা লাভ করেছেন। সেই সূত্রে গুণী প্রথম কপিলদেবের নাম শুনেছিল। ক্রমে এখানে ওখানে সভা-সমিতিতে চাক্ষুষ চিনেছিল। ভোটের সময় স্বাভাবিকভাবে বিপক্ষ শিবিরের যোদ্ধা হিসাবে বাক্‌যুদ্ধও করেছিল। আবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যখন গুণী উদ্যোগী হয়ে সারা জেলায় রিলিফ সেণ্টার খুলে প্রাণপণ পরিশ্রমে মানুষদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল তখন কপিলদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ ক'রে গুণীর সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর কপিলদেব এ জেলায় দুটো কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা হ'ল কৃষকদের নিয়ে, অন্যটা হ'ল রিফিউজিদের নিয়ে।

আজ সকালেই সদর শহরে শান্তির এই তদন্তের কথা নিয়েই সে গুণীর সঙ্গে দেখা করেছিল। অথচ একবারও বলে নি যে, সেও নবগ্রামে আসবে। বেলা দশটার পর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেছে, জেলার অন্য একটি রেফিউজি কলোনির দাবী-দাওয়া নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা ক'রে এসেছে। ম্যাজিস্ট্রেটকেও কথায় কথায় শান্তির তদন্ত সম্পর্কেও বলেছে। তাঁকেও বলে নি যে, সে এখানে আসবে। এই কারণেই গুণী এবং ম্যাজিস্ট্রেট দুজনেই একটু বিস্মিত হলেন।

কিশোরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে লোকটির দিকে তাকালেন।—লোকটি? সেই? ডান হাতের তর্জনী তুলে বার দুই-তিন দুলিয়ে বললেন—কপিল-দেব না?

গুণী বললে—হ্যাঁ।

কিশোরবাবু মনে যা ভাবেন মুখে তাই বলেন—মন এবং মুখের মধ্যে কোন অর্গল নেই। মাঝখানে বিবেচনা নামক সেন্সারিং স্টেশন নেই। তাঁর কপালে সারি সারি রেখা দাঁড়িয়ে উঠল, বললেন—লোকটাকে আমি আদৌ পছন্দ করি না। প্রথম দিনই আমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে—ওই শান্তিদের এবং রেফিউজিদের প্রথম আসার দিন।

এই কপিলদেবই সেই লোক, যে গৌরীকান্তের খালি বাড়ীতে শান্তি আশ্রয় নিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করলে বাধা দিয়ে তাদের নিয়ে তুলেছিল গুণীদের খালি বাড়ীতে।

শান্তির বাবা সন্তোষবাবু বাড়ী যেটা করেছিলেন—ছোট একতলা দালান, খান তিনেক ঘর—সেটা করেছিলেন এখানকার শ্বশুর-বাড়ীর পাঁচিল-ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যেই। তাঁরাই জায়গাটুকু এমনি দিয়েছিলেন। আড়াই কাঠা জমি। কিন্তু তার দানপত্রের দলিলখানা আড়াই বিঘে কি আড়াই শো বিঘে জমির দানপত্রের চেয়ে পরিধিতে ছোট নয়। তারই কোথায় লেখা ছিল—আপনার জীবনকালের জন্য অর্থাৎ জীবনস্বত্বে ভোগদখলের জন্য দান করিলাম। সন্তোষবাবুর বৈষয়িক

বুদ্ধি আদৌ ছিল না ব'লেই যে তিনি অমন ভুল করেছিলেন তা নয়। ওসব তিনি আদৌ দেখেন নি একান্তভাবে বৈরাগ্যবশে। কি হবে তাঁর ঘরে? কে নেবে? মনে তখন তিনি গেরুয়া রঙের তুলি চালাচ্ছেন। রঙ ধ'রে আসছে। তবু ঘরখানা করেছিলেন এই ভেবে যে, মৃত্যু যদি দীর্ঘরোগসাপেক্ষ হয়? একটা আশ্রয়, যে আশ্রয় থেকে অনধিকারের ত্রুটিতে অবাঞ্ছনীয় অসহনীয় ব'লে জীবন্ত অবস্থায় কেউ টেনে বের ক'রে দিতে না পারে। আর একটা ভয় ছিল। এতকাল গৃহ-জামাতার সমাদরে প্রতিপালিত হয়ে সন্ন্যাস যদি সহ্য না হয়। নইলে তাঁর কল্পনাতেও তখন ছিল না যে, কোনদিন তিনি দেবকীর কাছে ফিরে যাবেন বা ফিরে পাবেন তাঁকে। এবং সন্ন্যাস নিয়ে বের হবার পরে তিনি অদৃষ্টের চক্রান্তে সন্তানের পিতা হবেন এও ভাবেন নি। পরে অর্থাৎ শান্তির জন্মের পরেও তিনি কোনদিন ভাবেন নি যে, বিক্রমপুরের নন্দলালের ভাগ্নী শান্তিকে কোনদিন মায়ের হাত ধ'রে নবগ্রামে সেই নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে তৈরী করানো, মাটি দিয়ে গাঁথা, আম-কাঠের দরজা সেই বাড়ীখানির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ভাবতে পারলে হয়তো কিছু করতেন। শ্যালক জীবিত থাকতে প্রার্থনা জানাতেন। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাচক্রে তাই হ'ল। শান্তি মায়ের হাত ধ'রে সঙ্গে দশটি পরিবার নিয়ে এল নবগ্রামে। দাঁড়াল কিশোরবাবুর দরজায়। সন্তোষবাবু দিনান্তে দশবার নাম করতেন কিশোরের।

কিশোরবাবু উদার আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের। তখন তিনি ওই স্বপ্ন দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা ভাগ ক'রে খাবে অন্ন। যার চারখানা ঘর আছে সে একখানা ঘর দেবে। যার দশ বিঘা জমি আছে সে এক বিঘা দেবে। তার উপর সন্তোষদার স্ত্রী, সন্তোষদার কন্যা। তাদের আত্মীয় জ্ঞাতি।

তাদের বিশ্রাম করিয়ে খাইয়ে দাইয়ে নিজে গেলেন সন্তোষবাবুর এখানকার শ্বশুর-বাড়ী। কিন্তু তাদের ফটক তালাবন্ধ ছিল। খবর তারা আগেই পেয়েছিল। কিশোরবাবু স্বভাব অনুযায়ী

আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করলেন। বাড়ীর পূর্বপুরুষদের চীৎকার ক'রে ডাকলেন ঊর্ধ্বমুখে। তাঁরা কেউ সাড়া দিলেন না। বাড়ীর ভিতর থেকে সন্তোষবাবুর এক শ্যালকপুত্র এসে দলিল খুলে ওই "জীবন-স্বত্বে ভোগ-দখলের নিমিত্ত" কথাটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ফিরে গিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। ফিরে এলেন কিশোরবাবু। সঙ্গে শান্তি, দেবকী দেবী এবং আরও দু-একজন। পথে গৌরীকান্তের বাড়ীর সামনে কিশোরবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

—এখানে তোমরা থাকতে পার। এ বাড়ীখানি প'ড়ে আছে। জান কার বাড়ী?

—কার?

কিশোরবাবু গৌরীকান্তের নাম করলেন—লেখক গৌরীকান্ত।

—লেখক গৌরীকান্ত! তাঁর বাড়ী এখানে? গৌরীদার বাড়ী? তবে তো এই বাড়ীতেই থাকব। তা হ'লে—বাবা নাম করতেন রাধাকান্ত-বাবুর, তাঁর ছোট ছেলে গৌরীকান্তের—লেখক গৌরীদা সেই গৌরীকান্ত!

দেবকী দেবী চমকে উঠেছিলেন। মনে মনে তিনিও ভাবছিলেন সন্তোষবাবু কতবার নাম করতেন রাধাকান্তের; সেই রাধাকান্তবাবুর ছেলে গৌরীকান্ত! বলতেন—

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই বাইসিক্লের ঘণ্টা বাজিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল এই কপিলদেব। শান্তিরা এখানে আসছে বা এসেছে—এ খবর সে জানত। জেনে এখানে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে সে আসছে। গুপী-বাবুদের তিনমহলা বসত বাড়ীটা এখানে প'ড়ে আছে। তিনটে মহলে উপরে নীচে ছত্রিশখানা ঘর। উপরতলায় কিছু আসবাব আছে, নীচের তলাটা খালি। কপিলদেব ওই নীচের তলায় ওদের থাকবার অনুমতি নিয়ে আসছে সদর শহর থেকে।

কপিলদেবের নাম কিশোরবাবু শুনেছিলেন, কিন্তু চাক্ষুষ তাকে দেখেন নি।

শান্তি বলেছিল—তা হ'লে এক কাজ করুন, আমি আর মা আমরা গৌরীদার বাড়ীতে থাকি। আর সব ওই গুণীবাবুদের বাড়ীতে থাকুন। আপনি নিশ্চয় জানেন লেখক গৌরীকান্তের বাড়ী এটি ?

—জানি। গৌরীকান্তবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়ের কথাও জানি। কিন্তু আমার মতে সেটা ঠিক হবে না। আপনি জানতেন না কিন্তু আমি জানতাম যে, আপনি যে বাড়ী আপনার পৈতৃক ব'লে দাবী করতে আসছেন, সে বাড়ীতে ঢুকতে আপনি পাবেন না। সেই জন্যে আমি গুণীবাবুর কাছে গিয়ে এই ব্যবস্থা ক'রে আসছি। আবার যে পরিচয়ের দাবীতে আপনি গৌরীকান্তবাবুর বাড়ীতে থাকতে চাচ্ছেন, আমার ধারণা সে পরিচয় যেমনই গাঢ় হোক ও-দাবী আপনাদের থাকবে না। লেখককে লেখক হিসাবে দেখেছেন, কাজ কি তাঁর স্বার্থে হাত দিয়ে কুটিল স্বার্থপর চেহারা দেখে ?

কিশোরবাবু এতক্ষণ ধৈর্য ধ'রেই আগন্তুকের কথা শুনছিলেন। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই আগন্তুকটি যেই হোক তার বাক্যগুলির মধ্যে যে ব্যঙ্গ এবং বক্র তীক্ষ্ণতা রয়েছে তাতে তার যে রূপটি কিশোরবাবু দেখতে পেলেন কিশোরবাবুর কাছে তার বিশেষণ হ'ল উদ্ধত এবং দুঃশীল। কিশোরবাবু যে প্রকৃতির মানুষ, তাতে ও দুটোই বরদাস্ত করতে পারেন না। ক্ষেত্রবিশেষে স্পষ্ট প্রতিবাদ মাত্রাজ্ঞানের তারতম্যে উদ্ধত হয়ে ওঠে। সেটা অরুচিকর হ'লেও তিনি তা সহ্য করেন, কিন্তু শীলতার অভাবে দুঃশীলতা কিশোরবাবুর কাছে অসহ্য। কুল আর শীল—একটা দেয় বংশ-পরিচয়, অন্যটা দেয় ব্যক্তি-পরিচয়। যার শীলতার অভাব, দুঃশীলতায় যার ব্যক্তি-পরিচয়—তার পোষাক-পরিচ্ছদ আকৃতি-উপাধি যে মহার্ঘ্য পরিচয়ই জাহির করুক না কেন, আসলে সে মনোহর আচ্ছাদনে বিষাক্ত বস্তু। রঙিন রাংতায় মুখমোড়া বিলিতী ছাপা লেবেল আঁটা কড়া মদ।

গম্ভীরভাবে তিনি শান্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন—শান্তি। ইনি ?

—আপনি চেনেন না ? উনি তো প্রায় বারো বছর আপনাদের জেলাতে আছেন। আমার মামার শিষ্য। ওঁর নাম কপিলদেব সিংহ।

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরবাবু বলেছিলেন কপিলদেবকে—নমস্কার আপনার নাম শুনেছি, চোখে দেখি নি। আমার নাম—

—আপনাকে আমি জানি, চিনিও। আপনি কিশোরবাবু। নমস্কার। এ গ্রামে আমি অনেকবার এসেছি। আপনাকে দেখেছি দূর থেকে। আলাপ হয় নি। প্রয়োজনও পড়ে নি, পড়লে নিজেই আলাপ করতাম।

—তার জন্যে ক্ষতি হয় নি আপনার। আমারও না। আজও আলাপ না হ'লেই ভাল হ'ত। এতকাল যা শুনেছি আপনার সম্পর্কে, তাতে একটা শ্রদ্ধা ছিল আপনার উপর। আজ শ্রদ্ধাটা চ'লে গেল কিছু মনে করবেন না।

কপিলদেব হেসে উঠেছিল। সে হাসিতে কৌতুক এবং অবজ্ঞা দুইই ছিল।

কিশোরবাবু সোজা প্রশ্ন করেছিলেন—গৌরীকান্ত সম্পর্কে যে মন্তব্যটা আপনি করলেন—অন্তত শেষ মন্তব্যটা, সেটা অত্যন্ত অসত্য, মিথ্যা। মিথ্যা-অপবাদ যে দেয় সে যেমনি বাক্‌পটু হোক আর বিজ্ঞাপন-মারা মানুষ হোক, তাকে শ্রদ্ধা করা যায় না।

তবু কপিলদেব হাসিটি ছাড়ে নি। সে মুচকি মুচকি হাসছিল। তেমনি হেসেই বললে—আপনার সঙ্গে আমার মতের অনেক প্রভেদ আছে কিশোরবাবু। আপনার কালে আমার কালেও অনেক বছরের ফের। এ নিয়ে একদিন আলোচনা বলুন, ঝগড়া বলুন অবসরমত করব। আজ পথে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করব না। আজ বরং এঁদের ঠিকানায় তুলে দিয়ে আসি। আমি গুণীবাবুদের কর্মচারীকে চিঠি দিয়ে এসেছি। তিনি ঘরদোর খুলে এঁদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

শান্তির দিকে তাকিয়ে বলেছিল—চলুন, চলুন। কথাটা অনুরোধ-ব্যঞ্জক নয়, সরাসরি আদেশ। একবার 'চলুন' বলায় সে ব্যঞ্জনায় যদি বা ঈষৎ অস্পষ্টতা থাকত, দুবার 'চলুন' বলায় তা আর রইল না।

শান্তিও সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—চলুন। আগে সম্মতি দিয়ে তারপর

কিশোরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সেই ভাল মামা। ওখানেই যাই। সকলে একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই থাকি এখন। আলাদা থাকাটা কেমন দেখাবে। কপিলদেববাবু এমনভাবে বন্দোবস্ত ক'রে এসেছেন। কিন্তু কপিলদেববাবু, গৌরীদা সম্পর্কে যে মত আপনি প্রকাশ করলেন তার সঙ্গে একমত নই আমি।

হেসে সে কথাটা শেষ করেছিল এবং কপিলদেবকেই অনুসরণ ক'রে সে গুণীদের ওখানেই উঠেছিল।

শান্তি যদি সন্তোষবাবুর কন্যা না হ'ত, তবে ওই দিন থেকেই কিশোরবাবু শান্তির সঙ্গে আর সংস্রব রাখতেন না। আর দেবকী দেবী যদি সঙ্গে না থাকতেন!

দেবকী দেবী বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে ছিল, একান্ত ইচ্ছে ছিল। কিন্তু—

—কিন্তু কি? প্রশ্ন করেছিলেন কিশোরবাবু।—ও ছোকরাই বা কে?

—নন্দর হাতে কত ছেলে তৈরী হয়েছে সে তো অনুমান করতে পার। তেমনি একটি ছেলে। আজকাল আর একরকম হয়েছে। এ যেন সে ছেলেই নয়। মিষ্টি কথা, মিষ্টি স্বভাব। ও একবার নন্দর সঙ্গে ভাদ্র মাসে কোথায় যাচ্ছিল। রাত্রিকাল। আমাদের দেশ। তোমাদের দেশ থেকেও আমাদের দেশে সাপ বেশী। মাঠের পথ। কপিল ক্রমাগত নন্দর আগে যাচ্ছিল। নন্দ যত বলে—পিছনে থাক্ তুই, ও বলে—না। নন্দ শেষটা বিরক্ত হয়ে বলেছিল—কথা শোন্, পিছনে আয়। ও নন্দর হাত চেপে ধ'রে মিনতি ক'রে বলেছিল—না। মাঠে বড় সাপ। যে আগে যাবে, তাকেই তো প্রথমে সামনে পড়তে হবে, কামড়ালে তো তাকেই কামড়াবে। আপনি পিছনে আসুন। আমি মরলে কতটুকু ক্ষতি! সেই অবধি আমরা ওকে একটু বেশী স্নেহ করি। শান্তিও শ্রদ্ধা করে। তারপর ষড়যন্ত্র মামলায় ওর পাঁচ বছর জেল হ'ল, এদিকে নন্দ মারা গেল। ও খালাস পেয়ে দেশে ফেরে নি। এ দেশেই আছে। আমাদের আসবার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

শান্তিও এই ঘটনার কথাটিই উল্লেখ করেছিল। আর বলেছিল—গৌরীদাকে উনি প্রত্যক্ষভাবে চেনেন না। তাই বোধ হয় ও-কথা বলেছেন। আমাকে বললেনও সেই কথা। বেশীদিন জেল খেটে আর দেশের এই দুরবস্থা দেখে ওঁর আগেকার বিশ্বাস-শ্রদ্ধার ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আমাকে বললেন—মানুষের লেখক-সত্তা আর মানুষ হিসেবে সত্তা ঠিক এক নয়। আমি গুণীবাবুকেই যে বিশ্বাস করি তা মনে করবেন না। গৌরীকান্তবাবুর চেয়ে বেশী অবিশ্বাস করি। কিন্তু গুণীবাবুরা এ অঞ্চলে দাতা হৃদয়বান পরোপকারী। বিপন্নের বন্ধু হিসেবেই খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠাবান। প্রতিষ্ঠা বস্তুটার নেশা ধনসম্পদের চেয়েও বেশী। গত দু শো বছর ধ'রে বাংলার বাবু-কালচারের এই হ'ল আসল চেহারা। এখানেই নাকি আমার সৎমায়ের ভায়েরা জগদ্ধাত্রী-পূজায় ব্রাহ্মণভোজনে চারটে রসগোল্লা দিতেন, এক শো টাকার বাজী পোড়াতেন, গুণীবাবুর ঠাকুরদা রাসযাত্রার ব্রাহ্মণভোজনে প্রথম ছটা, তারপর আটটা, তারপর ঢালাও রসগোল্লার ব্যবস্থা করেছিলেন, বাজী পোড়াতেন দু শো টাকার, আড়াই শো টাকার। এটাকে যদি দেবভক্তি ব'লে কেউ চালায় তো সে চোখ থাকতে অন্ধ। তাকে বোঝানো মিথ্যে। গুণীবাবু আজও সেই কালচার আঁকড়ে রয়েছেন। তাই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। ভুল আমার হয় নি। আশ্রয় তিনি দিয়েছেন। গৌরীকান্তবাবুকে আমি জানি না। কিন্তু তিনি দানধ্যানের প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়িয়ে নেই। কাজেই অনিশ্চিত।

কথার শেষে হেসে শান্তি বলেছিল—এ সব হিসেবে কারুর মতের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক, কপিলদেববাবুর নির্ণয় একেবারে অ্যানাটমি ক্লাসের ডিসেকশন-পদ্ধতির নির্ণয়। হৃদয় ওখানে নিতান্তই হার্ট নামক প্রত্যঙ্গটি।

তারপরও আবার বলেছিল। কিশোরবাবু এ-কথার কোন উত্তর দেন নি। সেই কারণেই বলেছিল বোধ হয়; বলেছিল—গৌরীকান্তবাবুর সঙ্গে 'অ্যাংগ্‌ল্‌ অব ভিসন' নিয়ে ওঁর মতভেদ আছে। কিন্তু লেখক হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। গভীর শ্রদ্ধা। তা ছাড়া—

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—তা ছাড়া উনি এ জেলার রেফিউজিদের নিয়ে একটা সমিতি করছেন। তার বাইরে থাকাটা কারুর উচিত হবে না।

কিশোরবাবু এরও কোন জবাব দেন নি। কি জবাব দেবেন? তিনি সবিস্ময়ে সেদিন কপিলদেবের ওই কালচারের ব্যাখ্যার কথাই ভাবছিলেন। আশ্চর্য সত্য কথা এবং স্পষ্ট কথা। তবুও ব্যাখ্যাটা ঠিক শাস্তির উপমার মত। হার্ট নামক প্রত্যঙ্গটিকে চিরে হৃদয়ের স্বরূপ নির্ণয় করার মত অসম্পূর্ণ। আকাশের নীল রঙ ছোঁয়া যায় না ব'লেই আকাশের নীল রঙ মিথ্যে নয়। যারা দেবপূজায় সমারোহের প্রতিযোগিতার চারটে, ছটা, আটটা, আটটা থেকে ঢালাও মিষ্টি দিয়েছে তাদের দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে অকারণে কাঁদতে দেখে নি কপিলদেব। তারা সমারোহের দিন বাদ দিয়ে যখন নিরালায় ব'সে নিত্য পূজা করেছে তখন কপিলদেব উঁকি মেরে দেখা প্রয়োজন মনে করে নি।

এ পর্যন্তও কিশোরবাবু আজকার মত উগ্রভাবে তিক্ত হয়ে ওঠেন নি কপিলদেবের উপর। মনে মনে আক্ষেপ হয়েছিল—এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এমন কর্মক্ষমতা, এমন বিশ্লেষণ-শক্তি, কেমন ক'রে বিকৃত হয় গেল? কিসের অভাবে বিশ্বাস হারাল? সময়ে সময়ে মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। হঠাৎ একদিন, বোধ করি, মাস দুয়েক পর, কপিলদেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। কপিলদেব বাইসিক্ল চেপে তার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

—কেমন আছেন? নমস্কার!

—আসুন। কি খবর?

হাত দিয়ে মাথার রুখু এলোমেলো চুলগুলি পিছনে ঠেলে বিন্যস্ত ক'রে নিয়ে হেসে কপিলদেব বলেছিল—কাজ দুটো।

—চা খাবেন?

—কেন খাব না? সঙ্গে চারটি মুড়ি হ'লে আরও খুসী হব।

মুড়ির সঙ্গে চা খেতে খেতে কপিলদেব বলেছিল—প্রথম কাজ

আপনাদের এখানকার গার্লস স্কুলের। ওটা ইউ-পি আছে, শুনছি গুণীবাবু আপনি ওটাকে এম-ই করছেন।

—হ্যাঁ, কথা হচ্ছে। শান্তি এখানে এসে বাড়ীতেই একটা ক্লাস খুলেছিল। আমাকে বললে—মামা, সরকারী সাহায্য—গভর্নমেণ্ট ডোল নিয়ে তারাই বাঁচুক, যাদের উপায়ান্তর নেই। আমি কিছু করতে চাই। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। আমাকে কিছু ছাত্রী যোগাড় ক'রে দিন না, আমি তাদের পড়াই। ইউ-পি পর্যন্ত পড়ার পর এখানে আর মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা নেই। গুণীও ঠিক এই সময় এম-ই স্কুলের কথা লিখলে। এখন তাই ব্যবস্থা করছি। শান্তির মত মেয়ে যখন পেয়েছি তখন গ'ড়ে তুলতে বেশী বেগ পেতে হবে না। শান্তিরও একটা অবলম্বন হবে।

—শান্তি দেবী ছাড়াও তো অন্তত আর একজন মিস্ট্রেস চাই।

—আমার একজন ক্যাণ্ডিডেট আছে। চমৎকার মেয়ে।

—কিন্তু আমাদের এখানে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত আছেন। শিক্ষক হিসেবে ভাল শিক্ষক। শান্তিকে এবং তাঁকে একরকম ঠিক ক'রেই রেখেছি আমরা।

—যে মেয়েকে আমি দেব, সে মেয়েটি পণ্ডিতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবে। এ যুগে পুরনো আমলের লোক, যাদের আইডিয়া পুরনো—ওল্ড স্কুল অব থট—রাখা তো ঠিক হবে না। তা ছাড়া মেয়ে-স্কুলে পুরুষ—হোন না তিনি বৃদ্ধ, রাখা তো ঠিক হবে না কিশোরবাবু। আপত্তি করবে লোকে।

—আমার নবগ্রামকে আমি জানি কপিলদেববাবু।

—বোধ হয় না। আপনি জোর ক'রে আপনার মতটা এখানকার লোকের উপর চাপিয়ে দেন। একদিন আপনি এখানে সমস্ত ভাল কাজের নেতা ছিলেন, প্রোগ্রেসিভ ছিলেন, তাই আজও লোকে প্রকাশ্যে আপত্তি করে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রতিবাদই পোষণ করে। এবার সেটা তারা চেঁচিয়ে বলবে।

কিশোরবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে উত্তাপ পাছে কথার মধ্যে বেরিয়ে পড়ে, তাই তিনি চুপ ক'রে রইলেন; বার দুয়েক গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিলেন। নিজেকে সংযত ক'রে বললেন—সে যখন ব্যক্ত করবে তারা, তখন ভেবে দেখব। ও-কথা এইখানে থাক্ কপিলদেববাবু। আর কিছু খাবেন? চা আর এক কাপ? মুড়ি আর এক মুঠো?

—না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কপিলদেব নামিয়ে রেখে বললে—না। পাঞ্জাবির নীচের অংশটা টেনে মুখ মুছে নিয়ে হেসে বললে—এইবার দ্বিতীয় কথা তা হ'লে।

—বলুন।

—এইটাতে একটা সই ক'রে দিন।

—কি এটা?

—কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান আর ভারতবর্ষে মিলিটারি মুভমেণ্ট সুরু হয়েছে। আমরা বলতে চাই—আমরা শান্তি চাই। ভারতবর্ষ পাকিস্তান মিলিটারি মুভমেণ্ট বন্ধ করুক।

কিশোরবাবু কাগজটা পড়ছিলেন, তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি বলিলেন—এ সব কি লিখেছেন? "দু পক্ষই যুদ্ধোদ্যমে মাতিয়া উঠিয়াছেন।" তার মানে?

—দু পক্ষের বর্ডারেই সৈন্য চলাচল সুরু করেছে।

—কিন্তু পাকিস্তান যুদ্ধ করবে ব'লে শাসিয়ে সৈন্য চলাচল আগে সুরু করেছে। কাজেই ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায় নি। ভারতবর্ষের ধর্ম হ'ল অহিংসা।

হেসে উঠেছিল কপিলদেব।

কিশোরবাবু রাগে ফেটে পড়েছিলেন।

কপিলদেব বলেছিল—ওসব মিথ্যে কিশোরবাবু। ধর্ম, অহিংসা—ওসব দিয়ে রাষ্ট্র চলে না।

—আজ চলে না। কিন্তু পৃথিবীকে সেইখানে যেতে হবে।

—আত্মপ্রতারণা আর কতকাল করবেন কিশোরবাবু? মিথ্যে ছলনায় কতকাল ভুলে থাকবেন?

—মিথ্যে ছলনা? কি?

—ধর্ম, অহিংসা।

—ধর্ম মিথ্যে? আপনি মানেন না?

—না। যা মিথ্যে তা মানব কেন?

—তবে? তবে আপনি নিজের দেশ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এখানে কেন?

—তার মানে?

পূর্ববঙ্গ থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা হিন্দু। তারা যদি মুসলমান হয়ে যেত তা হ'লে পালিয়ে আসবার কোন প্রয়োজন হ'ত না। আপনি যখন ধর্ম মানেন না, তখন ধর্ম নিয়ে ঝগড়াও ছিল না, ধর্ম যাবার ভয়ও ছিল না। স্বচ্ছন্দেই তখন কপিলদেবের বদলে ইসমাইল কি রহমান কি খোদাবক্স হয়ে গিয়ে থাকতে পারতেন।

হেসে কপিলদেব বলেছিল—আপনি ভুলে গেছেন কিশোরবাবু যে, এটা হিন্দুর দেশ নয়—হিন্দুরও না, মুসলমানেরও না। ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার স্টেট। ধর্মনিরপেক্ষ মানেই কোন ধর্ম নেই। এখানে আমাদের দাবীই বেশী, যারা আদৌ ধর্ম মানে না।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরবাবু। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কপিলদেব আরও একটু হেসেছিল। বলেছিল—যেমনি ধর্মাচরণ ক'রে থাকুন কিশোরবাবু, একালে চোখ দিয়ে আগুন বের হয় না। এমন কোপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি করবেন?

কিশোর এবার বলেছিলেন—অন্য কিছু না পারি, এ অঞ্চল থেকে আপনাকে দূর করব আমি। ধর্ম যারা মানে না বলে, তাদের একদল আছে যারা নীতি মানে। তারা ধর্ম মুখে না মেনেও ধার্মিক। আপনি সত্যকারের অধার্মিক। আপনি ধর্ম মানেন না, অথচ এখানে যত সব সার্বজনীন পূজো হয় তার মুড়ুলি ক'রে বেড়ান। আপনি মিথ্যাচারী।

তারপরই চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন—ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষকেই আপনি অন্যায় ভাবে যুদ্ধবাজ ব'লে দোষারোপ করছেন। আপনি দেশদ্রোহী।

—এ অধিকার আমার গণতন্ত্রসম্মত কিশোরবাবু। আমার তাই ধারণা।

—সে ধারণা আমার নয়। আমি আপনার ওই অন্যায় মিথ্যাকে সমর্থন ক'রে সই করব না। কাউকে করতে দেব না। আপনি যান।

কপিলদেবেরদৃষ্টি এবার ক্ষণেকের জন্য রূঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষণ-পরেই সে রূঢ়তাকে সম্বরণ ক'রে আবারও হেসে বলেছিল—একদিন এর জন্য আপনাকে আমার কাছে মাফ চাইতে হবে কিশোরবাবু।

ব'লেই সে বাইসিক্‌ল টেনে তাতে চ'ড়ে চ'লে গিয়েছিল।

সেই অবধি কিশোরবাবু কপিলদেবের উপর অত্যন্ত তিক্ত মনো-ভাব পোষণ করেন। এবং সেই দিনের পর আজও পর্যন্ত কপিলদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। আজ দেখা হ'ল। কপিলদেব তাঁর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু বক্রহাসি ঠোঁটে ফুটিয়েই চ'লে গেল। কিশোর-বাবু বললেন—লোকটিকে আমি একবারেই পছন্দ করি নে, বরদাস্ত করিতে পারি নে। অতি কুটিল মানুষ।

গৌরীকান্তের দিকে তাকিয়ে যেন কৈফিয়ৎ চেয়েই প্রশ্ন করলেন—কেন এসেছিল? কিছু সই করাবার জন্যে? মতলব ভিন্ন তো ও কোথায় হাঁটে না।

গৌরীকান্ত বললে—ও মানুষ বিচিত্র মানুষ কিশোরবাবু। বসুন, বলব সব।

* * *

প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সেরে গৌরীকান্ত জিজ্ঞাসা করলে—শান্তির সম্পর্কে একটা তদন্ত ছিল শুনেছিলাম। সেটা শেষ হয়ে গেল?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—হ্যাঁ। নাম মাত্র তদন্ত। ব্যাপারটা একেবারে নিন্দুক লোকের রটনা। এর পিছনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কলহ আছে ব'লে

লিখে দিলাম। শান্তি দেবী যা বললেন, তা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি।

গৌরীকান্ত বললে—হ্যাঁ। সন্তানটি কপিলদেবের। কপিলদেব সেই কথাই ব'লে গেলেন আমাকে। একটি বিবাহিতা মেয়ে ওঁকে ভালবেসেছিলেন। শান্তির সহকর্মিণী। নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। স্বামী সেখানকার রাজনৈতিক কর্মী। স্বামী পাকিস্তানেই ছিলেন। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রিফিউজি ক্যাম্পে কপিলদেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। কপিলদেব মেয়েটিকে কর্মী হিসেবে তৈরী করেছিলেন। অদ্ভুত নিষ্ঠা আর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করত মেয়েটি। সব কিন্তু কপিলদেবের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির জন্য। প্রাণ ঢেলে সে কপিলদেবকে চেয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত কপিলদেব নিজেকে না দিয়ে পারেন নি। কপিলদেব তো বিবাহের কোন সংস্কারকেই মানেন না। দেহগত সম্পর্কের শুচিতা নিয়েও কোনও সংস্কার নেই ওঁর। সে দিক দিয়ে অতি উগ্র বামপন্থী উনি। এই উগ্রতার জন্যে কোন রাজনৈতিক দলেই ওঁর স্থান হয় নি। সুতরাং—

সুতরাং সেই মোহান্ধ হতভাগিনীর সঙ্গে অবাধ ভোগের সম্পর্ক পাতিয়েছিল ওই পাষণ্ড!—প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন কিশোরবাবু।

গৌরীকান্ত হাসলে, বললে—বিচার করা একটু কঠিন কিশোরবাবু। কপিলদেব বললেন, তার সে দুর্দমনীয় বাসনা পূর্ণ না হ'লে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত; পাগল হয়ে যেত। আমার নিজের অপরাধ হ'ত। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েটি পড়েছে অসুখে। সেই অবস্থায় শান্তি তার সেবা করেছিল। কপিলদেব বললেন, আমি ছেলেটিকে অনাথ আশ্রম ধরনের আশ্রমে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে টাকার প্রয়োজন—সে টাকা ছিল না। একবার ভেবেছিলাম, ভাসিয়ে দিই নদীর জলে।

—নদীর জলে!

গুণী, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ তিন জনে শিউরে উঠলেন।

—হ্যাঁ। কপিলদেব বললেন, মহাভারতে কুন্তী কানীন ছেলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই ছেলে কর্ণ। মহাভারতের আগেও এই ভাবে অনেক ছেলেকে লোকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আজও দেয়। পথে ফেলে দিয়ে যায়। গৃহস্থের বাড়ীর দরজায় শুইয়ে দিয়ে যায়। কাব্য ক'রে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করার নজীরও আছে। সুতরাং নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে কপিলদেবের আপত্তি ছিল না। বললেন, যে দেশে আঁতুড় ঘরে কু-সংস্কারের বিষে বিষিয়ে হাজারে হাজারে ছেলে পেঁচোয় পেয়ে মরে, রিফিউজি ক্যাম্পে হিন্দুমতে সতীসাধ্বীর সন্তান রৌদ্রে শীতে দুধের অভাবে মরে, সে দেশে এই একটা শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিলে জাতীয় জীবনের আর কি লোকসান হ'ত?

সোজা হয়ে বসল গৌরীকান্ত, বললে, সশব্দে হেসে কপিলদেব বললে, তবে হ্যাঁ, যদি বলেন ছেলেটা তো কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন হতে পারত, তবে আমাকে চুপ করতে হবে।

গুণী বললেন—শান্তি দেবীর কল্যাণ হোক। আমি কিন্তু এতটা অনুমান করিতে পারি নি। তবে অদ্ভুত দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে, এটা আমি বুঝেছিলাম। এবং সেই কথাই আপনাকে আমি বলেছিলাম মিস্টার গুপ্ত। আপনি কি মনে করেছিলেন জানি না, তবু যা হোক আমার কথাটা মেনে নিয়েছিলেন। নইলে কত বড় অবিচার হ'ত, ভেবে দেখুন।

কিশোরবাবু উত্তেজনায় প্রায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করছিলেন এবং আপন মনে বিড় বিড় ক'রে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করছিলেন।

গৌরীকান্ত বললে—শান্তিই বাধা দিয়েছিল। সেই নিজে থেকে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল। তার কারণও একটু—

গৌরীকান্ত চুপ ক'রে গেল। ঠিক এই মুহূর্তেই প্রবেশ করল বিজয়। পিছনে তার দুই পুত্র—একটির বয়স বারো, একটির দশ। দুজনের হাতে দুটি কাঁসার থালার উপর চায়ের কাপ এবং মিষ্টান্নের রেকাবী। গৌরী-

কান্তের এখানে অতিথি এসেছে সংবাদ পেয়ে বিজয়ের মা অতিথি-সৎকারের আয়োজন ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিজয় ছেলেদের ধমকে বললে—আস্তে নামাবি। চা যদি পড়ে তো বুঝবি!

গুণী তাড়াতাড়ি উঠে ছেলে দুটির হাত থেকে থালা নামিয়ে নিয়ে বললে—বিজয়, তুমি এ যুগের দুর্বাসা!

বিজয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল, কথাটা তার নিজের অগোচরেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভদ্র সে নয়, কিন্তু এমন সমাবেশে ভদ্র হবার চেষ্টা সে করে। সে হেসে বললে—যা বল তোমরা গুণীদা আমি তাই। কিন্তু সাধে দুর্বাসা হই না, বুঝেছ। বাড়ীতে চায়ের একটা কাপ ভেঙেছে; ওই বড়টা—ওই বুড়োটা ভাঙলে। তার ওপর কে বললে—সেই কপিল-দেবটাও নাকি এসে জুটেছে। বুঝেছ আমার মাথায় রক্ত চ'ড়েই ছিল। সেটা গেল কখন? ওঃ, ওটাকে আমি একদিন শিক্ষা দিতাম, কিন্তু কি বলব, শান্তিদির ওখানে আসে—

—কে? ঘুরে দাঁড়ালেন কিশোরবাবু।—কপিলদেব?

—হ্যাঁ। শান্তিদির মামার ফলোয়ার ছিল তো কপিলদেব। সেই জন্যে আসে।

গুণী বললে—তা ছাড়া জেলার রিফিউজিদের নিয়ে কাজ করে। শান্তি দেবীর বাসার ব্যাপার নিয়ে—

অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিলেন কিশোরবাবু—কই, আমি তো কোন দিন শুনি নি? আমি তো জানি না। শান্তিকে আমি বারণ ক'রে দেব। না—না—না। এ চলবে না। ওই লোক—এ জানার পর—না—না—না। এ হতে পারে না!

বিজয়ের দিকে ঘুরে বললেন কিশোরবাবু—কই, তুমিও তো আমাকে এ কথা ঘুণাক্ষরে বল নি?

—তার আর কি বলব? ওঁদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়—প্রথম দিন থেকে আসছে। রিফিউজিদের নিয়ে কাজকর্ম করে।

ডিস্ট্রিক্ট রিফিউজি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। তবে হ্যাঁ, শান্তি-দিদিদের সঙ্গে আলাপ না থাকলে আপত্তি করতাম। হয়তো—

বিজয় হঠাৎ এমন রেগে উঠতে পারে যা সচরাচর কেউ পারে না—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাঝখানে চীৎকার ক'রে ওঠে। কোন ভূমিকা নেই, কোন প্রস্তুতি নেই; খাদের সা হঠাৎ নি পার হয়ে সপ্তমের সা হয়ে যায়। মাঝখানের ছ'টা ঘাট ছুঁয়েও যায় না, লাফ মেরে উঠে যায়। গুণী মধ্যে মধ্যে বলে—চণ্ডমুণ্ডবধের সময় জ্যোতির্ময়ী কৌষিকী দেবীর ক্রোধ হয়েছিল। সেই ক্রোধে তাঁর দেহ থেকে চামুণ্ডা বেরিয়ে এসেছিলেন। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। কিন্তু তাতে একটু সময় লেগেছিল। ক্রোধ হতেই দেবী চণ্ডিকার গৌরবর্ণ ললাটখানি কালো হয়ে উঠেছিল। বিজয়ের তারও দরকার হয় না, ওর চামুণ্ডা সর্ট-হওয়া লাইনের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ ফট ক'রে ফেটে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মত—মুহূর্তে মা প্রকট হন হাঁ ক'রে। বিজয় আজও ঠিক তেমনি ভাবেই অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—হয়তো হয়েই যেত এক হাত। ওর ঠ্যাঙ খোঁড়া ক'রে দিতাম। লোকটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু বিষ ঢেলে বেড়াচ্ছে—শুধু বিষ।

গৌরীকান্ত হেসে বললে—বিষ মানে যদি রূঢ় কথা হয় বিজয়, তবে তুইও কিন্তু মধুবর্ষণ ক'রে বেড়াস নে। আর কপিলদেবের ঠ্যাঙ খোঁড়া ক'রে দিলেও তো ওর জিভ ক্ষান্ত হবে না। বিষ তো ওর জিভে!

—ওর আপাদমস্তক বিষ গৌরীদা, নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত। ওই বিষের জন্য ওর কোথাও জায়গা হ'ল না। কোন পার্টি ওকে নেবে না। ওর জিভের বিষ থাকুক, ঠ্যাঙ খোঁড়া ক'রে দিলেই বাইসিক্‌ল্‌ ঠেঙিয়ে বিষ ছড়িয়ে বেড়ানো বন্ধ হবে।

—কিন্তু গোঁয়াতুর্মি ক'রে ও-কাজ করতে যেন তুই একা এগিয়ে যাস নে। কপিলদেবের জিভে শুধু বিষই নেই। ওর হাতে বাঘের থাবার জোর আছে, বোধ করি বাঘনখের মত কিছু ওর পকেটেই থাকে। আঙুলে প'রে নিতে দেরী লাগে না।

হেসে উঠল বিজয়। বললে—গৌরীদা, তুমি ভীতু হয়ে গেছ। এ কালের কলকাতায় পটকা আর অ্যাসিড বাল্‌ব্ ছোঁড়া ব্যাপার দেখে তোমার মাথা ঘুরে গেছে। কপিলদেব কোনকালে বোমা পিস্তল নেড়েছিল কি ছুঁড়েছিল, আর লম্বা লম্বা ইংরিজী কথা কয় ব'লে তুমি মনে কর ও বাঘ! হায় হায় গৌরীদা!

শিউরে উঠল গৌরীকান্ত। বললে—না, না, তুই জানিস নে বিজয়, তুই জানিস নে।

—জানি, খুব জানি। জিজ্ঞাসা কর গুণীদাকে। ও দেখে নি, তবে জানে। ওর সঙ্গে এক হাত লড়েছি আমি।

গুণী হেসে বললে—তা লড়েছে বিজয় এবং জিতেছে, গৌরীদা।

বিস্মিত হ'ল গৌরীকান্ত। কপিলদেবের সঙ্গে লড়াই ক'রে জিতেছে বিজয়! দৈহিক শক্তি বিজয়ের এককালে ছিল। মারমুখী হবার মত উদ্ধত হতে পর্যাপ্তই ছিল তার শক্তি। তার অবশেষও হয়তো আছে। কিন্তু কপিলদেব! সে যে একাধারে বাঘ এবং সাপের মারণশক্তির অধিকারী। সে হারল এবং হারের গ্লানি সহ্য করল? আজও সহ্য ক'রে রয়েছে?

কিশোরবাবু স্তব্ধ হয়ে ব'সে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনিও ওই কপিলদেবের কথা ভাবছিলেন। শান্তি তাঁকে একদিনও বলে নি। কখনও তার নাম উচ্চারণ করে না। অথচ সে আসে! গুণীর শেষ কথায় তিনি সকলের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন—সে দিন হাটে কপিলদেব এমন হার হারত যে, সে কখনও আর মাথা তুলতে পারত না। বিজয় ওকে সে হারের লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওটা নিয়ে আর তোমরা অহঙ্কার ক'রো না। হাটের হাটুরেরাই সেদিন কপিলদেবকে অস্পৃশ্যের মত দূর দূর ক'রে চড়িয়ে দিত। হঠাৎ বাহাদুরি ক'রে বিজয় গিয়ে ওর হাত টেনে ধ'রে বীররসের নাটক ক'রে তুললে।

তাঁর মুখে চোখে কণ্ঠস্বরে তিক্ততা যেন উপচে পড়ছিল।

গুণী বললে—আমার কিন্তু তা মনে হয় না কিশোরবাবু। এটা আপনার ভুল হচ্ছে।

—ভুল? কার? আমার? আমার নয়, ভুল তোমার। মানুষকে তোমরা ছোট ভাব ব'লেই এ কথা বলছ। তোমাদের হাটে তোলা বন্ধ করলাম তোমরা অবশ্যি আপত্তি কর নি, মেনে নিলে। হাটুরেরা খুসী হ'ল। তারা সেদিন নিজেরাই চণ্ডীতলায় যে যেমন পারে তরকারী দিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের হাটে যারা আসে তাদের অনেকে ওখানে আজও তরকারী দিয়ে যায়। সেখানে কিসের বাধ্যবাধকতা? কিসের দাবী? আর এ হাট ঠাকুরের হাট। চণ্ডীতলার দেবোত্তর জায়গায় হাট বসে; যত কালের হাট, দেবস্থানের তোলা ততকালের। খাজনা সেইজন্যে তোমাদের হাটে যেখানে চার আনা, ওখানে চার পয়সা। লোকে সেটা জানে বোঝে। কপিলদেব সেইখানে গেল তোলা বন্ধ করতে। মানুষ শুনতে চায় নি, শুনত না, নিজেরাই ওকে বলে দিত—'তুমি চ'লে যাও। তোমার কথা আমি জানি না। শুনব না। তুমি আর কখনো এসো না আমার কাছে।' সংসারে যারা রক্ষাকর্তা সাজে তাদের জন্যেই মানুষের ঠাকুর লজ্জায় আত্মপ্রকাশ করেন না।

মাস কয়েক আগের কথা। এ অঞ্চলে হাটে তোলা বন্ধের আন্দোলন হয়েছিল একটা। হাটের মালিকেরা খাজনা ছাড়া তরকারী নিতেন। সেটা উঠিয়ে দিতে কিশোরবাবুই অগ্রণী হয়েছিলেন। এখানকার কয়েকটা হাটেই তোলা উঠে গেছে। মালিকেরা এ নিয়ে ঝগড়া করেন নি; দাবীটা উঠতেই প্রায় মেনে নিয়েছিলেন সসম্মানে। নবগ্রামে গুনীদের হাট বড় হাট এ অঞ্চলে, হাটের আয় অনেক। গুনীরাই প্রথম তোলা নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে ঠাকুরের হাট প্রাচীন কালের হাট। হাটের মালিকানি নবগ্রামের দেবস্থল অট্টহাস তীর্থের মা চণ্ডিকা। ওখানে হাটের খাজনা এবং তোলা বহু-কালের। ওই তোলার তরকারী থেকেই অট্টহাসের তরকারীর খরচ চ'লে আসছে। এই কারণে ওই হাট নিয়ে কেউ কোন কথা তোলে নি। হাটুরেদের মনেও ওঠে নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন কপিলদেব ওই হাটে গিয়ে মুখে একটা টিনের চোঙা লাগিয়ে ঘোষণা ক'রে দিলে—সকল হাটে

মালিকের তোলা বন্ধ হয়েছে, এ হাটেও তোলা বন্ধ কর। তোলা আজ থেকে আর দেওয়া হবে না।

ঘোষণা ক'রেই সে ক্ষান্ত হ'ল না। তোলা যে তুলছিল তার হাতের ঝুড়িটা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে।

বিজয় বললে—একদিন আমি ওর হাত চেপে ধরেছিলাম। তোমার কপিলদেব টেনে হাতের মুঠোও ছাড়াতে পারে নি। কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে সত্যি কথা পাবে না, সত্যি কথা বলা ওর ধর্মে নিষেধ। জিজ্ঞাসা ক'রো মেঘনা মাঝি সর্দারের বড় বেটা সোনা মাঝিকে। সে সাক্ষী আছে। দিন কতক ওদের পাড়ায় গিয়ে আড্ডা গেড়েছিল। ভাব জমিয়েছিল সোনার ছোট ভাই রূপোর সঙ্গে। সে ছোঁড়াটা ভারী ত্যাঁদড়। ওদের বাড়ীতে ওদের হাঁড়িতেই খেত। একটা খাটিয়া নিয়ে গাছতলায় প'ড়ে থাকত। আর মুড়ুলি করত। একদিন মেঘু সর্দার ডগরু এরা চ'টে ওকে বলেছিল—তু বাবু এখানে ক্যানে? তু আপনার ঘর যাস্ না ক্যানে? কি কাজ তোর এখানে? এই লাগিয়ে দিলে জন দশেক ছোঁড়া জুটিয়ে বুড়োদের সঙ্গে ঝগড়া। সোনা এল আমার কাছে।—বাবু, তু একবার চল্। আমি গেলাম। তখন ছোঁড়ারা খুব তড়পাচ্ছে। বাপেরা হাজার হ'লেও বাপ। গর্জালেও বর্ষাতে মায়া লাগে ব'লেই তখনও কিছু হয় নি। আমি যেতেই ছোঁড়ারা দ'মে গেল। ওদের মধ্যে কাজ তো আমি অনেক দিন থেকেই করছি। আমি গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কেন? ওর এক রকম সাধা হাসি আছে—তুমি দেখেছ কি না জানি না, গুণীদারা দেখেছে—জানে। রাগলেও সেই হাসি, হাসলেও সেই হাসি—দুনিয়া-তুচ্ছ-করা হাসি। সেই হাসি হেসে বললে—আমার ইচ্ছে। আমি বললাম—কিন্তু এদের ইচ্ছে নয়। ও বললে—ওদের ইচ্ছের ওপর আমার ইচ্ছে নির্ভর করে না। আমি সোজা খপ ক'রে ওঁর হাত চেপে ধরলাম। ধ'রেই মোচড় দিয়ে বললাম—তবে এও আমার ইচ্ছে। ঝটকা মেরে হাত ছাড়াতে গেল, পারলে না। বাঁ হাতে ছোরা টানতে গেল,

আমি সে হাতখানাও ধরলাম। শেষে বললে—ছেড়ে দিন, আমি চ'লে যাচ্ছি। আমি বললাম—সে তো যাবেন, কিন্তু এসেছিলেন কেন? তারপর সে অনেক কথা। মোট কথা ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে বাইসিক্‌ল্ ঠেঙিয়ে পালাল। ওর গায়ের জোর আমার জানা আছে। সাহসও জানা আছে।

গৌরীকান্ত বললে—তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। সাহস ভাল, দুঃসাহস ভাল নয়।

বিজয় হাত জোড় ক'রে বললে—সাবধান থাকা, বুদ্ধি-বিবেচনা ক'রে চলা ও দুটো আমার দ্বারা হয় নি, হয় না—হবেও না গৌরীদা। আমি ওকে ভাল ক'রে জানি। ও আমার সঙ্গে আজকাল খুব ভদ্র ব্যবহার ক'রেই চলে। আর শান্তিদি, দেবকী পিসীমা বলেন—ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁরা ভালবাসেন, তাই বলতে পারি না কিছু। নইলে—

নইলে সে কি করত, সে কথা প্রথমেই ব'লে রেখেছে ব'লেই বোধ করি তার পুনরুক্তি করলে না বিজয়।

গুণী বললে—সাঁওতালদের দিয়ে পুলিশে একটা খবর দাও নি? দেওয়া উচিত ছিল। আর—আমাকেও একটা কথা জানানো উচিত ছিল বিজয়।

—কিশোরবাবুকে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন—কি হবে? সাঁওতালেরা যখন ঠিক আছে তখন পুলিশ-টুলিশ কেন?

গৌরীকান্ত হাসলে; অত্যন্ত মৃদু আন্দোলনে ঘাড় নেড়ে বললে—না। কপিলদেব যদি তোর কাছে হেরেও থাকে তবে সে তোর সঙ্গে কৌতুক করেছে।

—কৌতুক করেছে? তা হ'লে তুমিও কৌতুক, আমিও কৌতুক, সবই কৌতুক। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা কর গুণীদাকে। অম্বুবাচীর সে লড়াইয়ে গুণীদাও আম্পায়ার ছিল।

—অম্বুবাচীর লড়াই? কৌতুক এবং কৌতূহলের আর সীমা রইল না গৌরীকান্তের। অম্বুবাচীতে কপিলদেব তোর সঙ্গে লড়াই করেছিল? ল্যাঙট প'রে গায়ে মাটি মেখে—পাঁয়তারা ক'ষে?

গুণী হেসে এবার বললে—লড়াইটা সুরু হয়েছিল দুই গুরুর সাকরেদে সাকরেদে। বিজয়ের সাকরেদ আর কপিলদেবের সাকরেদ। তারপর গুরুতে গুরুতে কিংবা ওস্তাদে ওস্তাদে, যা বল। প্রথমে লাফিয়ে পড়ল কপিলদেব। তারপর বিজয়। দোষটা কপিলদেবের চ্যালা ইয়াসিনের। ইয়াসিন পড়েছিল নীচে। বিজয়ের চ্যালা দমু গোপ উপর থেকে ইয়াসিনকে চিৎ করবার চেষ্টা করছিল। ইয়াসিন দমুর বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে পেয়ে একটা আঙুল মুচড়ে ভেঙে দেবার চেষ্টা করছিল। আমরা দেখেছিলাম, ছাড়িয়ে দিতে উঠছি—এমন সময় দমু ডান হাতে ওর ঘাড় ধ'রে মুখটা মাটিতে দিলে রগড়ে। অমনি কপিলদেব লাফিয়ে পড়ল আখড়ায়, দমুর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে মারলে পিঠে এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়চন্দ্র হুঙ্কার দিয়ে দিলে লম্ফ, এবং খপ ক'রে চেপে ধরলে কপিলদেবের হাত। সে হাত কপিলদেব ছাড়াতে পারে নি গৌরীদা। আমি সাক্ষী—চেষ্টা সে কম করে নি। শেষে নিজেই বললে—ছাড়ুন; আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি। ইয়াসিনই প্রথম অন্যায় ক'রে দমুর আঙুল ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছিল—অন্যায় ইয়াসিনেরই আগে। আপনার গায়ের জোরও বেশী। আমি সেই দিকেও হেরেছি।

—এখনও অম্বুবাচীর লড়াই হয়? এ কালে ও-প্রথা এখনও বেঁচে আছে?

—বেড়েছে গৌরীদা। তবে রকমটা পাল্টেছে। আগে ছিল এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ের লড়াই। তারপর হয়েছিল দিন কতক হিন্দু-মুসলমানে। সে তুমি দেখে গেছ। এখন লড়াইটা বিজয়ের দলে আর কপিলদেবের দলে। অবশ্য এই সুরু, এখনও খুব জ'মে ওঠে নি।

ম্যাজিস্ট্রেট গুপ্ত সাহেব ব'সে ব'সে উপভোগ করছিলেন কথা-বার্তাগুলি। গৌরীকান্ত লেখক হিসেবে নাম করেছে, প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এ জেলায় এসে শুনেছেন—মানুষটি এককালে এখানকার ধূলামাটি ও সকল মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যেন মিশিয়ে ছিল, জড়িয়ে ছিল

অচ্ছেদ্য বন্ধনে, এবং এখান থেকে আঘাত পেয়েই সে দূরে চ'লে গিয়েছিল। বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে সেই মানুষ ফিরেছে। যতই রূপান্তর তার হয়ে থাক্ এখানে তার স্বরূপটি অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রকাশ পাবে। এবার তিনি বললেন—কথাটা গুণীবাবু চমৎকার বলেছেন। জ'মে ওঠে নি কিন্তু সুরু হয়েছে। উদ্যোগপর্ব তাতে সন্দেহ নেই। চারিদিকে আয়োজন চলছে। সে সব খবর আমরা পাচ্ছি।

চায়ের কাপগুলি তুলে নিতে নিতে বিজয় বললে—অথচ আপনারা তার কোন প্রতিকার করছেন না। কপিলদেবের মত লোকের বিরুদ্ধেও আপনারা কিছু করবেন না? ওর বুলি হ'ল—রক্ত চাই! রক্তে মাটি ভেজাতে হবে। সেদিন ওর চ্যালা ডাঙাপাড়ার সেই যাত্রার দলের ছোঁড়াটা সেই অমর আমাকে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে। আর দেরী নাই। লিস্টির মধ্যে তোমার নাম তুলেছি আমি। মানে একটা লিস্ট করেছে ওরা। কপিলদেবের একটা লিস্ট আছে, তাতে এলোমেলো সুরু হ'লে কার কার মাথা নেবে তার নাম লিখে রেখেছে। সে সব বড় বড় লীডারদের নাম। সব পলিটিকাল পার্টিরই লোকের নাম আছে তাতে। অমরের নিজের লিস্ট আছে, তাতে সে আমাদের নাম লিখে রেখেছে।

গৌরীকান্ত লক্ষ্য করছিল চায়ের খালি কাপগুলি। কোনটিই একেবারে খালি নয়। দু-চার চুমুকের বেশী কেউ খান নি। নিজেও খায় নি। শুধু কিশোরবাবুর চায়ের কাপটা খালি। বিজয়ের বাড়ীর চা এক অপূর্ব বস্তু। ওর পূর্ণ রসাস্বাদন করা সাধনা-সাপেক্ষ। আদা এবং তেজপাতা সেদ্ধ করা কেটলীটিতে এমনভাবে আদা-তেজপাতার কাই খাঁজে খাঁজে জ'মে গেছে যে, গঙ্গাজল গরম করলেও তাতে তার সুবাস উঠে থাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চায়ের পাতার ফ্লেভারও সে সুবাসে ঢাকা প'ড়ে যায়। তার সঙ্গে আছে গুড়ের গন্ধ। বাড়ীর লোকের জন্য বিজয়ের ব্যবস্থা গুড়ের। এবং সে ওই এক ও অদ্বিতীয় কেটলীর মধ্যেই গুলে দেওয়া হয়। বিজয়ের বাড়ীর সন্ধ্যের চায়ের জল গরম হতে সুরু

হয় বেলা আড়াইটে থেকে। দুপুরের উনোন নিকিয়ে পড়ন্ত আঁচের উপরেই অল্প চারটি কুঁচো কয়লা দিয়ে কেটলীটা চাপিয়ে দিয়ে মেয়েরা শুয়ে পড়ে। চারটে পাঁচটা ছ'টা যখন বিজয় হাঁকে—চা, তখনই কেটলী নামিয়ে চায়ের পাতা ছেড়ে আবার উনোনে চাপিয়ে দিয়ে মিনিট দু-তিন সেদ্ধ ক'রে নিয়ে তাতেই দুধ, গুড় বা চিনি দিয়ে ঘেঁটে উপাদেয় ও অদ্বিতীয় চা তৈরী হয়।

বিজয়ের ছেলে দুটি চায়ের কাপগুলি তুলে নিয়ে চ'লে গেল। গৌরীকান্ত এই অবসরটিরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে বললে—বিজয়, মশলা পান চাই—নিয়ে আয়।

বিজয় হাঁকতে যাচ্ছিল ছেলেদের—এ—ই—

—না হেঁকে তুই নিজে যা না বাপু! যা।

গৌরীকান্তের আজ্ঞায় বিরূপাক্ষ বিজয় নিতান্তই রামানুজ লক্ষ্মণ। ওখানে সত্যই স্বতন্ত্র মানুষ সে। বিজয় দ্বিরুক্তি না ক'রে চ'লে গেল। গৌরীকান্ত বললে—চা খেতে সত্যিই আপনাদের অসুবিধে হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি। বিজয়ের বাড়ীর চা! হাসলে একটু সে।

গুণী বললে—তুমি এর উপর পানের হুকুম করলে। তুমি নিজে পান খাও না এবং এও জান না যে বিজয়ের বাড়ীতে পান খাওয়া বিলাসিতা। অতিথিদের জন্তে অবশ্যি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাতে একশোটার মধ্যে নিরেনব্বইটা পানে অতিথিদের গালে জিভে চুন লাগে। পানটা আনতে তুমি বারণ কর। বিপদ আমার গৌরীদা। গুপ্ত সাহেব পান কদাচিৎ খান, কিশোরবাবু খান না। ইন্‌স্পেক্টারবাবু খান কি না-খান বিজয় জানে না। আমি পান খাই, আমাকে বিজয় অব্যাহতি দেবে না। সমাদর ক'রে একটা গোটা ছোট এলাচ ছাড়িয়ে তাকে আরও দুষ্পাচ্য ক'রে তুলবে। আমি গরম মশলা খাই নে। হজম করতে পারি নে।

কিশোরবাবু পায়চারি করতে করতে এক সময় বসেছিলেন, এবং নীরবে ধ্যানমগ্নের মত কিছু ভাবছিলেন। এত কথাবার্তার কোন

আকর্ষণই তাঁর কাছে ছিল না। তিনি ভাবছিলেন, শান্তি তাঁকে এক দিনও বলে নি—কপিলদেব আসে তাদের ওখানে। কেন? একটা সূত্র তিনি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন। কাটা ঘুড়ির ভেসে যাওয়া সুতোর মত সেটাকে যেন তিনি ধ'রেও ধরতে পারছেন না। মনে মনে অভিমানের মত একটা আবেগও যেন মনে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে। শান্তি তাঁর কাছেও গোপন করেছে? অথবা কপিলদেবের আসাটা তাদের কাছে এতই তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন যে তার উল্লেখ করতে স্বাভাবিক ভাবেই সে ভুলে গেছে। কিন্তু লোকটা যে আদৌ তুচ্ছ নয়। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি ব'লে উঠলেন—বুদ্ধির ধর্মই হ'ল চাতুরী! জীবন যেখানে জৈব-বোধ ছাড়া আর কোন বোধের সন্ধান পায় না—বুদ্ধি সেখানে নিছক ভেল্কী। মানুষকে ঠকানোই তার কাজ। মনোরম মিথ্যা ব'লে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই তার। কথা বলতে বলতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন কিশোরবাবু। কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায়, উচ্চতায়, কথা বলার দ্রুত ভঙ্গিতে ক্ষোভ যেন ক্ষরিত হয়ে পড়ছিল। সে ক্ষোভ শ্রোতাদের অন্তরও স্পর্শ করছিল।

কিন্তু কথাটা সঠিক কি কেউই তা বুঝতে পারে নি। গুণীর মনে হ'ল, হয়তো পানের কথাটা নিয়েই কিশোরবাবু এত কথা বললেন। গৌরীকান্তও তাই ভেবেছিল।

তাদের সে ভাবনাকে আরও জটিল ক'রে তুলে কিশোরবাবু বললেন—কৌটিল্য আমাদের দেশে প্রথম মিথ্যাকে নীতি ব'লে প্রশ্রয় দিয়ে গেল। মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ—এ তো মিথ্যে বলতে বলা। মনের কথা প্রকাশ ক'রো না!

উঠে পড়লেন তিনি। বললেন—আমি চললাম গৌরীকান্ত। মিস্টার গুপ্ত, আমি উঠলাম। নমস্কার!

গৌরীকান্ত বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলে—কিশোরবাবু!

—উঁহু। কথাটা আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব। এবং এ হ'লে আমি আর সংস্রব রাখব না। কখনও না। এখুনি যাচ্ছি আমি।

সন্তোষদার মেয়ে, আমাকে মামা বলে, আমি নিজের ভাগ্নীর মতই স্নেহ করি।—বলতে বলতে চ'লে গেলেন তিনি।

গৌরীকান্ত যেন কেমন হয়ে গেল। বিব্রত হয়ে পড়েছে যেন, কিন্তু কি করবে সে ঠাওরাতে পারছে না। গুণী কিন্তু হাসছিল। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—চন্দর মাস্টার আজ ক্ষেপেছে। আজ শান্তি দেবীর কপালে কিঞ্চিৎ অশান্তি ভোগ আছে। সংশয় যখন জেগেছে তখন এখুনিই তার নিরসন নই। 'চা—' বলতে বলতে গৌরীকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। সবিস্ময়ে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রেই প্রশ্ন করলে—কি হ'ল গৌরীদা ?

—ওঁকে ডাকতে পার ?

—কিশোরবাবুকে? তুমিই বল না, ওঁকে ডেকে ফেরানো যায়? কিন্তু তোমার এত উৎকণ্ঠা কিসের ? পরক্ষণেই সে একটু হাসলে। যেন উৎকণ্ঠার কারণ মনে প'ড়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে—তুমি ভেবো না, আমি যাচ্ছি। মিস্টার গুপ্ত, আমি আসছি। তুমি ততক্ষণ ওঁকে একটু ভাল চা খাওয়াও।

গুপ্ত সাহেব বললেন—না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আর চা ভাল লাগবে না গ্রীষ্মকালে। আপনি বসুন।

—তা হয় না। পাঁচ মিনিট। আমি শুধু চাকরটাকে ব'লে দি। উনোন ধরানোই আছে। গৌরীকান্ত চ'লে গেল বাড়ীর ভিতর।

বাইরের দিকের ঘরখানার ভিতর দিয়েই বাড়ীর ভিতর-মহলে প্রবেশের পথ। বাইরের ঘরের লাগাও একটা রান্না-ঘর পার হয়ে ঢুকতে হবে। বাইরের ঘরে ঢুকেই সে বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

শান্তি দাঁড়িয়ে আছে। নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গৌরীকান্তের লেখার টেবিলটার এক কোণে হাতের ভর দিয়েই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি যেন ভাবছে! অথবা স্তব্ধ হয়ে বাইরের কথাবার্তা শুনছে সে।

—শান্তি? নিজের অজ্ঞাতসারেই চাপা গলাতে প্রশ্ন করলে গৌরীকান্ত।

শান্তি মুখ তুললে। ম্লান হেসে বললে—একটু আগেই আমি এসেছি। যাবার সময় দেখে গেলাম, কপিলবাবু আপনার এখানে ব'সে আছেন। ভেবেছিলাম, আমাদের ওখানে যাবেন। তিনি কি চ'লে গেছেন ?

—তিনি তো অনেকক্ষণ চ'লে গেছেন শান্তি।

—কিন্তু—। উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে শান্তির কপালে দুটি রেখা জেগে উঠল।

—তিনি চ'লে গেছেন। তবে তুমি এসে ভালই করেছ। কিশোরবাবু তোমার ওখানে গেছেন—

মৃদুস্বরে শান্তি বললে—জানি। এ ঘর থেকেই সব শুনেছি। ঠিক তার মিনিট খানেক আগেই এখানে এসেছি।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গৌরীকান্ত বললে—কপিলদেববাবু আমাকে সব ব'লে গেছেন।

স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে গৌরীকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শান্তি। কোন কথা বললে না ; আরও শুনবার জন্যই প্রতীক্ষা ক'রে রইল বোধ হয়। গৌরীকান্ত বললে—তুমি আমাকে বলেছিলে, তুমি যাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা সন্তানটি তাঁরই। তিনি স্বীকার ক'রে গেলেন ?

শান্তি বললে—হ্যাঁ।

গৌরীকান্ত বললে—তুমি ভেবো না, তুমি আমাকে যে কথা বলেছ তা আমি প্রকাশ করতে যাব না।

শান্তি হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠল, বললে—আমি যাই গৌরীদা।

—একটা কথা ব'লে যাও। তোমার মা কি কপিলদেবের সঙ্গে তোমার অন্তরের সম্পর্কের কথা জানেন ?

—না।

•

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে শান্তির মা দেবকী দেবীর দশ বৎসর বয়সে উড়ে কুলীনের সন্তান মামার বাড়ীর পোষ্য সন্তোষ মুখুজ্জের সঙ্গে বিয়ে

হয়েছিল। ষাট বছরের পিছনের দিকে বছর গুনে কৌলীন্য প্রথার গোড়ায় যেতে গেলে প্রায় আট শো বছর। আট শো বছরের বেড়া ডিঙিয়ে ওই দেবকী দেবীর মেয়ে শান্তি বাইরে এসে দাঁড়াল। শুধু তাই বা কেন! আট শো বছরেরও অনেক বেশী কালের পুরনো সংস্কার এবং ধারণাকে সে লঙ্ঘন করেছে। শান্তি যখন কপিলদেবকে বিয়ে করবে তখন অনাবশ্যক ভাবে আগুনে ঘি ঢালবে না, আগুনকে দেবতা জেনে সাক্ষী রেখে কতকগুলো শপথবাক্য উচ্চারণ ক'রে সেগুলিকে অলঙ্ঘনীয় মনে করবে না। বিয়ে করবে সে রেজেস্ট্রি ক'রে। প্রয়োজন হ'লে পরস্পরের বাঁধন খুলে বা কেটে আবার কারুর সঙ্গে নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সুতরাং শুধু কৌলীন্য প্রথার গণ্ডীই নয়, তার চেয়ে অনেক পুরানো প্রথাকে লঙ্ঘন করেছে সে। অবশ্য যুগে যুগে দু'চারজন বা দশজন এমন ধারার প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন ক'রে এসেছে, সমাজের নির্যাতন উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এর তফাত আছে। এ দু-চারজন বা দশজনের কথা নয়। একালে এটা ষাট-সত্তর জনের কথা। শান্তি সেই ষাট-সত্তর জনের প্রথম কুড়ি-পঁচিশের একজন।

একটা কালকে অতিক্রম ক'রে নতুন কালে যে প্রথম দল প্রবেশ করছে, শান্তি সেই দলের একজন। শান্তির জয় হোক। সকল বাধা এবং দুঃখকে সে যেন অনায়াসে হাসিমুখে অতিক্রম করতে পারে। শুধু পশুদেহ অতিক্রম ক'রে নরনারীর দেহ-মিলনের মধ্যে প্রকৃতির প্রেম-স্বপ্নের স্বর্ণ-সূত্রটি যেন হারিয়ে না ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে চার পায়ের স্থানে দু পায়ে ঘৃণাভরে দ'লে দিয়ে চ'লে না যায়।

তেরো

পরের দিনের কথা।

সকালবেলা গৌরীকান্ত চাদরের খুঁটে অনেকগুলি চাঁপাফুল নিয়ে একাই চলেছিল। বেশ সন্তর্পণে সতর্ক হয়ে নিরালা পথ ধ'রে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছিল। চলেছিল নাগের মাঠের দিকে। নাগের

মাঠের কাহিনীর সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি আর নাই। তার জায়গায় আছে আর একটি অশ্বত্থ গাছ। ওখানে এখনও এখানকার মানুষ প্রণাম করে। আগেকার কালে, গৌরীকান্তের আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স কাল পর্যন্ত এখানে লোকে মানত ক'রে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জেলে দিয়ে যেত। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ফৌজদারী মামলা হ'লে আসামী পক্ষ এখানে প্রদীপ দিত। লোকের বিশ্বাস ছিল, প্রদীপ দেওয়ার কল্যাণে ফৌজদারী মামলায় আসামী খালাস পায়। বোধ করি হিংসার পাপ ও তার দণ্ড থেকে মুক্ত হয়—এই বিশ্বাস থেকেই এর প্রচলন হয়েছিল। সংসারে অশান্তি হ'লেও মানুষ এখানে প্রদীপ দিত। আর একসঙ্গে পাঁচটি প্রদীপ জেলে দিয়ে যেত যদি কেউ আত্মহত্যা করতে চেষ্টা ক'রে বেঁচে উঠত সে। তাতে নাকি আত্মহত্যার চেষ্টার পাপ থেকে মুক্তি পেত এবং ভবিষ্যতে ও-প্রবৃত্তির পুনরাক্রমণ থেকে রক্ষা পেত। গৌরীকান্তের সম্পর্কিত বউদিদি নিরু বার বার তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার খড়-কাটা বঁটি দিয়ে গলাটা আধখানা কেটে ফেলেছিল; তাতে বেঁচে কিছুদিন পর বিষ খেয়ে মরবার চেষ্টা করেছিল, তাতেও মরণ তার হয় নি। তৃতীয়বারে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরতে চেয়েছিল। স্বামীর অবহেলা এবং ননদের গঞ্জনায় নিরু বউদিদি মরবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। নিরু বউদিদির শাশুড়ী বড় ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি এখানে প্রদীপ জেলে দিয়ে যেতেন। নিরু বউদিদিকে কোনদিন রাজী করাতে পারেন নি। এই বিশ্বাসেই, অর্থাৎ এখানে প্রদীপ দিলে আত্মহত্যার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পায় মানুষ—এই বিশ্বাসেই এখানে পাঁচটি প্রদীপ সাজিয়ে দিয়ে সেই প্রদীপের শিখায় কাপড়ে আগুন ধরিয়ে এই গাছতলাতেই পুড়ে মরেছিল বিশ্বেশ্বরী। আজকের দিনেই পুড়ে মরেছিল। তাই আজ সকালেই গৌরীকান্ত চাঁপাফুল কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গাছতলায় চাঁপাফুল সাজিয়ে দেবে। ওখান থেকে যাবে অজয়ের ঘাট পর্যন্ত, ঘাটের পাশেই শ্মশান, সেখানে বিশ্বেশ্বরীর চিতার উপরেও ফুল সাজিয়ে দিয়ে আসবে।

বিশ্বেশ্বরী গৌরীকান্তের জীবনের একটি অধ্যায়। সেই তার লেখক-জীবনের প্রথম ভক্ত পাঠিকা। তার প্রথম যৌবনে প্রথম নারী সে, স্বয়ম্বরার মত তাকে বরণ করতে এসেছিল। বিশ্বেশ্বরীই চাঁপাফুল ভালবাসত। সে-ই তাকে চাঁপাফুল উপহার দিত। সে-ই তাকে চাঁপাফুল ভালবাসতে শিখিয়ে গেছে। বিশ্বেশ্বরী তাকে ভালবেসেছিল। যে দিন সে পুড়ে মরেছিল, সেই দিন সে মুখ ফুটে একবার মাত্র কথাটি তাকে ব'লেই চ'লে গিয়েছিল। সে স্তম্ভিত হয়ে শুনেছিল। ভীত হয়েছিল। বুকের ভিতর ঝড় উঠেছিল। মনে হয়েছিল, জীবনের সে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু সে পুরস্কার ধরবার মত সাহস ও শক্তি তার সেদিন ছিল না। বিশ্বেশ্বরী তাকে ভালবেসেছিল এইটেই সেদিন তার কপালে হয়ে উঠেছিল দুরপনেয় কলঙ্ক। সেই কলঙ্কের তিলক কপালে নিয়ে সে নবগ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। বিশ্বেশ্বরীকে সে ভালবাসে নি। যে দিন সে গ্রাম ছেড়ে যায় সে দিন বিশ্বেশ্বরী সম্পর্কে তার ক্ষুব্ধ অন্তরে এতটুকু—একবিন্দু কোমল স্পর্শ অনুভব করে নি সে। গত কাল সন্ধ্যা থেকে শান্তির কথা ভাবতে গিয়ে মনে প'ড়ে গেছে বিশ্বেশ্বরীর কথা।

বিশ্বেশ্বরী ছিল কুলীনের মেয়ে, কুলীনের ঘরের ভাগ্নী। তার বাপ ছিলেন উড়ে কুলীন; মা থাকতেন ভাইয়ের বাড়ীতে। বিশ্বেশ্বরীরও বিয়ে হয়েছিল উড়ে কুলীনের সঙ্গে। বিশ্বেশ্বরীর বাপ শান্তির বাবা সন্তোষবাবুর জ্ঞাতি ভাই। বিশ্বেশ্বরী সে হিসেবে শান্তির জ্ঞাতি দিদি। শান্তির কথা মনে করতে গিয়ে এই কারণেই তার মনে প'ড়ে গেল বিশ্বেশ্বরীর কথা। শান্তির বিরুদ্ধে যে অপবাদের নালিশ ক'রে দরখাস্ত হয়েছিল, যার তদন্ত করতে গিয়ে শান্তির কথায় বিশ্বাস ক'রে নালিশ-পত্রখানা অনায়াসে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হ'ল, তার তুলনায় বিশ্বেশ্বরীর বিরুদ্ধে নালিশ ছিল নিতান্তই নগণ্য। অথচ সেই নালিশের কতবড় গুরুত্বই না সেদিন চাপিয়েছিল মানুষ! সেদিন তদন্তের প্রথম পর্বেই বিশ্বেশ্বরী হয় ঘৃণায়, নয় ভয়ে উন্মাদিনীর মত আত্মহত্যা ক'রে বসেছিল। সেদিন

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে ব'লে কারুর মনে হয় নি। আজ শান্তি যে গৌরব ও মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু ক'রে এসে এই নালিশের জবাব দিয়ে গেল এবং সে জবাব যে সম্ভ্রমের সঙ্গে গুণী ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করলেন, সে দেখে তার বার বার মনে পড়েছে বিশ্বেশ্বরীকে। ওই গুণীদেরই জ্ঞাতির ভাগ্নী ছিল বিশ্বেশ্বরী। গুণীর খুড়ো-জ্যাঠারাই সেদিন বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। গৌরীকান্তের বিচার করতে চেয়েছিলেন। গৌরীকান্ত দেশ ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল।

গুণীদেরই জ্ঞাতি, সম্পর্কে গুণীর জ্যাঠামশাই ছিলেন—বাগাল বাঁড়ুজ্জে। নবগ্রামে নাম ছিল—গোঁয়ার-বাগাল। নবগ্রামে তখন বাগাল অনেকগুলি। তাই প্রতিটি বাগালের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষত্ব বা বিশেষ চিহ্নটি প্রত্যেকের নামের আগে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার ক'রে এক মুহূর্তে বিশেষ বাগালকে চিনিয়ে দেওয়া হ'ত। মোটা বাগাল, কটা বাগাল, কাঠি বাগাল, দেঁতো বাগাল—চেহারার বিশেষত্ব থেকে চিহ্নিত হয়েছিল। চিঁহি বাগাল ছিল গলার সরু আওয়াজের চিহ্নে চিহ্নিত। কুনো বাগালও ছিল—সে ছিল মুখচোরা, ঘর থেকে বের হ'ত না। এ বাগাল ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী মানুষ, রাগতে দেরী হ'ত না এবং রাগলেই সে রাগ প্রচণ্ডতার চরম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছুত। তাই তিনি ছিলেন গোঁয়ার বাগাল।

গোঁয়ার বাগালের ভাগ্নী বিশ্বেশ্বরী। গৌরীকান্তের সমবয়সী, বছর খানেকের বড়। শ্যামবর্ণ মেয়েটির সম্পদ ছিল মাথায় একরাশি কোঁকড়ানো চুল, দুটি আয়ত চোখ, আর সর্বোপরি একটি মহিমা। অসাধারণ মর্যাদাময়ী মেয়ে ছিল বিশ্বেশ্বরী। লোকে বলত—এ মেয়ের পদক্ষেপে মা পৃথিবী চমকে চমকে ওঠেন।

সে কথা কইত কম। কিন্তু যে কথাটি কইত সে কথার যেমন ছিল ব্যঞ্জনা, তেমনি ছিল বক্রতা, তেমনি ছিল রচনা, তেমনি ছিল সন্ধান। কিন্তু তবু বিশ্বেশ্বরী ছিল সকল জনের প্রীতিভাজন। তার একটি

অপরূপ শ্যামলাবণ্য ছিল। মাধবীলতার মত লাবণ্যময়ী ছিল সে। তেমনি ছিল সে দৃঢ়। সহকারের অভাবে ধূলায় সে লুটিয়ে পড়ে নি।

এই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল অসুস্থদেহ এক পেশাদার কুলীনের সঙ্গে। বয়সের পার্থক্য—সেই অনেক। তখনকার দিনে কুলীনেরাও ভোল পাল্‌টেছিল। সন্তোষ শর্মাদের দিবস তখন গত। পেশাদার কুলীনেরাও তখন ইংরিজীনবীশ সুপাত্রদের মত কামিজ মিহি ধুতি পামশু পরতে সুরু করেছে, কিছু কিছু ইংরিজী শিখেছে। কেউ রাখত বাবরী চুল, কেউ চুল ছাঁটিত ইংরেজী ফ্যাশনে। বিশ্বেশ্বরীর স্বামীও ছিল এমনি একটি মানুষ। বিয়ের পর পাঁচ বছরের মধ্যে সে এসেছিল মাত্র একবার।

নবগ্রামে তখন বিকৃত রসের যুগ।

উনিশ শো পাঁচ সালে একটা ভাব-বন্যা এসেছিল। দেশপ্রেমের ভাব-বন্যা। আপনিই এসেছিল। তারই সঙ্গে কিশোরবাবু এনেছিলেন বিবেকানন্দের ভাববাদ। কিন্তু নবগ্রামে সে স্থায়ী হয় নি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ধনসম্পদ ছিল নবগ্রামে। প্রতিষ্ঠা-লালসা ছিল উদগ্র। প্রাচীন কালের আত্মিক সাধনার ধারা তখন বিকৃত। তার উপর এল ইংরিজী ফ্যাশনের—অনুকরণের মোহ। হাস্যে লাস্যে বিলাসে বিভ্রমে সে এক বিচিত্র যুগ। নূতন বর্ষার পর জ'মে-থাকা জলে মাটি প'চে, আবর্জনা প'চে যেমন অবস্থার সৃষ্টি হয়—তেমনি একটা অবস্থা। দেশপ্রেম, সাহিত্য-প্রীতি তখন নাট্য-সমাজের অভিনয়ের আসরে রুদ্রের মারুতিরূপে আবির্ভাবের মত আবির্ভূত হয়েছে। গ্রামের যুবকদের অভিনয়-কুশলতার খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের স্বামীগৃহ-বঞ্চিতা তরুণী কুলীন-কন্যাগুলিকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার আর শেষ ছিল না। মেয়েগুলিরও যত ছিল এই অভিনয়-রস-রসিকদের প্রতি কৌতূহল, গোপন প্রশংসা-মুখরতা, তত ছিল ভয়-আশঙ্কা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরী ছিল ব্যতিক্রম। পথের উপর দৃষ্টি রেখে সে অসঙ্কোচে চ'লে যেত গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। গৌরীকান্ত সম্ভ্রম করত বিশ্বেশ্বরীকে। শ্রদ্ধা করত। মুখরা তীক্ষ্ণভাষিণী

ব'লে ভয়ও করত। সেই বিশ্বেশ্বরী হঠাৎ একদিন বিচিত্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই পদ্য তুমি নিজে লিখেছ গৌরীকান্ত? এত সুন্দর

পুলিস অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছিল গৌরীকান্তের কবিতার খাতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিক। তখন বাংলা দেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার সন্ধান পেয়ে ইংরেজ প্রচণ্ড আক্রোশে শেষ বিপ্লবীটিকে আবিষ্কার ক'রে দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর।

নবগ্রামে খানাতল্লাসী হ'ল কিশোরবাবুর ঘর, গৌরীকান্তের ঘর এবং দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা-সমিতির আপিস। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিশোরবাবু তখন বেলুড়মঠে দীক্ষা নিয়েছেন। তবুও মধ্যে মধ্যে পূর্ব-পরিচিত দু-চারজন বিপ্লববাদী তার কাছে অকস্মাৎ গোপনে আসা-যাওয়া করত। কিশোরবাবুর একান্ত মুগ্ধ শিষ্য ছিল গৌরীকান্ত। আপনার ঘরে বা এই নাগের মাঠের অশ্বত্থগাছের তলায় ব'সে কিশোরবাবু কাঁদতেন। আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতির গাঢ়তায় কাঁদতেন, দেশের জন্য কাঁদতেন, নবগ্রামের জন্য কাঁদতেন। গৌরীকান্ত চুপ ক'রে ব'সে থাকত। বিকেলবেলা এইখানে খবরের কাগজ পড়তেন কিশোরবাবু। এক-একদিন স্থিরদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ভাবতেন। অকস্মাৎ বলতেন—পরমা প্রকৃতির মধ্যে হিংসা নিজেকে কামড়াচ্ছে, ছিন্ন-ভিন্ন করছে, ক্লান্ত করছে, সে মরবে। এই যুদ্ধটা তারই একটা আক্ষেপ।

অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে তিনি প্রণাম করতেন বার বার। প্রণাম করতেন—নমঃ জ্ঞানমূর্তয়ে পরম শুচয়ে পরম শুদ্ধায় বোধিসত্ত্বায় পরম বুদ্ধায় নমঃ। নমঃ বোধিদ্রুমায় নমঃ।

গৌরীকান্তের কিন্তু তখন কিশোরবাবুর এই ধ্যানধারণা খুব ভাল লাগত না। তখন তাকে ওই সব ছদ্মবেশী আগন্তুকের ছোঁয়াচ লেগেছে। গোপনে ইয়োরোপীয় বিপ্লববাদের ইতিহাস পড়েছে। এই সময়েই সে গোপনে নাদিরশাহের দিল্লী অভিযানের কাহিনী অবলম্বন ক'রে একখানি

গাথাকাব্য রচনা করেছিল। তার নূতন মনে সঞ্চারিত নূতন বহ্নিশিখার উত্তাপ, তার জ্বালা, তার দীপ্তি নাদিরশাহের অত্যাচারকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছিল।

আজও সে কবিতার কিছু কিছু লাইন তার মনে আছে। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসছে ব্রাহ্মণ যুবক। সে চোখে দেখে এসেছে নাদিরের সৈন্যবাহিনীর সে অত্যাচার। গ্রামে সৈন্যবাহিনী ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তার মা আর বোন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ভিতর থেকে ঘরে এবং নিজেদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। তাকে ব'লে গেছে—মিথ্যা ম'রো না, নাদিরের ফৌজ পৌঁছুবার আগে তুমি গ্রামে গ্রামে মানুষকে জড়ো কর। ডেকে বল—নাদির আসছে, দিল্লীর পাপ শয়তানরূপী নাদিরকে আহ্বান করেছে। শয়তান বসতে আসছে পাপের পুরীতে।

ভেড়াওয়ালারে ভর করিয়াছে শয়তান আসি স্বয়ং না কি, !
পাপে টলোমলো দিল্লী নগরী ইশারায় তারে এনেছে ডাকি।

দিল্লীর কেল্লার ফটক ভেঙে নাদির প্রবেশ করে করুক। কিন্তু গ্রামে তাকে ঢুকতে দিয়ো না। গ্রামের মধ্যেই রয়েছে হিন্দুস্থান। বাঁচাও, হিন্দুস্থানকে বাঁচাও। ক্ষেতখামার বাঁচাও, গোমাতাকে বাঁচাও, আর বাঁচাও ঘরকে, ঘরে আছেন লক্ষ্মী, ঘরে আছেন মা-বহিন। বল—দেখে এলাম—

আগুন লেগেছে ঘরে
মা-বোন পুড়িয়া মরে
আকাশ হয়েছে কালো কালিতে।
কে তোরা চলিবি চল্
আগুন নিভাতে বল্—
বুকের শোণিতধার ঢালিতে॥

পুলিস এ খাতাখানা পায় নি। তারা অন্য খাতাগুলি নিয়ে গিয়েছিল। গৌরীকান্ত ভোররাত্রে ছাদে উঠে খাতাখানাকে জড়িয়ে ভিতরে ইটের টুকরো দিয়ে দড়ি বেঁধে ছুঁড়ে ফেলেছিল বিজয়দের বাড়ীর

উঠানের দিকে। কোথায় পড়েছিল সে বুঝতে পারে নি। বিজয়দের বাড়ীর পরেই বাগালবাবুর বাড়ী। দুই বাড়ীর মাঝখানে গলির ভিতর গিয়ে পড়েছিল মোড়কটা। বাড়ীর দরজা খুলে তখন বিশ্বেশ্বরী দরজায় জল দিচ্ছিল। খাতার মোড়কটা পড়তেই সে চমকে উঠেছিল প্রথমটা। তারপর উঠিয়ে নিয়েছিল। প্রায় সেই মুহূর্তেই গলির মুখে রাস্তার উপর চার-পাঁচজন পুলিস কনেস্টবলকে চ'লে যেতে দেখে চমকিত হয়ে বাড়ী ঢুকে খিল বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

খানাতল্লাসীর পর জবানবন্দী নিতে পুলিস দিন কয়েক ধ'রেই গৌরীকান্তকে টানাটানি করেছিল। গ্রামের প্রধানেরা থানায় গিয়ে বার বার তাকে অনুরোধ করেছিলেন—যা জানো তুমি ব'লে দাও। কোন ভয় নেই তোমার। ইন্‌স্‌পেক্টারের কয়েকটা কঠিন চড়ও সে খেয়েছিল। কিশোরবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল সদর পর্যন্ত। উঃ, সে কয়দিনের স্মৃতি তার কাছে কি ভীষণ! সমস্ত পৃথিবীতে যেন কেউ আপনার নেই, কোথাও একবিন্দু সহৃদয়তা নেই, এক ফোঁটা আশ্বাস নেই। তখন সে মাকে হারিয়েছে কিছুদিন আগে। একমাত্র আশ্রয় ছিল খুড়ীমা অর্থাৎ বিজয়ের মা আর বালক বিজয়। তাও তাদের স্নেহপ্রীতি প্রকাশে স্বাধীনতা ছিল না। তখনও বিজয়ের বাবা শ্যামাকান্ত বেঁচে ছিলেন। খানাতল্লাসীর পর শ্যামাকান্ত আরও বিরূপ হয়ে উঠে স্ত্রীকে এবং ছেলেকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বেশী আদিখ্যেতা ক'রো না। রাজার হাত রাজ্যের চেয়েও লম্বা। কোথাও গিয়ে কারও নিস্তার নেই। মেয়ে ব'লে খাতির করবে না। হ্যাঁ।

তবুও গৌরীকান্ত থানা থেকে ফিরে খাবারটা পেত। ঘরের এক কোণে ঢাকা থাকত। কখন কোন্ সুযোগে স্নেহময়ী খুড়ীমা এসে রেখে যেতেন খাবার।

গৌরীকান্ত ব'সে থাকত বারান্দায়। মন তখন তার কঠিন হয়ে এসেছে, ভয় ক'মে এসেছে। নিজেকে সে প্রস্তুত ক'রে তুলেছে। হঠাৎ তার নজরে পড়েছিল—খুড়ীমাদের বাড়ীর ওপাশে বাগালবাবুদের

বাড়ীর জানলায় একখানি মুখ। বিশ্বেশ্বরীর মুখ। জানলায় ব'সে একদৃষ্টে সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সময়টা বিকেলবেলা। গ্রামের মেয়েরা তখন কাপড় কাচতে গা ধুতে ঘাটে গেছে। পুরুষেরা বেড়াতে বের হয়েছেন। পাড়াটা নির্জন। অপরাহ্ণের পশ্চিম আকাশের আলোর আভা পড়েছিল বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর। সে আলোর আভা তার মুখের শ্যামলশ্রীর উপর সোনালী ছটা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রথম দিন বিশেষ কিছু মনে হয় নি তার। দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন—পর পর চার দিন দেখে সে চকিত হয়ে উঠেছিল। বিস্মিত হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সে বারান্দা থেকে উঠে যায় নি। নইলে সন্ধ্যার মুখেই সে ঘরে গিয়ে ঢুকত, আলো জ্বালত। তখন তার বাড়ীর চাকর ঠাকুর সব পালিয়েছে। সেদিন আলো জ্বালতে ইচ্ছে হয় নি। বারান্দাতেই ব'সে ছিল। জানলা থেকে তখন বিশ্বেশ্বরী স'রে গিয়েছে। সে বিশ্বেশ্বরীর কথাই ভাবছিল। বাগালবাবু সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলত। কথাগুলি সম্মানজনক ছিল না। লোকে বলত, রাত্রে কারা এসে বাগালবাবুর উঠানে ধানের বস্তা রেখে চ'লে যায়। একদিন রাত্রে পথের উপর এক বস্তা ধান প'ড়ে ছিল, বস্তাটার গায়ে একটা অক্ষর লেখা ছিল। সে অক্ষরটা—ব। এমনি অনেক কথা। আবার থানার মাতাল জমাদারটার সঙ্গেও বাগালবাবুর খাতির ছিল। রাত্রে থানায় খাওয়া-দাওয়া হ'লে বাগালেরই ডাক পড়ত। বাগাল খাসী সন্ধান ক'রে আনত। মাংস রান্না করত। গৌরীকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বাগাল কি তার গতিবিধির উপর নজর রাখবার ভার নিয়েছে? শেষে কি সে বিশ্বেশ্বরীকে—?

হঠাৎ তার নজরে পড়েছিল—সন্ধ্যার প্রদীপটি হাতে বিশ্বেশ্বরী গলি-পথটায় বের হয়ে এল। গলিপথ ধ'রে উত্তর মুখে সে চ'লে গেল। সে বোধ হয় ঠাকুরবাড়ীতে প্রদীপ দিতে গেল। গৌরীকান্ত বারান্দা থেকে নেমে এসে ঠাকুরবাড়ীর দিকের দরজাটি অল্প একটু খুলে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরবাড়ীটি গৌরীকান্তের বাড়ীর গায়ে। বিশ্বেশ্বরী ঠাকুরবাড়ীই

যাচ্ছিল। কিন্তু দৃষ্টি তার গৌরীকান্তের বাড়ীর দরজার দিকে। দরজাটি যে ঈষৎ খোলা সে সংবাদ যেন তার অজানা ছিল না। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবং মুহূর্তে প্রদীপটি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে চকিত গতিতে ঘুরে দরজাটি ঠেলে বলেছিল—কটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। দরজাটা খোল। ব'লেই দরজাটা ঠেলে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশ্বেশ্বরীর মুখ দেখতে পায় নি গৌরীকান্ত, কেবল শুনতে পেয়েছিল ঘন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। পরক্ষণেই ফিসফিস ক'রে বিশ্বেশ্বরী বলেছিল—তোমার খাতাটা আমার কাছে আছে।

—খাতা? চমকে উঠেছিল গৌরীকান্ত।—আমার খাতা?

—হ্যাঁ। সেদিন ভোরবেলা তুমি ঢিল পুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। বোধ হয় তোমার খুড়ীমার বাড়ীতে ফেলে দিয়েছিলে! কিন্তু পড়েছিল গিয়ে ওদের বাড়ী পার হয়ে গলিতে—আমাদের বাড়ীর দরজার মুখে। আমি তখন উঠে দরজায় জল দিচ্ছিলাম। আমি কুড়িয়ে রেখেছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরীকান্ত। কি বলবে বুঝতে পারে নি, খুঁজে পায় নি। ভয় হয়ে ছিল কাকে দেখিয়েছে, আর কে জেনেছে!

মনের কথা টেনে নিয়েই যেন বিশ্বেশ্বরী বলেছিল—আর কেউ জানে না। কাউকে বলি নি।

—খাতাখানা এনেছেন?

—না। ওখানা কিন্তু আমি আর তোমাকে দেব না। আমি পড়েছি, খুব ভাল লেগেছে আমার। তারপরই সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল—কি সুন্দর পদ্য লেখ তুমি গৌরীকান্ত! উঃ, কি সুন্দর, ভারি সুন্দর!

অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর দৃষ্টির মুগ্ধ বিস্ময় গৌরীকান্ত যেন স্পষ্ট অনুভব করেছিল।

—তোমার নাকি আরও অনেক খাতা আছে? অনেক গল্প লিখেছ তুমি?

—ছিল। সে সব এখন পুলিস নিয়ে গেছে।

—আর নতুন লেখো নি ?

—কাল লিখব।

—কাল আসব আমি।

ব'লেই সে দরজাটি ঈষৎ ফাঁক ক'রে ঠাকুরবাড়ীর চারদিক দেখে নিয়ে যেমন চকিত দ্রুতগতিতে প্রবেশ করেছিল তেমনি দ্রুত চকিতগতিতেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

অভিভূতের মতই দাঁড়িয়েছিল গৌরীকান্ত; অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আজ এই পরিণত বয়সে তার মনে কল্পনার আতিশয্য নেই। জীবনের হিসেব-নিকেশ গোঁজামিল দিয়ে মজুতের ঘর ভ'রে তুলবার দুর্বলতা নেই। সে হিসেব-নিকেশ ক'রেই বলতে পারে—সেদিন সন্ধ্যায় সেই দরজার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়েও সে বিশ্বেশ্বরীর এই আবির্ভাবকে জীবনে প্রিয়ার আবির্ভাব ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। মনের কোণেও কোন রঙীন স্বপ্ন উঁকি মারে নি।

সেদিন বরং আর একটা কল্পনা করেছিল সে।

কল্পনা করেছিল—বিশ্বেশ্বরী হবে তাদের এখানকার দিদি। সে এমন মেয়ের গল্প শুনেছিল ছদ্মবেশী আগন্তুকদের কাছে। নন্দবাবুর দিদি দেবকী দেবীর মত দিদিদের গল্প; বোনেদের গল্প। পূর্ব বাংলায় এমন দিদি বা বোন নাকি অনেক আছেন। গভীর রাত্রি, আকাশে দুর্যোগ অথবা দুরন্ত শীত। তারই মধ্যে ঘুমের ঘোরেও এঁদের চেতনা জেগে থাকে, ভাইয়ের প্রতীক্ষায় সজাগ থাকে। মাথার গোড়ায় বা ভাঁড়ারে রান্নার আয়োজন করা থাকে বা আহার্য সাজানো থাকে। হঠাৎ বাইরে শুকনো পাতার উপর সতর্ক সন্তর্পিত শব্দ ওঠে। দরজার কড়া বা শিকলটি টুক্ টুক্ শব্দ ক'রে ওঠে। এঁরা সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে বসেন। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন—কে?

মৃদু কণ্ঠের উত্তর আসে, বাইরে থেকে পরিচিত জন বলে—দিদি, আমি। অপরিচিত জন বলে—অনেক দূরের রাহী, একটু বিশ্রাম করব।

দরজা খুলে যায়। ভাইয়েরা আশ্রয় পায়। সেই রাত্রে রান্না ক'রে খাইয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে বিশ্রাম দিয়ে আবার ভোর থাকতে তাদের জাগিয়ে তুলে গ্রামের প্রান্তদেশ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলেন—এ পথ দিয়ে আবার কোনদিন গেলে বোনের ঘরে খেয়ে জিরিয়ে যাবেন। ভুলবেন না। এখন ভালয় ভালয় পৌঁছে যান। দেবতা আপনাকে রক্ষা করবেন। আমি যদি কোন পুণ্য ক'রে থাকি—

কথা শেষ করবার আগেই রাত্রিচারী রহস্যময় ভাইটি বা ভাইয়েরা ভোরের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কতদিন তারা দু'তিন জন একজন আহত ভাইকে এনে বাড়ীতে রেখে গেছে।—এ রইল দিদি। যা ব্যবস্থা হয় ক'রো। আমরা কাল পরশু এসে নিয়ে যাব।

আহত ভাই অথবা অসুস্থ ভাই। পথে আহত হয়েছে। অথবা অসুস্থ অবস্থায় পথ চলতে চলতে অসুখ এমন বেড়ে উঠেছে যে আর পথ হাঁটা অসম্ভব। দিদি তাকে অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছে। পাশের বাড়ীর লোক জানতে পারে নি।

অনেক সময় কোন ভাই যাবার সময় দিয়ে গেছে একটা ব্যাগ বা পোঁটলা।—এটা রইল। আবার এসে নিয়ে যাব। আমি যদি না আসি, আসতে যদি না পারি—তবে এই কথা ব'লে যদি কেউ এসে জিনিসটা চায় তো তাকে ফেরত দিয়ো।

কিংবা চেনা ভাইয়ের নাম ক'রে ব'লে যায়—আমি না এলে এরা কেউ এসে নিয়ে যাবে।

এই তো বছর খানেক আগে। এই তাদের দেশেই। রামপুর-হাটের কাছে ছোট একটি গ্রামে—এমনি একটি মেয়ে; তিনি মাসীমা। তরুণ বিপ্লবী বোনপোর তিনি মাসীমা তাই তিনি দিদি নন, মাসীমা। দুকড়িবালা দেবীকে আবিষ্কার করেছে পুলিস। তাঁর বোনপো নিবারণ ঘটক তাঁর কাছে রেখে গিয়েছিল রডা আর্মস লুঠ কেসের মসার পিস্তল। তিনি সেগুলিকে লক্ষ্মীর কৌটোর কড়ির মত যত্নে লুকিয়ে

রেখেছিলেন। পুলিসকে কোন কুটিল চরিত্রের গ্রামবাসী সন্ধান দিয়েছিল। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কঠোর শাস্তি হয়েছে। কিন্তু মাসীমা কোন সন্তানের নাম করেন নি।

গৌরীকান্ত সে দিন বিশ্বেশ্বরীর মধ্যে এমনই একটি দিদি অথবা বোন মা মাসীমার কল্পনা করেছিল।

পরের দিন সে আবার এল।

প্রখর গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্ন। ঝাঁ-ঝাঁ করছে গ্রীষ্ম-দুপুরের শেষ দণ্ড। গ্রীষ্মের দুপুরে এখানে দরজা জানলা ঘরে ঘরে বন্ধ থাকে শীতের রাত্রির মত। বাইরে হু-হু ক'রে বয় অগ্নিগর্ভ বাতাস। একটানা হু-হু-হু-হু-হু-হু। গাছগুলির ঝলসে যাওয়া পাতায় পাতায় যেন তৃষ্ণার হাহাকার জাগে। পাখী স্তব্ধ, পশু স্তব্ধ, মানুষ ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত। কদাচিৎ কোথাও একটা কুকুর ডেকে ওঠে, বা ঘর থেকে ঘাসের লোভে বেরিয়ে পড়া একটা ছোট বাছুর মা হারিয়ে ডেকে ওঠে—হাম্বা! গৌরীকান্তের আজও মনে পড়ছে—সে নিচের ঘরে ব'সে ভাবছিল।

কঠিন আক্রোশে ক্ষুব্ধ মন নিয়ে সে ভাবছিল নিজের কথা। সেদিন সকালবেলা তাকে ডেকেছিলেন ওই গুণীর জ্যাঠা। নবগ্রামের প্রবলপ্রতাপ লক্ষপতি ধনী। সেখানে ছিলেন জেলার রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার প্রমদাবাবু। প্রমদাবাবুর চোখ বিড়ালের মত—ক্যাটস আই। সেই চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন প্রমদাবাবু। অভ্যাস করেছেন। এমন চেয়ে থাকার অভ্যাস অনেক এবং কঠিন চেষ্টা ক'রে আয়ত্ত করেছেন তিনি। এমনভাবে চেয়ে থাকার অভ্যাস তো চোখের পাতার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে না, চোখের তারার উপর নির্ভর করে না, করে হিংস্র নিষ্ঠুর একটি চিত্তবৃত্তির উপর। সে চিত্তবৃত্তির জন্ম হয়, পুষ্টি হয় মমতা শীলতা লজ্জা বৃত্তিগুলির রক্তে মাংসে। ওগুলিকে ধ্বংস ক'রে ওই বৃত্তিটি সবল শক্তিশালী উগ্র হয়ে ওঠে।

সে দৃষ্টি তাকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছে। তার থেকেও নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সে

অনুভব করেছে গুণীর জ্যাঠার বাক্য-বাণে। মর্মান্তিক ভাবে তিনি তাকে বিদ্ধ করেছেন।

তার বাবা একদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গোলাপ দিয়ে গাছটি কেটে ফেলেছিলেন। অনুতাপ হয়েছিল তাঁর। একটি মাত্র গোলাপ গাছ ছিল। শুধু তাদেরই বাগানের মধ্যে নয়—গোটা গ্রামের মধ্যে। তার বাবা গোলাপ ফুল কাউকে তুলতে দিতেন না, নিজে নিত্য তিনি দেবপূজা করতেন, তাঁর ইষ্ট দেবতাকেও কোনদিন একটি ফুল তুলে চন্দন মাখিয়ে নিবেদন ক'রে দেন নি। ঘন কালো ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপফুল বাগানটি আলো ক'রে দুলত। সেই ফুল একদিন চেয়ে পাঠিয়েছিলেন গোপীকান্তবাবু। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসছেন তাঁর বাড়ী। তিনি তাঁকে সর্বপ্রথম একটি টাটকা গোলাপফুল দিয়ে সম্বর্ধনা করবেন। রাধাকান্তবাবু ফুল না দিয়ে পারেন নি। দিয়েছিলেন, সেদিন যে কটি ফুল ফুটেছিল সব ক'টিই তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড অনুশোচনা এবং আত্মগ্লানিতে অধীর হয়ে তিনি গাছটি সমূলে কেটে ফেলে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। যা তিনি প্রাণ ধ'রে দেবতাকে দেন নি তাই ভয়ে তিনি সমর্পণ করলেন বিধর্মী রাজ-কর্মচারীর পায়ে। তখন সন্তোষ পিসেমশায় বেঁচে। গৌরীকান্তের বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। তবু তার মনে আছে।

সুদীর্ঘ কাল পর এবার সে যেদিন নবগ্রামে ফিরেছে—৩১শে চৈত্র রাত্রিশেষে—নবগ্রামের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম সেই কথাটাই মনে পড়েছিল। আজও আবার মনে হচ্ছে। তার লাঞ্ছনার দিনেও কীর্তিবাবু তাকে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাপের কথা মনে নেই তোমার?

মনে ছিল, নিশ্চয় মনে ছিল। সে কথা কি কেউ ভোলে, না, ভুলতে পারে?

তার বাবা সর্বসমক্ষে হাত জোড় ক'রে মার্জনা চেয়েছিলেন।

গোপীচন্দ্রবাবুই সাহেবের কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরিচিত ক'রে

দিয়েছিলেন। সেকালের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, ইংরেজের সাম্রাজ্যশাসনের নিখুঁত পরিকল্পনায় ইস্পাতের স্তম্ভের মত কঠিন ক'রে গ'ড়ে তোলা স্তম্ভ—এ. মামুদ আই-সি-এস। তাঁকে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন কুটিল অবজ্ঞার সঙ্গে। সাহেব খেয়েই যাচ্ছিলেন, খেয়েই যাচ্ছিলেন, যেন কথা বলবার অবকাশই ছিল না তাঁর। আশেপাশে চারিদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা টেবিলে সে আমলের দুশো আড়াইশো গণ্যমান্য মানুষ। সকলের দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর উপর। অবশেষে রাধাকান্ত বলেছিলেন—হুজুর, আমি অসুস্থ।

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলেছিলেন—হোয়াট?

—অসুস্থ; আমি অসুস্থ।

—ও অসুস্থ। আই-সি, ইল্। অ্যাঁ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—তুমিই সেই রাঢাকান্টা? ছ্যাট গ্রেট ব্রাহ্মিন?

—হ্যাঁ হুজুর। আমিই সেই হতভাগ্য।

সাহেব ব্যঙ্গ ক'রেই বলেছিলেন—হোয়াট? হোয়াট ইজ হটভাগিয়া? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ইট?

সে কথা মনে করিয়ে দিতেই সেদিন সতের বছরের তরুণ কিশোরটির পায়ের আঙুলের ডগা থেকে রক্তস্রোত প্রচণ্ড ক্ষোভে মাথা পর্যন্ত সন্ সন্ ক'রে ব'য়ে গিয়েছিল।

তার বাবা টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলেন সভা থেকে। এবং এর পর আরও অপমান নির্যাতন আশঙ্কা ক'রে মর্মান্তিক বেদনায় ক্ষোভে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে অবশিষ্ট জীবন কাশীতে কাটিয়ে গিয়েছিলেন। দেশে মরবার সৌভাগ্যও তাঁর হয় নি।

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারের সামনে সেই কথা তুলে কীর্তিবাবু তাকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন—ওর বাপকে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। কাশীতে ব'সে—হে বাবা বিশ্বনাথ, ত্রিশূল নিয়ে ওঠ বাবা, ইংরেজ মারো ইংরেজ মারো ব'লে জপ করেছিল। অবশ্যি তার সঙ্গে আমরাও বাদ

যাই নি। সায়েবদের সঙ্গে আমাদেরও সর্বনাশ চেয়েছিল। এখন দি সন ইজ গ্রেটার দ্যান দি ফাদার। বাবা জিন্দে ব্যাটা, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। ছুরি ছোরা বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন তিনি। একপাক ঘুরে এসে বলেছিলেন—তোমাকে আমি এ গ্রাম থেকে তাড়াব। আমার এ গ্রামে তোমার মত ছেলেকে আমি থাকতে দেব না।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে সব সহ্য করেছিল।

তার প্রতিক্রিয়ায় তখন তার দেহে মনে আগুন জ্বলত।

আজও সে স্মৃতি এই নিষ্ঠুর দ্বিপ্রহরের চেয়েও নিষ্ঠুর উত্তপ্ত। সেদিন সকালের এই ঘটনার আঘাতের ক্ষোভের বশে সেই তরুণ বয়সের ধর্ম অনুযায়ী প্রতিশোধের নানা কল্পনা সে ক'রে যাচ্ছিল। ফাঁসীতে মরবে সে। তার দুঃখে গ্রাম কাঁদবে, দেশ কাঁদবে। মাথা হেঁট ক'রে থাকবে ওই কীর্তিবাবু। সব চেয়ে বেশী কাঁদবে বিশ্বেশ্বরী। এ গ্রামের বিপ্লবীদের পরম হিতৈষিণী!

তারই মধ্যে বিচিত্রভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বেশ্বরী। তাকে সে সেদিন বিপ্লবী-জীবনের আশ্রয়স্থল ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিল। সেই কল্পনাই সে করেছিল সেদিন দ্বিপ্রহরে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকে উঠে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

খিড়কী দরজা ও কে বন্ধ করছে? এক রাশ কোঁকড়া কালো চুল ফুলে ফেঁপে রয়েছে—ও কে? বিশুদিদি! বিশুদিদির সবচেয়ে সুন্দর তার ওই কোঁকড়া কালো চুল।

দরজা বন্ধ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল বিশুদিদি। স্থির শঙ্কিত সন্তর্পিত দৃষ্টি। মুখখানি থমথম করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে গৌরীকান্তকে দেখেই তার মুখ স্মিতহাস্যে অপরূপ মাধুরীতে ভ'রে উঠল। ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এসেছি।

তারপর মৃদুস্বরে বললে—সারা দুপুর তোমার পত্রগুলি প'ড়ে শোনাতে

হবে কিন্তু। চল—ঘরে চল। বাবা, মামীর আর ঘুম আসে না কিছুতে। মামা ঘুমুচ্ছে আর মামী ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রেই চলেছে, ক'রেই চলেছে। মামা গহনা বন্ধক দিয়েছে—দাও ছাড়িয়ে, দাও ছাড়িয়ে। কবে দেবে? এই—এই এতক্ষণে ঘুমল। আমি বেরিয়ে এসেছি। পড়, তোমার পদ্য পড়। কাপড়ের ভিতর থেকে খাতাখানি বের ক'রে দিয়েছিল—নাও পড়।

গৌরীকান্ত প'ড়ে শুনিয়েছিল তার সেই নাদিরশাহের দিল্লী অভিযানের কবিতা।

আগুন লেগেছে ঘরে
মা বোন পুড়িয়া মরে
আকাশ হয়েছে কালো কালিতে।

পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণের ছেলেটি গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে।

হঠাৎ বিশুদিদি তার হাত চেপে ধ'রে বলেছিল—সে ছেলেটি বোধ হয় আর-জন্মে তুমি ছিলে গৌরীকান্ত।

গৌরীকান্তের ভারী ভাল লেগেছিল। সে হেসে বলেছিল—তা হ'লে তুমি ছিলে বিশুদি, বামুনের ছেলের ওই দিদি। যে মায়ের সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরেছে। মরবার সময় বলেছে—তুই ভাই, ছুটে যা, নাদিরশা আসতে আসতে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ব'লে যা, সাবধান ক'রে দে—নাদির আসছে। ধরম বাঁচাও। জান যাক, ধরম বাঁচাও। ইজ্জৎ বাঁচাও। চ'লে যাও দূর দূরান্তে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে। পালাতে না পারলে জ্বালিয়ে দে নিজের ঘর। মা বোন যতক্ষণ নিজেদের জানটা বের ক'রে দিতে না পারে ততক্ষণ আটক কর্ দরওয়াজা। তোর জান তাতে যায় যাক।

বিশুদিদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। কথার উত্তর দিতে পারে নি। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ। চোখের জলের ধারা দুটিও সে মোছে নি।

হঠাৎ কাকের ডাকে সচকিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বেশ্বরী। বাইরে ছাদের আলসেতে কাক উড়ে এসে ব'সে ডেকে উঠেছে—কা-কা-কা।

—দুপুর ভেঙেছে। কাক নেমেছে। আজ যাই।

চকিতে উঠে, দরজা খুলে একটু ফাঁক ক'রে সামনের বিজয়দের বাড়ীর কোঠার জানলাগুলি দেখে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত সে বেরিয়ে চ'লে গেল। খিড়কীর দরজা দিয়ে সে বের হ'ল না। সে বের হ'ল সদর-বাড়ীর দরজা দিয়ে। দ্বিপ্রহরে ঠাকুর-বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করে। সে চলে গেল সেই পথ ধ'রে।

আবার এল পরদিন।

সেই দিনই শেষ হয়ে গেল খাতাখানা। অসমাপ্ত রচনা। শেষ হয় নি। নাদিরশা দিল্লী এসেছে—সম্রাট মহম্মদশাহ সন্ধির নামে পারস্যের রাখালের বশ্যতা স্বীকার করেছে। বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পাগড়ী বদল ক'রে কোহিনূর সমর্পণ করেছে। আতিথ্য সৎকারের নামে লালকেল্লার রঙমহল নাদিরকে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাস করতে গেছে নিচের তলায় দেউড়ি-ই-সালাতিনে। এখানেই আগে বাস করত বাদশাহদের পোষ্য—অবহেলিত জ্ঞাতিবর্গ। ওদিকে গোটা পঞ্জাবে হাহাকার উঠেছে। সেই ব্রাহ্মণের ছেলে এখনও ঘুরছে, এখনও ঘুরছে। গান গাইছে—

আগুন লেগেছে ঘরে!

বিশ্বেশ্বরী বললে—পড়, থামলে কেন?

গৌরীকান্ত বললে—আর তো নেই?

—নেই?

—আর লেখা হয় নি বিশুদি।

—পুণ্ডরীকের কি হ'ল?

—তাকে নাদিরশা মারবে। কাটবে। কিন্তু সে তো এখনও লেখা হয় নি।

ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল বিশুদি—না না। পুণ্ডরীক মরবে কেন? না না।

গৌরীকান্ত তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল বিয়োগান্ত কাব্যের মহত্ত্বের কথা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরী বুঝতে পারে নি, বুঝতে চায় নি। সে বলেছিল-না, তবে তোমাকে লিখতে হবে না। গৌরীকান্তকে মেরে—

পরক্ষণেই জিভ কেটে বলেছিল—পুণ্ডরীককে মেরে লিখবে তুমি, ও-লেখা আমি শুনব না।

এর পর ক'দিন সে আর আসে নি। গৌরীকান্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। কেন আসে না বিশুদি?

সারাটা দুপুর সে কান পেতে ব'সে ছিল প্রথম দিন। বাইরে সামান্য খুটখাট শব্দে সে চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

প্রতিবারই সে দরজা খুলে দেখেছে। দু-একবার মৃদুস্বরে ডেকেছে—বিশুদি! কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরেছে প্রতিবার। শেষ সে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঝাঁ-ঝাঁ করছিল গ্রীষ্মের দুপুর। আকাশের নীল বিবর্ণ, পৃথিবীর সবুজ ম্লান, যেন ঝলসে গেছে, আগুনের মত তপ্ত এলোমেলো বাতাস হু-হু ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে; ধূলিধূসর মাটির বুকে ঘূর্ণি উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চারিদিক স্তব্ধ, কীট-পতঙ্গ পশু-পাখী মানুষ-জন কারও সাড়া নেই—সব যেন মূক হতচেতন হয়ে গেছে। সারা আকাশের গায়ে শূন্য মণ্ডলে কোথাও একটি কালো বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে না, চিলগুলি পর্যন্ত নেমে প'ড়ে গাছের পল্লব-ছায়ায় ধুঁকছে। একটি জীব চোখে পড়েছিল শুধু—একটা কুকুর খিড়কীর পুকুরে গলা ডুবিয়ে ব'সে আছে। মানুষের মুখ একখানি জেগেছিল সামনের একটি জানলায়। বিজয়দের উঠানের ওধারে বাগালবাবুর কোঠা ঘরের জানলায় বিশ্বেশ্বরী বুকে বালিশ রেখে শুয়ে কি পড়ছিল। বুঝতে দেরী হয় নি গৌরীকান্তের যে, বিশ্বেশ্বরী তারই সেই খাতাখানা পড়ছে। খাতাখানা বিশুদি ফেরত দেয় নি। রোজ সঙ্গে নিয়ে আসত আবার নিয়ে যেত। বলেছিল—এ আমি দেব না। কক্ষণো না।

বিশ্বেশ্বরী তাকে দেখে মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না। অর্থাৎ সে পাবে না। সেদিন সন্ধ্যায় গৌরীকান্ত ইচ্ছে ক'রেই ঠাকুর-বাড়ীর দিকের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বিশু প্রদীপ দিতে আসবে। এল বিশু। তাকে দেখে মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠেছিল। হাতের প্রদীপের আলোটুকু পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল তার মুখের নীচের দিকটিতে। বিশ্বেশ্বরীর ঠোঁট দুটি ছিল বড় পাতলা, বড় সুন্দর। সে ঠোঁটে হাসি ফুটত অপরূপ মাধুরীতে। হেসেও বিশ্বেশ্বরী বরাবর চ'লে গিয়েছিল ঠাকুর-ঘরের দিকে। ফেরবার সময় হঠাৎ 'সাপ' ব'লে চীৎকার করে ছুটে এসে তার দরজার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়ীতে তখন অনেক লোকের আনা-গোনা। 'সাপ' শুনে সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল—কই? কোথায়? বিশ্বেশ্বরী গৌরীকান্তের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—ওই যে কালীঘরের কোণে ওই ঢিপিটায় ছিল। ঢুকে গেল বোধ হয়।

সকলের দৃষ্টি, সকলের মন মুহূর্তে আবদ্ধ হ'ল সেইখানে কালীঘরের কোণের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই মৃদুস্বরে বিশ্বেশ্বরী বলেছিল—দুপুর বেলা ওই ঝাঁজের মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন দুষ্টু ছেলে? আবার এখন এখানে দাঁড়িয়ে?

ছলনাটুকু বুঝতে গৌরীকান্তের আর দেরী হয় নি। সে মৃদুস্বরেই বলেছিল—সাপ ছেড়ে দিলাম যে, সেই জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

—ওরে দুষ্টু!

—এলে না কেন?

—আর পদ্য নেই, কিজন্যে আসব?

—অনেক পদ্য আছে। অন্য পদ্য।

—সে সব শুনব না। এইটে শুনব।

—বেশ, বাকীটা লিখব।

—তা হ'লে আসব।

—আজ রাত্রেই লিখব।

—কিন্তু খবরদার, পুণ্ডরীককে মারবে না।

পরক্ষণেই সে গলা চড়িয়ে বলেছিল—আলোটা আনো না ভাই গৌরী—লণ্ঠনটা। একটু ধর। আমি ওই ঢিপিটা পার হয়ে যাই।

গৌরীকান্ত লণ্ঠন এনে বলেছিল—চল, এগিয়ে দি।

—না। তুলে ধর, আমি চ'লে যাই।

সেই রাত্রেই শেষ করেছিল সে 'নাদিরশাহের দিল্লী অভিযান'। শেষ ক'রেই সকালবেলাতেই সে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে আবৃত্তি করছিল।

পুণ্ডরীককে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিশুদিদির কথা সে লঙ্ঘন করে নি। সে কল্পনা করেছিল, জুমা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার পথে নাদিরশাহকে যে অজ্ঞাতনামা আততায়ী গুলি করেছিল, সে আর কেউ নয়—সে পুণ্ডরীক। তারপর দিল্লীর হত্যাকাণ্ড!

আঁধিয়ার আঁধিয়ার, আলো সে দিয়েছে মুছে
নাদির দিয়েছে মুছে!

সেই অন্ধকারের মধ্যে শবাকীর্ণ নগরপথে সন্তর্পণে ফিরছে—ও কে? তরুণ দীর্ঘদেহ—ও কে? চোখে তার দীপ্তি নেই, শুধু দুটি জলের ধারা গড়াচ্ছে—ও কে? সে পুণ্ডরীক।

সকালবেলায় শান্ত পল্লীর আকাশে চারিদিকে তার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজয়দের বাড়ীতে খুড়ীমা বার কয়েক তার দিকে তাকালেন। কাকা বার দুই বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—ওরে থাম্। কে কোথায় শুনে থানায় খবর দিয়ে আসবে।

বিজয়দের বাড়ীর ওপাশে জানলায় বিশেশ্বরী স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল। গৌরীকান্ত আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছিল—

মা আমার তুমি শোনো
বোনটি আমার শোনো
সময় আমার হয় নি এখনো
আমারে ডেকো না যেন।

এখন পুণ্ডরীককে ডেকো না। পুণ্ডরীক এখন যাবে না। যেতে তার দেরী আছে। নাদির বেঁচে আছে। দেশ শ্মশান। আলো নেই হিন্দুস্থানে। তার জন্য দায়ী পুণ্ডরীক। সে-ই ছুঁড়েছিল গুলি। হায়, উত্তেজনাকম্পিত হাতের ব্যর্থ গুলি! পুণ্ডরীক তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে তপস্যা করবে। হঠাৎ তার আবৃত্তিতে বাধা পড়ল, নিজেই সে থেমে গেল। বাগালবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর তার কানে এসে ঢুকল।

—জানলার ধারে ব'সে কি হচ্ছে? জানলার ধারে? স'রে আয় বলছি, স'রে আয়।

বিশ্বেশ্বরী ফিরে তাকাল পিছন দিকে। বোধ করি বাগালবাবু ঘরের ওধারে দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর সে ধীরে ধীরে স'রে গেল জানলা থেকে। জানলা দুটি বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন দুপুরবেলাতেও জানলা বন্ধ হয়ে ছিল। সারাটা দিনে একবারও খোলে নি। সন্ধ্যায় গৌরীকান্ত বারেকের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল ঠাকুরবাড়ীর দরজায়, কিন্তু তারপরই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। শঙ্কিত হয়েছিল সে। বিশুদিকে কি সন্দেহের চোখে দেখেছে বাগালবাবু? ঠিক এই মুহূর্তেই খিড়কীর দরজা দিয়ে ছুটে এসেছিল বিশ্বেশ্বরী। চকিতে এসে চকিতে একটি কথা ব'লে চকিতে চ'লে গিয়েছিল।—রাত্রে আসব।

গভীর রাত্রি। বিনিদ্র চোখে ব'সে ছিল গৌরীকান্ত। সন্তর্পণে কান পেতে ছিল। হঠাৎ মৃদুস্বরে খিড়কীর দরজা খুলে গিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে শুভ্রবস্ত্রাবৃতা নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

—গৌরীকান্ত!

—বিশুদি!

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরীকান্ত।

—এসেছি। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বেশ্বরীর মুখ।

—কি সুন্দর পদ্য হয়েছে গৌরীকান্ত! আমি শুনেছি—

মা তুমি আমার শোনো
বোনটি আমার শোনো
যাবার সময় হয় নি এখনো
আমারে ডেকো না যেন।

আখেরে কি হ'ল পুণ্ডরীকের?

—লিখেছি বিশুদি। আগে থেকে ব'লে দিলে তো কবিতা শুনতে ভাল লাগবে না। প'ড়ে শোনাব, এস।

—উঃ, আমার মন যে কি ছটফট করছে কি বলব তোমাকে! কিন্তু ও যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে আমি শুনব না তা ব'লে দিচ্ছি।

হেসেছিল গৌরীকান্ত।

বিশুদি অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পেরেছিল সে কথা। ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হাসলে আমি শুনব না।

—না বিশুদি, পুণ্ডরীক মরে নি।

—বাঁচলাম। সারাটা দিন আমি ছটফট করছি। যত তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পত্থ ব'লে যাচ্ছ তত আমার মনের আকুলি-বিকুলি বাড়ছে। কান পেতে রেখেও এত দূর থেকে তো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

গৌরীকান্তের মনে প'ড়ে গিয়েছিল সে দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে বিশুদির মামা বাগালবাবুর এসে দাঁড়ানোর কথা, তার চীৎকারের কথা মনে পড়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু তখন তোমার মামা এমন ক'রে বকছিল কেন বিশুদি?

তখন ঘরের ভিতর এসে পড়েছে তারা। বিশুদিই ঘরের দরজাটি বন্ধ করছিল। দরজায় পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বেশ্বরী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল—মামা? মামার বকুনি তুমি শুনেছ?

—শুনতে তো ঠিক পাই নি। খানিকটা দেখলাম, দু-চারটে কথা কানে এল। মনে হ'ল বকছেন।

চোখ দুটি জ্ব'লে উঠেছিল বিশ্বেশ্বরীর। মুহূর্তের জন্য। সে যেন বিদ্যুৎচমক। পর-মুহূর্তেই বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত মুখখানি, চোখে এসেছিল জল; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত কম্পিত কণ্ঠে বিশুদি বলেছিল—ঘেন্নার কথা গৌরীকান্ত, ঘেন্নার কথা। মানুষটাই যে এমনি ঘেন্নার। তোমরা তো জান না—সে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। মামা মামী রাত্রে যে সব কথা বলে, পাশের ঘরে শুয়ে আমি শুনি—শুনে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়, নয়তো ইচ্ছে হয় ঘরে আগুন লাগিয়ে দি। আমি নাকি জানলার ধারে বালিশে বুক দিয়ে শুয়ে—। থেমে গিয়েছিল বিশ্বেশ্বরী।

থুতু ফেলে অস্পৃশ্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ক'রেই সে বলেছিল—সেই জন্যেই দুপুরবেলা বের হই নি। এখন পদ্য শুনব। ওই আমার গঙ্গাস্নান।

নিজেই আলো উস্কে দিয়ে বলেছিল—পড়, কই তোমার খাতা!

দু ঘণ্টা ধ'রে সে পড়েছিল।

বিশ্বেশ্বরীর অভিপ্রায় মতই পুণ্ডরীক মরে নি। গৌরীকান্ত তাকে নাদিরের ক্রীতদাস ক'রে পাঠিয়েছিল পারস্যে। সে নিষ্ঠুর আক্রোশ বুকে চেপে ক্রীতদাসত্ব স্বীকার ক'রেও প্রতীক্ষা ক'রে দিন কাটাচ্ছিল। নাদিরের তাঁবুর বাইরে পারস্যের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মা ও বোনকে উদ্দেশ ক'রে বলত—

যাবার সময় হয় নি এখনো
আমারে ডেকো না যেন।

আকাশের দুটি তারাকে সে চিনে রেখেছিল। তাদের উদ্দেশ ক'রেই বলত। বলত—

হিন্দুকুশের ওপার আকাশ হতে—
মোর সাথে সাথে দুর্গম দূরপথে
এসেছ তোমরা—চিনেছি চিনেছি—
তুমি বোন—তুমি মা।

রাতের আঁধারে ঘুমালে সবাই,
প্রদীপ জ্বালিয়া ডাকো ইশারায়—
আয় আয় ওরে, আয় আয় আয় ;
আমি বলি—না, না।

পুণ্ডরীক বলে—এখন ডেকো না, কাজ আমার শেষ হয় নি।

তারপর একদিন অন্ধকার রাত্রে বিদ্রোহী সেনাপতিরা নাদিরের তাঁবু ঘেরাও করল। নাদির তখন বিকৃতমস্তিষ্ক—সদাসর্বদা সৈন্যাধ্যক্ষদের বিদ্রোহের আতঙ্কে আতঙ্কিত ; সেই আতঙ্কে সে ক্ষিপ্ত বাঘের মত নখর-দন্ত বের ক'রে গর্জায়। অন্ধকার তাঁবুর কোণের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে নিষ্ঠুর আক্রোশে ছুরি ছুঁড়ে মারে। কখনও ছুরি হাতে লাফিয়ে প'ড়ে তাঁবুর খুঁটিতে মাথা ঠুকে প'ড়ে যায়। কদাচিৎ ঘুম আসে।

সে ঘুমের অবসরে তাঁবুর দরজায় চকিতে জ্ব'লে ওঠে আলোর নিশানা। পুণ্ডরীক—ক্রীতদাসবেশী পুণ্ডরীক দেয় আলোর নিশানা। সেই নিশানার ইশারা পেয়ে ছুটে আসে বিদ্রোহীরা। ঢুকে পড়ে তাঁবুতে—হাতে উদ্যত অস্ত্র। ছোরা-তলোয়ারের আঘাত প্রায় এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু প্রথম ছুরিটা কার ?

পুণ্ডরীকের।

তারপর চারিদিকে কোলাহল। তারই মধ্যে পুণ্ডরীক বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে চড়ে একটা ঘোড়ায়। পায়ের কাঁটায় ঘোড়াকে আঘাত ক'রে বলে—হিন্দুস্থান ! হিন্দুস্থান !

তাকায় আকাশের দিকে। দেখতে পায় সেই তারা দুটিকে। ঝিকিমিকি করছে। সে বলে, চীৎকার ক'রে বলে—

ইরাণ-আকাশ পার হয়ে চলো—
সাথে সাথে মোরে ইশারায় বলো—
হিন্দুস্থানের পথ !

অন্ধকার রাত্রে ইরাণ থেকে হিন্দুস্থানের পথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ওঠে।

—ভারী ভাল হয়েছে। ভারী ভাল হয়েছে। গৌরীকান্ত, কি যে বলব—?

প্রদীপ্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বরী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সে দৃষ্টির সম্মুখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল গৌরীকান্ত। কি তার দীপ্তি, কি তার আকর্ষণ! কি অতল গভীর তার রহস্য! গৌরীকান্ত চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

বিশ্বেশ্বরী খাতাখানি বগলে পুরে বলেছিল—নিয়ে যাচ্ছি। এ আমার।

গৌরীকান্ত বলেছিল—ওতে অনেক কাটাকুটি আছে বিশুদি। তার চেয়ে আগের খাতাখানাও দিয়ে যেয়ো, আমি ভাল বাঁধানো খাতায় খুব চমৎকার ক'রে লিখে দোব। উৎসর্গের পাতায় লিখে দোব—বিশুদিকে—স্নেহের গৌরীকান্ত। কেমন?

—সে খুব ভাল হবে। কালই আমি সে খাতাখানা দিয়ে যাব। দুপুরবেলা। আমি কাল আর আসব না। খিড়কীর দরজার ফাঁক দিয়ে খাতাটা ফেলে দিয়ে যাব। কেমন?

* * * * *

সেই খাতা দিতেই আসছিল বিশ্বেশ্বরী।

দুপুরবেলা সে প্রতীক্ষা ক'রে ছিল মামা-মামীর ঘুমের। বোধ হয় ব্যাকুল আগ্রহের জন্য তার একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। তার মামা-মামীর তন্দ্রাকে ভেবেছিল গাঢ় ঘুম। না। শুধু ভুলই নয়, আরও বোধ হয় কিছু ছিল। ভুল ছাড়াও কিছু। ভুল ক'রে বেরিয়ে এসেও সে ধরা পড়ত না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খিড়কীর ঘাটে এসে খাতাখাতা দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু ভুলের উপরের ওই কিছুর জন্যই বিশ্বেশ্বরী উঠানের মাঝখানে আসতেই একটা ছুটন্ত গুলি—গুলি-ডাণ্ডার গুলি এসে তার কপালে লাগল। নিষ্ঠুর আঘাতের যন্ত্রণায় সে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ব'সে পড়ল, দুই হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল ক্ষতস্থানটা। নির্জন দুপুরে

বাগালের ছেলে দুলাল গুলি-ডাণ্ডার সাধনায় একাই পিটে চলেছিল। সেই গুলি ছুটে এসে লেগেছে বিশ্বেশ্বরীর কপালে। ছেলেটা দুরন্ত হোক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীকে ভালবাসত। বিশুদির রক্তাক্ত কপাল দেখে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল—ওগো পিসীমা গো, বিশুদির কি হ'ল দেখ গো! ওগো বাবা গো!

এ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বিশ্বেশ্বরীর মা, ও ঘর থেকে মামা-মামী। ছেলেটা তাদের ডেকে দিয়েই বাড়ী থেকে ছুটে পালিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল বিশ্বেশ্বরী। সেই ফাঁকে খাতাখানি কক্ষচ্যুত হয়ে প'ড়ে গিয়েছিল উঠানে। বাগাল এবং বিশ্বেশ্বরীর মা দুজনে যখন বিশ্বেশ্বরীকে ধ'রে তুলছিলেন তখনই খাতাখানা তুলে নিয়েছিল বিশুদির মামী। কপালটা বেশ খানিকটা কেটে গিয়েছিল। বিশ্বেশ্বরীর মা জল দিয়ে ধুয়ে কাটা জায়গাটায় ন্যাকড়া পুড়িয়ে সেই ছাই লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। ওইটেই তখন ছিল কাটা-ফাটার গেরস্থালি ওষুধ; নাম ছিল—করালী ক'রে দেওয়া। বিশ্বেশ্বরী তখনও বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে নি; কতকটা আচ্ছন্নের মতই প'ড়ে ছিল মায়ের কোলে। হঠাৎ চকিতের মত মনে প'ড়ে গেল খাতার কথা। খাতা? তার খাতা?

ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসেছিল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মায়ের হাতের দিকে, আশপাশের দিকে, উঠানে যেখানটায় সে প'ড়ে গিয়েছিল সেখানটার দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। কোথাও নেই। কোথায় গেল?

মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'ল

—আমার—

—কি?

—আমার খাতা? আমার খাতা? সে উঠে দাঁড়াল। চোখে পড়ল, সামনে উঠানের ওদিকে মামী খাতাটা উল্টে দেখছে। নিরক্ষরা মামী সবিস্ময়ে দেখছে। মামা উঠানের কোণে হাত ধুচ্ছে, হাতে বিশুর কপালের রক্ত লেগেছে। বিশ্বেশ্বরী দাওয়া থেকে নেমে এল, হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, আমার খাতা দাও।

—খাতা? কিসের খাতা? মামা মুখ ফেরালেন। চোখে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন জেগে উঠল—ভ্রূর কুঞ্চনে জেগে উঠল কুটিল রূঢ়তা। মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর হাত থেকে খাতাখানা টেনে নিতে হাত বাড়াল।

নিরক্ষরা মামীর অক্ষর-পরিচয় না থাকলেও ছন্দোবদ্ধ লেখার ভঙ্গি দেখে অনুমান ক'রে বললে—গানের খাতা। গান লেখা রয়েছে। খাতার পাতাগুলো সে উল্টে গেল।

—কার হাতের লেখা? খাতাখানা টানলে মামা।

—না। আমার খাতা। না। বিশ্বেশ্বরী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল খাতার উপর। চীৎকার ক'রে উঠল—না। না। না।

মামাও চীৎকার ক'রে উঠল—কার হাতের লেখা? ছাড় বলছি—ছাড়্। ছিনিয়ে নিলে সে খাতাখানা, উল্টে দেখলে। গোড়ার পাতাতেই নাম লেখা রয়েছে—গৌরীকান্ত। এর বেশী আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না গোঁয়ার বাগালের। একটা অর্থহীন ক্রুদ্ধ চীৎকার ক'রে উঠল সে। সে চীৎকারে তার স্ত্রী সভয়ে চমকে উঠল, বিশুর মাও চমকে উঠলেন। কিন্তু বিশু চমকাল না। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খাতাখানার উপর। পাতলা খাতা—অল্প কয়েকখানা পাতার সমষ্টি, তার প্রাণপণ আকর্ষণে ছিঁড়ে গেল। খানিকটা থাকল মামার হাতে। বাকীটা এল বিশ্বেশ্বরীর হাতে। বিশ্বেশ্বরী ভেবে পেলে না কেমন ক'রে খাতাখানা লুকোবে; কিন্তু লুকোনো যেন প্রয়োজন। সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চোখ থেকে তার আগুন বের হচ্ছিল। মামা আবার চীৎকার ক'রে উঠল—পোড়া রমুখী নচ্ছার হারামজাদী! তাই তখন জানলায় মুখ রেখে সানসংজ্ঞে হারিয়ে বসেছিলি!

—বাগাল! বাগাল! ওরে! বিশুর মা সভয়ে মিনতি জানিয়ে ডাকলেন—কি হ'ল?

দুই হাত নেড়ে কুৎসিত ভঙ্গি ক'রে বাগাল ব'লে উঠল—পীরিত, পীরিত, তোমার মেয়ে পীরিত করছে।

বিশ্বেশ্বরী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল। সমস্ত পৃথিবী

ঘুরছে। আলো যেন ম্লান হয়ে আসছে। ঘর দোর সব যেন এঁকে-বেঁকে কেমন লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

বিশুর মাও থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন। চাপা আর্ত কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন—ওরে, ওরে, এ কি বলছিস রে? ওরে বাগাল—ওরে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই ছোঁড়া—ওই। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। ওই ছোঁড়া পত্ত লিখে পীরিত করছে। ওই গৌরীকান্ত।

বিশ্বেশ্বরী তাকাল গৌরীকান্তের বাড়ীর বারান্দার দিকে। পর-মুহূর্তে সে ভেঙে-পড়া মাটির প্রতিমার মত আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল উঠানে।

* * * *

গৌরীকান্ত তখন বিশুদিরই প্রতীক্ষা করছিল। খিড়কীর দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ চীৎকার শুনে সেখান থেকে এসে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সবটাই তার চোখের সামনে ঘ'টে গেল। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর তখন। কথাবার্তাগুলি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। বাগালের শেষ কথাগুলি শুনে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গিয়ে সে প্রতিবাদ ক'রে আসে, শপথ ক'রে আসে—ভগবানের নামে, তার স্বর্গত বাপের নামে, মায়ের নাম নিয়ে শপথ ক'রে আসে, মিথ্যে মিথ্যে। শপথ ক'রে বলছি—এ মিথ্যে! কিন্তু পারে নি।

সারাটা দিন সে ওই জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। নিচে নামে নি, দরজায় ডেকে বাড়ীর বুড়ী বাউরী ঝি ফিরে গিয়েছিল। পাঁচীলের ও-পাশ থেকে খুড়ীমা ডেকেছিলেন, সে সাড়া দেয় নি। কণ্ঠস্বর যেন তার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সাড়া দিতে চেয়েছিল—স্বর ফোটে নি। সারা পৃথিবীরই যেন অর্থ হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন। কতক্ষণ সেদিন তার হিসাব ছিল না। আজ অবশ্য হিসেব করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস—বেলা দুপুর থেকে সন্ধ্যা; বেলা দুটো থেকে বেলা সাড়ে ছটা—সাড়ে চার ঘন্টা। সাড়ে চার ঘন্টা পর হঠাৎ তার দেহে মনে সাড়া

এসেছিল। আবার একটা আঘাতে সে চমকে উঠেছিল। বিশুদির কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। বিশুদি চীৎকার ক'রে উঠেছিল—বোধ হয় তাকে শোনাবার জন্যই এত চীৎকার ক'রে বলেছিল সে। বলেছিল—হ্যাঁ, বাসি, বাসি, ওকে আমি ভালবাসি। পারি—পারি—ওর জন্যে আমি লাজ-লজ্জা কুল-শীল ঘর-দোর সব ভাসিয়ে দিতে পারি। মরতে পারি ওর জন্যে। পারি। ঘরে দোরে আগুন জ্বালিয়ে চ'লে যেতে পারি। ওকে আমি—

তার মুখ চেপে ধরেছিলেন তার মা।

চঞ্চল সাড়া জেগেছিল গৌরীকান্তের সর্ব দেহে—শুধু দেহে নয়, অন্তরে বাহিরে, দেহে মনে; পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ব'য়ে গিয়েছিল একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ; বুকের ভিতরটা থরথর ক'রে স্পন্দমান হয়ে উঠেছিল, কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছিল—মনে হয়েছিল সে বোধ হয় উন্মাদ হয়ে যাবে এক মুহূর্তে। অধীর উন্মাদনায় সে বোধ হয় সেই দিন সেই মুহূর্তটিতেই কৈশোরের সকল ভীরুতাকে যবনিকার মত ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে যৌবনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। পর-মুহূর্তে সে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। লজ্জা তার কেটে গিয়েছিল—ভয় হয়ে গিয়েছিল মূক—বিশ্বেশ্বরীকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে। বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠেছিল সেদিন। সে শুনেছিল—প্রাণ দিয়ে শুনেছিল—তার শিরা-উপশিরায় স্নায়ুমণ্ডলীতে সেতারের জোয়ারির তারের মত সে প্রতিধ্বনির ধ্বনির ঝঙ্কার উঠেছিল; সারা দেহখানা যেন বেজে উঠেছিল। ছুটে উঠে গিয়েছিল ছাদে, পায়চারি করেছিল অশ্রান্ত পদক্ষেপে। তারপর কখন পড়েছিল ঘুমিয়ে।

হঠাৎ একটা কোলাহলে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কোলাহল তুলে মানুষেরা ছুটে যাচ্ছে—গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে। কি হ'ল? কি হয়েছে? ছাদের দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়েই সে দেখতে পেয়েছিল—আগুনের শিখা; দূরে এই নাগের মাঠে একটি সঞ্চরমাণ অগ্নিপুঞ্জ।

নাগের মাঠে অশ্বত্থ গাছের তলায় আগুনের শিখা যেন অশ্বত্থ গাছটিকে প্রদক্ষিণ করছে।

হায়! হায়! হায়! শব্দ উঠছে পথে। বিশ্বেশ্বরী—বিশু গো—ওই যে বাগালবাবুর ভাগ্নী!

বিশ্বেশ্বরী কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সর্বাঙ্গ ভিজিয়েছে কেরোসিন তেলে। এই অশ্বত্থতলে প্রদীপ জেলে দিয়ে বলেছে—জীবন আমার অসহ্য হয়েছে। আমি মুক্তি নিতে এসেছি। তোমার পুণ্যে তোমার মহিমায় আত্মহত্যার পাপ যেন আমাকে পরকালে যন্ত্রণা না দেয়। তোমার ছায়ায় তোমার মূলে আমি সব সমর্পণ ক'রে গেলাম।

গৌরীকান্ত এসে নাগের মাঠের অশ্বত্থতলে দাঁড়াল।

এতকাল পরে তার জীবনের প্রথম প্রেমের কথা মনে পড়েছে। বিশ্বেশ্বরী তাকে প্রথম ভালবেসেছিল। সে কথা সে শুধু কানে শুনেছিল। একটা আবেগ তাকে বিচলিত করেছিল। সর্ব দেহ মন অন্তর দিয়ে অনুভব করবার অবকাশ হয় নি। আজ অকস্মাৎ শান্তির কথায় বিচিত্রভাবে সেই কথা মনে পড়েছে তার।

চৌদ্দ

অশ্বত্থ গাছটি এখনও প্রায় অটুট মহিমায় বেঁচে রয়েছে।

এ গাছটি এ-অঞ্চলে দেববৃক্ষের সমাদর লাভ করেছে। এ গাছের ডাল কেউ কাটে না। কাটতে নেই, পোড়াতে নেই। ঝড়ে মধ্যে মধ্যে ডাল ভেঙেছে, ভাঙা ডালের গোড়ায় গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে, আবার পাশ থেকে নতুন ডাল গজিয়েছে। কয়েকটা ভাঙা ডালের গোড়া আবার বিচিত্রভাবে বাকলে ঢাকা পড়েছে, সে জায়গাগুলি আবের মত ফুলে রয়েছে। ছায়ানিবিড় তলদেশ; ছায়ার জন্য ঘাস জন্মায় না। গাছের গোড়ায়

রাশিকৃত মাটির প্রদীপ জমা হয়ে রয়েছে। প্রতিটি প্রদীপ প্রদীপদাতার অন্তরের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য বহন করছে। কেউ ক্রোধে, কেউ ক্ষোভে, কেউ হিংসায়, কেউ বা হতাশায় আত্মহত্যার প্রবৃত্তির তাড়নায় আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হয়ে এসেছে এখানে, প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছে—আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। রাত্রির অন্ধকারে কেউ এসেছে ছুটে, কেউ এসেছে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লান্ত পদক্ষেপে। কেউ এসেছে বার বার থমকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, বার বার আশপাশ লক্ষ্য করেছে—কেউ দেখছে না তো!

কত প্রবাদ, কত গল্পই না প্রচলিত আছে!

কে নাকি স্ত্রীকে অবিশ্বাসিনী সন্দেহ ক'রে দায়ের কোপে খুন ক'রে সেই দা হাতেই সকল লোকের সুমুখ দিয়ে এখানে এসে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে সোজা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন একজন। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ডাঙাপাড়ায় ছিল বাড়ী; বছরে এক-আধবার তাঁকে এখানে দেখা যেত। দেখলেই লোকে বুঝতে পারত, কোন মহলে হয় প্রজার ঘর পুড়েছে, নয় কোথাও দাঙ্গা হয়েছে প্রজার সঙ্গে বা শরীক জমিদারের সঙ্গে। নয়তো কোন প্রজা বা কর্মচারী চিরকালের মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কোথাও কোন খুন হ'লে পুলিশ এই জায়গাটার উপর নজর রাখে। কেউ প্রদীপ জ্বালতে আসে কি না সন্ধান করে।

বিশ্বেশ্বরী এখানে এসেছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে। প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে সেই প্রদীপের শিখায় নিজের আঁচলে আগুন ধরিয়েছিল। হয়তো মনের ক্ষোভনিবৃত্তির প্রার্থনা নিয়েই এসেছিল—হয়তো মনের গভীর অন্তস্তলে বাঁচবার কামনা ছিল, কিন্তু প্রার্থনা সত্ত্বেও প্রদীপ জ্বেলে দিয়েও সে ক্ষোভের দুর্যোগের অবসান হয় নি, আত্ম-সম্বরণ করতে পারে নি; আগুন ধরিয়েছিল কাপড়ের আঁচলে। কিংবা হয়তো আত্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার অন্ধ বিশ্বাসেই শুধু প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিল, তারপর পুড়ে মরেছিল।

গাছের তলায় বসল গৌরীকান্ত। দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার ন' জানালে।

সামনে বিস্তীর্ণ অবারিত কৃষিক্ষেত্র। ধানের মাঠ। গ্রীষ্মের শস্যহীন মাঠ ধূসর বর্ণ বিস্তার ক'রে দূর দিগ্বলয়ে অজয় নদীর তটভূমির প্রান্তদেশে গিয়ে ঠেক খেয়েছে। মধ্যে মধ্যে চষা মাঠে ধূলো উড়ছে। ডাইনে বাঁয়ে মাঠগুলি দিগন্তপ্রসারী নয়, মাইলখানেক দূরে দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে একটা টিলার উপর ঘন গাছপালার আবরণের মধ্যে একখানা সাঁওতাল পল্লী। ভারী চমৎকার দেখায়। টিলাটার নাম তুরুকডাঙা। প্রবাদ, তুর্কীরা এখানে এসে ওইখানেই প্রথম শিবির স্থাপন করেছিল। ওই শিবির থেকেই এই অঞ্চল জয় ক'রে নবগ্রামের ঠাকুরপাড়ায় ছোটখাটো একটি নগর স্থাপন করেছিল। ওই ঠাকুর-পাড়াতেই ছিল—পরমানন্দ ঠাকুরের সন্তান-সন্ততিদের বাস। ওই ছিল তাঁর আদি ভিটা।

তুর্কী-বিজয়ের কাহিনীও বিচিত্র। কাহিনী একটি নয়—দু-তিনটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি কাহিনী বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। এখানে এক হিন্দু রাজা ছিলেন—পরম ধার্মিক। একদা তুর্কীরা এসে তুরকডাঙায় শিবির স্থাপন ক'রে রাজাকে বশ্যতা স্বীকার ও ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বললে। রাজা প্রত্যাখ্যান করলেন। যুদ্ধ হ'ল, সে যুদ্ধে তুর্কীরা প্রথমটা হলেন পরাজিত। রাজা বললেন—পরাজিত হয়েছ, কিন্তু আমি তোমাদের ধ্বংস করতে চাই না। তোমরা এদেশ থেকে চ'লে যাও। তুর্কী-প্রধান একদিন সময় চাইলেন। বললেন—রাজা, আমরা যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত, অনেকে আহত, সুতরাং একদিন সময় প্রার্থনা করি। রাজা সেনাপতিদের আপত্তি সত্ত্বেও তাদের সময় দিলেন। নগরে বিজয়োৎসব হতে লাগল। উৎসব যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নগরবাসীরা ক্লান্ত, তখন অকস্মাৎ নবগ্রামের প্রান্তভাগে বেজে উঠল তুর্কী রণবাদ্য। ক্লান্ত, আসবপানে মত্ত নগরবাসীরা সচকিত

দেখলে—যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন ক'রে তুর্কীরা রাত্রে নগর আক্রমণ করেছে। শুধু তাই নয়—তারা দেখলে তুর্কী সেনার সম্মুখভাগে জ্বলছে সারি সারি মশাল; মশালগুলি মানুষে বহন করছে না। চতুর তুর্কীরা সামনে সারিবন্দী গরুর শিঙে মশালগুলি বেঁধে দিয়েছে। গো-বাহিনীর পিছনে আসছে তুর্কী সৈন্যদল। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে শরবর্ষণ করছে। নগরবাসী সৈন্যদল এর মধ্যেও যে যা অস্ত্র পেয়েছিল তাই নিয়ে বাধা দিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে অস্ত্র তাদের হাতেই থেকে গেল; কি ক'রে শরবর্ষণ করবে? শূল বা ভল্ল বা অগ্নিগোলক বা প্রস্তরশেল নিক্ষেপ করবে? গোবধ হবে যে! সুতরাং তারা হাতের অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তুর্কীর অস্ত্রমুখে প্রাণ দিলে; রাণীরা এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা আগুনে ঝাঁপ দিলেন। তুর্কীরা রাজ্য জয় ক'রে নিলে।

আর একটা প্রবাদ, রাজার ছোট ভাই ছিলেন তুর্কী অভিযানের মূলে। ছোট ভাই ছিলেন বিলাসী, ধর্মকেও তিনি মানতেন না। রাজা তাঁকে এক বিশেষ অপরাধে নির্বাসিত করেন। ছোট ভাই রাগের মাথায় চ'লে যান সেকালের রাজধানী গৌড়ে। সেখানে সুলতানের শরণাপন্ন হন এবং সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁকে রাজ্য উদ্ধার ক'রে দিলে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করবেন। সুলতান তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে সঙ্গে তুর্কী সৈন্য দিয়ে পাঠিয়ে দেন এবং সঙ্গে দেন এক ফকীরকে। রাজ্যজয় হ'লে তিনিই ছোট কুমারকে ইসলামে দীক্ষিত করবেন এবং তিনি হবেন এখানকার ধর্মগুরু। এখানকার পথ-ঘাট, সৈন্য-বাহিনীর তথ্য, সবই ছোট ভাইয়ের জানা ছিল। সুতরাং যুদ্ধজয়ে কষ্ট পেতে হয় নি। আরও প্রবাদ, রাজা নাকি মৃত্যুকালে ছোট ভাইকে অভিশাপ দিয়ে যান—তুই মুসলমান হয়েছিস, কিন্তু হিন্দুর অখাদ্য মুসলমানের খাদ্য খেতে তুই পাবি নে। খেলে তোর দুরারোগ্য ব্যাধি হবে। তাই নাকি হয়েছিল। ফলে তিনি শেষজীবনে হিন্দু যোগীর মতই জীবন যাপন করতেন। বৈষ্ণবের মতই তিনি নিরামিষাশী ছিলেন।

এই প্রবাদের আর একটা রূপ আছে। এতে গোড়াটা ঠিকই আছে। শেষটা একটু অন্যরকম। সেটা হ'ল ছোট ভাই মুসলমানের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার ক'রে রাজা হলেন, তবে মুসলমান হলেন না, সে প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন নি। দেশের প্রজা-সমাজের বড় অংশ কিন্তু বিরূপ হয়ে দাঁড়াল। তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করলে না, রাজা ব'লে মানতেও অস্বীকার করলে না; রাজকর যথানিয়মে আদায় দিলে; কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকলাপে স্বধর্মাবলম্বী রাজার অর্থাৎ হিন্দুরাজার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলে। এমন কৌশলে এ কাজ তারা করলে যে, রাজা তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারলেন না। সে এক কূটনীতিবিদ ব্রাহ্মণের প্রতিভার গল্প। তিনিই তখন সমাজপতি। উচ্চবর্ণের মধ্যে অসাধারণ তাঁর প্রভাব। তাঁরই এক জ্ঞাতিপুত্রের বিবাহে তিনি এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত করলেন। বিবাহ হয়েছিল এই রাজ্যের মধ্যেই অন্য একটি গ্রামে। সেখানে তিনি ঢেলাইচণ্ডী বাবদ রাজপ্রাপ্য পাঠালেন। ঢেলাইচণ্ডী বিচিত্র প্রথা। সে প্রথা নবগ্রাম অঞ্চলে আজও বিলুপ্ত হয় নি। বরপক্ষ যে গ্রামে বিবাহ করতে আসে সেই গ্রামের ছেলেরা বরযাত্রীর আসরে ও বাসায় আজও ছোট ছোট ঢেলা ছুঁড়ে মারে। বরকর্তা কিছু টাকা দিলে তবে তারা নিবৃত্ত হয়। আগের কালে—তিরিশ বৎসর আগেও এই টাকা প্রাপ্য ছিল গ্রামের জমিদারের। সে সময় জমিদারের নগদী-গোমস্তা উপস্থিত থাকতেন। তাঁরাই করতেন এই ঢেলাইচণ্ডী দলের নেতৃত্ব। পাত্রপক্ষের অবস্থা অনুযায়ী দাবী জানাতেন। গৌরীকান্ত একশো টাকা দাবীও শুনেছে। মতান্তরে অনেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষের কথাও জানে। ঢেলাইচণ্ডীর টাকার মোটা অংশ নিতেন জমিদার, একাংশ পেত গ্রামের ছেলেরা। সেকালে অর্থাৎ ওই রাজার কালে এই প্রাপ্য পেতেন রাজা এবং তার একাংশ পেতেন রাজার ফৌজদার। কূটনীতিবিদ ব্রাহ্মণ কন্যাপক্ষের গ্রামে এসেই রাজার দরবারে ঢেলাইচণ্ডী পাঠালেন। বিরাট পরাতে নানান খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পরাত সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরাতের ঢাকনি খুলতেই রাজা চমকে

উঠলেন। পরাতের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে যাবনিক খাদ্য মিশানো রয়েছে—নাকি পেঁয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া ছিল বা মিশিয়ে দেওয়া ছিল। শুধু তাই নয়, মাংসের জন্য দুটি ছাগবৎস পাঠিয়েছেন—সে দুটি পাঠা নয়, খাসী। পরাতের সিধা দু ভাগে ভাগ করা; এক ভাগ রাজার জন্য, অন্য ভাগ সেনাপতির জন্য। সেনাপতি তখন একজন পাঠান, সুলতানের লোক। তিনি সে উপঢৌকন দেখে খুসী হলেন এবং নিজে রাজার অংশ রাজ-অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ গ্রহণ করলেন। রাজা মুখে কিছু বলতে সাহস করলেন না, প্রত্যাখ্যানও করতে পারলেন না, গোপনে সে-গুলি জলে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। এমনি ভাবে প্রতি বিবাহেই রাজা যাবনিক খাদ্যের সিধা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তারপর একদিন শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে রাজার প্রাপ্য জল-পাত্রের বদলে এল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকেও রাজা সমাজ-পাতিত্য-দোষে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। তখন আর রাজার ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ইসলাম গ্রহণ করলেও কিন্তু রাজবংশ দীর্ঘকাল হিন্দুর অখাদ্য গ্রহণ করেন নি; হিন্দুর যোগধর্ম বিস্মৃত হন নি। রাজার সঙ্গে রাজার অনুগত প্রজারাও একে একে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আর একটা প্রবাদ আছে—সে প্রবাদ অতিবিচিত্র। সে প্রবাদ নাকি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তামার পাতে খোদাই করা লিপির ভিত্তি। এক দিকে প্রাচীন নাগরী অক্ষরে লেখা। অন্য দিকে আরবী হরফে লেখা লিপি। সে তাম্রশাসন বা সনদ আছে ওই ঠাকুর বংশের উত্তরাধিকারীর কাছে। সে দেখেছিলেন ওই শান্তির বাবা সন্তোষবাবু। শুধু ওই তাম্রশাসনই একমাত্র ভিত্তি নয়, ওই তাম্র-শাসনের নাগরী হরফে লেখা সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রতিলিপি সন্তোষ শর্মার বংশের কুলপঞ্জিকার একটি পৃষ্ঠাতেও নাকি লিপিবদ্ধ করা আছে। তার সঙ্গে একটি বিচিত্র উপাখ্যানও আছে। সন্তোষ পিসেমশাই তাই নিয়ে একখানি কাব্য রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর তাঁর অভিপ্রায় হয়েছিল নবগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখবেন একখানা

মহাকাব্য। কিন্তু সে হয়ে ওঠে নি। তিনি পারেন নি শেষ করতে। এই তাম্রশাসন এবং তাঁদের বংশলতা পুঁথি থেকে তিনি নিঃসংশয়ে জেনেছিলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষেরা এই নবগ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। ওই মুসলমান অভিযানের সময়েই তাঁরা চ'লে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। এবং তাঁরা নাকি নিঃসংশয়ে ওই নাগের মাঠের নাগের গুরু কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভুর শিষ্য পরমানন্দ ঠাকুরের প্রতিপক্ষ শাক্ত ব্রাহ্মণ-বংশের উত্তরাধিকারী

* * *

গৌরীকান্তের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

পিছনে কিসের একটা শব্দ হ'ল। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে পরম বৈচিত্র্যে বিচিত্র মানুষের মন আলোর চেয়েও দ্রুতগামী, তার চেয়েও অবাধতরগতি; সীমায় সে অনন্তের পথে ধেয়ে চলে, কালে সে অতীতে শত সহস্র বৎসরের তমিস্রা ভেদ ক'রে উপনীত হয়, তার সঞ্জীবনী স্পর্শে অতীতের কঙ্কাল কায়া গ্রহণ করে; নরকপালের শূন্য অক্ষিকোটরে চোখে জেগে ওঠে, সে চোখে পলক পড়ে। ভয়াল মুখগহ্বর দুখানি রক্তাভ অধরোষ্ঠে জীবন্ত হয়ে কথা কয়। দূর ভবিষ্যতের আগামীকালের মানুষের সঙ্গে তার বাক্‌বিনিময় হয়। আবার মুহূর্তে তার ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারের যে কোন একটিতে ছোট্ট একটি টোকা পড়লেই সে বর্তমানে ফিরে আসে। ওই একটি শব্দে সে বর্তমানে ফিরে এল, মুখ ফিরিয়ে দেখলে মাঠের পথে তার পিছন দিকে একখানা গাড়ী এসে থেমেছে। গাড়োয়ান গাড়ীখানা নামাচ্ছে। বোধ হয় গাড়োয়ান গাড়ী থামাবার জন্য জোয়ালের পাচন দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করেছিল। তারপর শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে নেমেছিল। ছই-ওয়ালা গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে একটি মহিলা। মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকালে না সে। কিন্তু থান কাপড় এবং শুধু হাত তার ওই চকিত দৃষ্টির মধ্যেও ধরা না-পড়া হ'ল না। কোন বিধবা মহিলা। এখানেই এসেছেন। মুহূর্তে তার অন্তরে চেতনা সচকিত হয়ে উঠল। এখানে এসেছেন? তা হ'লে প্রদীপ দিতে এসেছেন।

ক্রোধ-ক্ষোভ-হিংসার পীড়ন অথবা অনুশোচনার গ্লানি হয়তো অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে। প্রবীণা মহিলা। নইলে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে আসতেন না। কিন্তু তাকে উঠতে হবে। নইলে ভদ্র-মহিলার আত্মনিবেদনে ব্যাঘাত হবে। সে উঠল।

—কে? গৌরীদা?

চমকে উঠল গৌরীকান্ত। তাকে ডাকছেন? গৌরীদাদা ব'লে? কে? সে ফিরে মেয়েটির মুখের দিকে চাইলে। বিস্ময়ের তার অবধি রইল না। কে? অন্তরঙ্গ পরিচয়ের আভাস তার পা থেকে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে মাখানো রয়েছে; কুয়াশা-ভরা সন্ধ্যায় কুয়াশার আড়ালে একটি আলোর শিখার আভাসের মত। কুয়াশার সর্বাঙ্গে আলোর আভাস ভাসছে, কিন্তু প্রদীপটিকে দেখা যাচ্ছে না। কে মেয়েটি? তার সাদা সিঁথির দুপাশের চুলের ঢেউগুলি চেনা, আয়ত চোখের তাম্রাভ তারা দুটি চেনা, নাক চিবুক ঠোঁট সব চেনা। তবু ঠিক মনে আসছে না। দুটি মোটা ভুরুর মাঝখানে একটি নীল উল্কির টিপ। এইবার মনে প'ড়ে গেল। রমা!

—রমা!

—চিনতে পারলে তা হ'লে?

—পেরেছি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গৌরীকান্ত বললে—অনেককাল ব'য়ে গেছে। তার উপর থান কাপড় পরেছ। প্রথমটায় চিনতে পারি নি। আর এখানে এই সময়ে তুমি আসবে—

—আজ যে বোশোখী শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ। পূর্ণিমায় ধরম পুজো।

—ধর, আমাকে একটুকুন ধর গো। শুনছ?

গাড়ীর ভিতর থেকে নামছিল একজন বৃদ্ধ। অনেক বয়স, কিন্তু বয়সের চেয়ে দেহ আরও জীর্ণ। এবার আর চিনতে দেরী হ'ল না গৌরীকান্তের। যোগীপাড়ার ধর্মঠাকুরের সেবাইত পুরোহিত রামহরি চক্রবর্তী। চক্রবর্তীরা এ অঞ্চলের অবস্থাপন্ন লোক। যোগীপাড়ার চক্রবর্তীদের ধর্মঠাকুরের কল্যাণে আয়ের ঘরে বৃহস্পতি অচল হয়ে ব'সে

আছেন ; বাঁধা পড়েছেন। যোগীপাড়ায় ধর্মরাজের স্বপ্নাগু চর্মরোগের ওষুধ এখানে বিখ্যাত। লোকে বলে, কুষ্ঠ পর্যন্ত ভাল হয়। কথাটা অতিরঞ্জন নয়। গৌরীকান্ত জানে, দেখেছে। তার নিজেরই ছেলে-বয়সে পায়ে কাউর ঘা হয়েছিল ; এই চক্রবর্তীই তাকে দেখে গিয়েছিলেন। ধর্মঠাকুরের ওষুধেই তার পায়ের ঘা ভাল হয়েছিল। একটা তেল লাগাতে হ'ত। সে তেলের গন্ধটা এখনও তার মনে রয়েছে। এই মুহূর্তে যেন নাকের সামনে ঘুরছে। তার সম্পর্কে ভাইপো শিবদাসের ডান বগলে শ্বেতি হয়েছিল। তার বয়স তখন নিতান্ত অল্প। শিবদাসের শ্বেতি ভাল হয়েছিল ওই ধর্মঠাকুরেরই ওষুধে। শনি মঙ্গলবারে প্রচুর যাত্রী আসে য়োগীপাড়ায়। আমদানিও প্রচুর।

রমা হাত ধ'রে নাবালে চক্রবর্তীকে। চক্রবর্তীর পিঠটা বেঁকে গেছে। চোখের দৃষ্টি অতি ক্ষীণ বোধ হয়। প্রশ্ন করলে—কার সঙ্গে কথা বলছ? কে?

—গৌরীকান্তদাদা।

—কে?

কানেও খাটো হয়েছে চক্রবর্তী।

—রাধাকান্তবাবুর ছেলে। সেই বই-টই লেখে ; লোকে নাম করে খুব!

—কই? আমি যে ওর ছেলেকালে কাউর ঘা ভাল করেছি গো। কই?

ভাল আছেন?—ব'লে এগিয়ে এল গৌরীকান্ত। নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে হাত নামিয়ে নিলে সে। পরমুহূর্তে হেঁট হয়ে প্রণাম করলে।

চক্রবর্তীরা আগের কালে ব্রাহ্মণ-সমাজে সমপর্যায়ে চলতি ছিলেন না। তাঁরা বর্ণব্রাহ্মণও ঠিক ছিলেন না। তাঁরা চিরকাল যোগীপাড়ার ওই ধর্মঠাকুরের পাণ্ডাদের পুরোহিত। ধর্মঠাকুরের পাণ্ডারা একটি বিচিত্র সম্প্রদায়। ওদের ওই সম্প্রদায়টি গোঁসাই নামে এ অঞ্চলে

পরিচিত। সংখ্যায় কম। শিব, ধর্মরাজ, শীতলাদেবীর পাণ্ডাগিরিই এদের কাজ। যেখানে এই দেবতা আছেন সেখানেই দেবতাকে আশ্রয় ক'রে এরা আছে। এরা গলায় মালার মত পৈতে ধারণ করে, আবার নিজেরা লাঙল ধ'রে চাষও করে। চক্রবর্তীরা এদের সমাজের পুরোহিত। সেই সূত্রে ধর্মরাজের পূজার অধিকারও তাঁর। পাণ্ডারা দেবসেবার অন্য কাজ করে। আগেকার কালে চক্রবর্তীদের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজের আদান-প্রদান ও পংক্তি-ভোজন তো ছিলই না, হুঁকোও চলত না। ঠিক সেই কারণেই গৌরীকান্ত প্রথমটায় প্রণাম না ক'রে হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়েছিল। কালক্রমে অবস্থার গৌরবে চক্রবর্তীরা ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। শুধু অবস্থাই নয়, একালে চক্রবর্তীদের বাড়ীর ক'জন ছেলে লেখাপড়া শিখেছে। চক্রবর্তী-বাড়ীর কয়েকটি মেয়ে গরীব ব্রাহ্মণ-ঘরে টাকা সঙ্গে নিয়ে বধূবেশে এসে প্রবেশ করেছে। কয়েকটি কন্যাদায়পীড়িত ব্রাহ্মণ ওদের ঘরে কন্যাদান ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। রমা তেমনি একটি কন্যা। রমার মা এই গ্রামের এক দরিদ্র কুলীনকন্যার দৌহিত্রী—কন্যার কন্যা। রমার মাতামহী বিধবা হয়ে রমার মাকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। বাপ তখন বিগত। ভিটে বিক্রি হয়ে গেছে। মাও ছিলেন না। নিরাশ্রয় বিধবা গ্রামে এসে দাঁড়িয়ে সেকালে ফিরে যান নি। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল সে আমলে পেশাদার কুলীনের সঙ্গে। আমলটা বিশ্বেশ্বরীর আমলেরও আগে। রমার মায়ের ওই এক সন্তান—রমা। মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই রমার মা বিজয়দের বাড়ীতে রান্নার কাজ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন রমা নিতান্তই ছোট। বছর তিন-চার বয়স। ওদের বাড়ীতেই রমা বড় হয়েছে। কিশোরী রমার সে রূপ আজও জ্বলজ্বল করছে গৌরীকান্তের চোখের সামনে। কিশোরী রমা বোধ হয় বিজয়কে ভালবেসেছিল। গৌরীকান্তকে সে বড় ভক্তি করত। গৌরীকান্তের মা রমাকে

লেখাপড়া শেখাতেন। শেষের দিকে গৌরীকান্তের কাছে রমা আসত ফার্স্ট বুক নিয়ে। গৌরীকান্তের মা ব'লে দিয়েছিলেন—শেখা না একটু আধটু ইংরিজী। ইংরিজীর কাল এটা। এমন চেহারা ওর, ভাল লেখাপড়া শিখলে ওর ভাল বিয়ে হতে পারবে।

বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত রমা। ওটা ছিল ওর স্বভাব। গৌরীকান্ত আপন মনে কবিতা লিখত, পড়ত, সে এসে এমনি ভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এক সময় গৌরী-কান্ত চোখ তুলে তাকে দেখে বলত—ব'স্। বই খুলে পড়্। পড়া ধরব আমি।

তারপর আপন মনে আবার লিখত বা পড়ত। রমা কিন্তু পড়ত না। বসত, ব'সে বই খুলে নীরবে তাকিয়ে থাকত।

—পড়্।

—পড়েছি।

—ধরব?

—ধর।

—প'ড়ে যা। কি লেখা আছে?

—এ সেলাই ফকোস মেট এ হেন।

—সেলাই ফকোস নয়, স্লাই ফক্স্। এস্ এল্ ওয়াই—স্লাই, স্লাই মানে চতুর—চালাক। তোর মত হাবাগোবা নয়। হ্যাঁ। আর এফ ও এক্স—ফক্স, মানে খ্যাঁকশেয়ালী। তোর মত ভোঁদাশেয়ালী নয়।

আজও সব মনে রয়েছে গৌরীকান্তের। সেই বছরই গৌরী-কান্তের মা মারা গেলেন। রমার মায়েরও জবাব হয়ে গেল বিজয়দের বাড়ী থেকে। রমার মা স্পর্ধা প্রকাশ করেছিল। ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে রমার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ের কথা তুলেছিল। বিজয়ের পিসীমা তখন বেঁচে। তিনি ছিলেন বহ্নিশিখার মত ক্ষমতাশীলা। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন।

রমার মা সেই বৎসরই রমার বিয়ে দিয়েছিল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে। বিজয়দের থেকে অনেক ভাল অবস্থা চক্রবর্ত্তীদের। বলেছিল—জমিদারী না জমাদারী। আর কুল? কুল তো ট'কো কুল, তাকেও পচ ধরেছে। চক্রবর্ত্তীরা বামুন তো বটে। ঘরে ভাতও আছে। সোনার চুড়ি না পরুক, শাঁখা প'রে পেট পুরে খেয়ে দশজনের সোনার চুড়ি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়ে মহাজনী করবে। একটু খুঁত—দ্বিতীয় পক্ষ, তা হোক। কি বা বয়েস? পঁচিশ বছর। তা হোক।

রামহরি চক্রবর্ত্তীর ছোট ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রমার। রামসদয় এখানকার ইস্কুলেই পড়ত একসময়। ফার্স্ট ক্লাসেই বছর কয়েক কাটিয়ে পড়া ছেড়েছিল। কালো রঙ, কুৎসিত দেখতে ছিল রামসদয়; সামনের দাঁত দুটো ছিল উঁচু। কিন্তু সৌখীন লোক ছিল সে। বাইসিক্ল চ'ড়ে বেড়াত। সেন্ট মাখত।

প্রণাম পেয়ে রামহরি একটু অভিভূত হয়ে গেল। সে প্রণাম প্রত্যাশা করে নি। বৈষয়িক অবস্থার গৌরবে সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজে আসন পেয়েছে রামহরি, কিন্তু নতুন অবজ্ঞা নতুন ঘৃণায় সে অবজ্ঞাত ঘৃণিত। সে ধর্মঠাকুরের পুরোহিত, তরুণ সমাজ তাকে নতুন ক'রে ঘৃণা করছে। রামহরির ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। আত্মসম্বরণ ক'রে শীর্ণ হাতখানি তুলে বললে—কত নাম শুনি বাবা তোমার! কত নাম! তা ব'সে ব'সে ভাবি—সেই ছোট ছেলেটি পায়ে কাউয়ের ঘা। তা তখন কি জানতাম! বেঁচে থাক। দীর্ঘায়ু হও।

রমা বললে—কম্বল পেতে দি, আপনি বসুন। ব'সে কথা বলুন। কথা বলতে বলতেই রমা একখানা কম্বল গাড়ী থেকে বের ক'রে বিছিয়ে দিলে গাছটির ছায়ামণ্ডলের এক প্রান্তে। জ্যাঠশ্বশুরকে হাতে ধ'রে এনে বসিয়ে দিলে। গৌরীকান্তকে বললে—বসুন, গৌরীদা। শুনেছিলাম আপনি দেশে ফিরেছেন। যেদিন প্রথম শুনি ইচ্ছে

হয়েছিল, ছুটে যাই, দেখা ক'রে আসি। কিন্তু পথ তো কম নয়, কম ক'রে দেড় কোশ। তার ওপর বাবা ধরমের পুজোর পালা এবার বোশেখ মাসে আমার। সকাল বিকেল একদিনের তরে ছুটি নেই। তবে আজ দেখা ক'রে যেতাম।

রামহরি চীৎকার ক'রে বললে—কি বলছ?

রমা বললে—ওঁকে বসতে বলছি। চীৎকার ক'রে বললে।

বৃদ্ধ মুখের দিকে অপলক চোখে সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—অনেক কথা বললে যে! রমার ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল, কয়েক মুহূর্তের জন্য তার চোখে ফুটে উঠল বাল্যকালের সেই বিচিত্র নিষ্পলক বিচিত্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কি বলে বোঝা যায় না। তারপর হেসে বললে—আপনাদের নিন্দে করি নি। বসুন গৌরীদা।

—বসব?

—হ্যাঁ, বসবেন। আপনার বাড়ী যাওয়ার কষ্টটুকু লাঘব করুন আমার।

—সে তো হয়েইগেছে রমা। দেখা তো হয়েই গেল।

—না। হয় নি।

রমা কাজ করতে করতে কথা বলছিল। গাড়ীর ভিতর থেকে তিনটে বড় বড় ডালা বের ক'রে নামিয়ে রাখলে। ডালাগুলিতে দেবপূজার উপকরণ সাজানো। একটি ডালায় অনেকগুলি প্রদীপ। একটা ভাঁড়, একখানা রেকাবীতে একগোছা কস্তা সুতো। ভাঁড়টায় তেল আছে, কস্তাগুলি দিয়ে সলতে হবে।

—কিছু বলবে আমাকে?

হাসলে রমা। বললে—কি বলব? তবে—। থামল সে। গাড়ীর ভিতর থেকে একগাছা নতুন নারকেল কাঠির ঝাঁটা বের করলে। একটা ঘড়া আর দুটো বালতি নামালে। গাড়োয়ানটা ইতিমধ্যে কোদাল ধ'রে গাছের তলায় রাশিকৃত প্রদীপগুলি টেনে একটা ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে তুলে খানিকটা দূরে বিপুল একটা প্রদীপস্তূপের

উপর ফেলে আসছিল। বছর বছর এমনি ক'রেই প্রদীপগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। ওই প্রদীপস্তূপের তলায় কত যে প্রদীপ জমা হয়ে আছে তার হিসাব নেই। সেই নাগের মাঠে মহানাগের তিরোধান-দিবস থেকে দেওয়া প্রদীপ, তার সংখ্যা কত, পরিমাণ কত—কে বলবে? গ্রাস শুধু কালই করে না, মৃত্তিকারূপিণী স্থানও গ্রাস করে।

বালতি দুটো এগিয়ে দিয়ে রমা গাড়োয়ানকে বললে—আগে বালতি কয়েক জল এনে ছিটিয়ে দে। ধুলো উড়ছে। তা ছাড়া জল পেলে ওর ভেতরের পোকা-মাকড়গুলো অনেক বেরিয়ে যাবে। কথাগুলি তাকে ডেকে একটু উচ্চকণ্ঠেই বললে রমা। বৃদ্ধের কানে গেল। বৃদ্ধ বললে—হ্যাঁ। প্রাণীহত্যে যেন না হয়। তারপর রমার দিকে চেয়ে বললে—সে ছোঁড়া দুটো আসছে?

—তারা গাঁজার দোকানে ঢুকছে। বেরিয়ে গাঁজা না-খেয়ে তারা আসবে? হাসলে রমা।

—কারা?

—আমাদের দুই শরীকের বাড়ীর ছেলে।

—কপাল! বুয়েচ—কপাল! বৃদ্ধ কপালে হাত দিলে।—ছেলেদের যেগুলোন নেকপড়া শিখলে সেগুলোন দেবকর্ম করবে না। টাকার ভাগ নিতে দোষ নাই, দেবকর্মে দোষ। ব-কলমে লোক দিয়ে সারবে। আর যেগুলোন দেবকর্ম করতে আসবে, তারা গাঁজা খাবে, ভাং খাবে। একেই বলে—কলির চার পো, বুয়েচ? আঃ, এ কুলে কি সাধনবস্তু ছিল, তা কেউ একবার উল্টে দেখলে না, নেড়ে চেড়ে যাচাই করলে না। বাবা—

এবার গৌরীকান্তের দিকে তাকিয়ে বললে—'যা আছে ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। ঠিক তাই বাবা। তা, অক্ষয় ভাণ্ড উল্টে কেউ দেখলে না, হাত ঠেকিয়ে শুঁকলে না, জিভে দিয়ে দেখলে না—অমৃত কি বিষ!

পনের

"যা আছে ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।"

কথাটা চকিত ক'রে তুলেছিল গৌরীকান্তকে। তার মন চকিতে উপনীত হয়েছিল অনাবিষ্কৃত অরণ্যের মত এক বিচিত্র যুগে। তার মন ইতিহাসের মহানগরীর প্রত্যন্ত সীমায় একটি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা ধ্বংসস্তূপের সামনে যেন দাঁড়িয়ে গেল। ইট কাঠ পাথরের ধ্বংসস্তূপ নয়, ভাঙা মাটির স্তূপ। হঠাৎ যেন চোখে পড়ল মাটির ভাঁড়, তার গায়ে লেখা—"যা আছে ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।"

রমা তার মনকে ধ'রে টানলে আবার।

সে প্রদীপগুলিতে সলতে দিয়ে সাজাচ্ছিল। দৃষ্টি তার প্রদীপগুলির দিকে, মুখ তার স্বাভাবিক ভাবেই অবনত। গাড়োয়ানটি বালতি হাতে জল আনতে যাচ্ছিল, মুখ তুলে তাকে একবার দেখে নিয়ে রমা অবনত মুখে বললে—বুড়ো মানুষ বকে বড় বেশী। এখন ছত্রিশ রকম বচন আওড়াবে। কিছু মনে করবেন না যেন ওঁর কথায়।

তারপর যেন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে বললে—সত্যিই দেশে ফিরে এলেন? থাকবেন?

—ঠিক কিছু করি নি।

—থাকুন। লোকেরা খুসী হবে। লোকেদের উপকারও হবে।

এ কথার কি উত্তর দেবে গৌরীকান্ত? তাই উত্তরের জন্যই উত্তরে বললে—তুমি খুসী হবে?

—আমি? আবার একবার মুখ তুলে তাকালে রমা। তার কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা। ভ্রূর কুঞ্চনে প্রশ্ন, চোখের দৃষ্টি উদাস অথচ প্রশ্নসমাকুল। সত্যই সে যেন প্রশ্ন করছিল, কিন্তু নিজেকে অথবা তাকে, তা গৌরীকান্ত বুঝতে পারলে না। পরক্ষণেই বললে—হব বইকি। সেকালে বিজয়দার পিসী বকতেন, মনে হ'ত দেহখানা প্রাণটা বিষে জ'রে গেল, মনে হ'ত দেহ মন আগুনের

আঁচে ঝলসে গেল; ছুটে আপনাদের বাড়ী আসতাম। আপনার মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—চুপ, চুপ, কাঁদতে নেই, রাগতে নেই, মেয়েরা হ'ল পৃথিবী, সব সহ্য করতে হয়। রাগে দুঃখে বিচলিত হ'লেই সূর্য প্রদক্ষিণের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। রাগ চ'লে যেত, অভিমান হ'ত, চোখের জল কিন্তু বাঁধ মানত না। ঠোঁট দুটো থর থর ক'রে কাঁপত। আপনি বেরিয়ে আসতেন, কি নিজেই আমি এক সময় আপনার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়াতাম, চোখের জলের সঙ্গে মুখে হাসি ফুটে উঠত আমার। কেন, তা জানতাম না, বুঝতে পারতাম না।

একটু চুপ ক'রে রইল সে, তারপর হেসে বললে—হব বইকি খুসী। আজও খুসী হব। কিন্তু আমি খুসী হ'লে আপনি খুসী হবেন তো?

চমকে উঠল গৌরীকান্ত। তার মনে প'ড়ে গেল।

রমা বললে—আমার কথা তো দেশ-দেশান্তরে রটেছে আপনি শোনেন নি?

রমার তিরিশ বছরের জীবনে কলঙ্ক অনেক রটেছে। বিধবা হয়েছে আঠারো বছরে, তার পর বারো বছরে অনেকবার রটনা হয়েছে। রমাই হেসে বললে—আমি খুসী আপনি যদি খুসী হন, তবে লোকে আপনাকেও বাদ দেবে না।

বৃদ্ধ রামহরি পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল। বৈশাখের অপরাহ্ণে সন্ধ্যার আভাস জেগেছে। উত্তপ্ত ধূলিধূসর আকাশ; সূর্য লাল হতে সুরু করেছে। বায়ুমণ্ডলে আকীর্ণ ধূলোর আস্তরণে লাল আলো ধরা পড়েছে। মনোরম হয়ে উঠেছে গোধূলির আলো।

রামহরি বললে—বলি, দেখতে পাচ্ছ? আসছে? অ্যাঁ? লম্বা টানে টেনে প্রশ্ন শেষ করলে সে।

—দেয়াশীরা?

—হ্যাঁ। আসছে?

—আসবে বইকি, ঠিক আসবে। ব্যস্ত হবেন না।

—ছোঁড়া দুটো?

—তারা আসবে।

—কি বললে?

—তারাও আসবে।

গৌরীকান্ত উঠল।—আজ আমি চললাম রমা।

—যান, আর আটকাব না। আপনার চা খাবার সময় হয়েছে। কিন্তু গ্রামে থাকুন। যাবেন না আমাদের ছেড়ে।

গৌরীকান্ত বললে—ভেবে দেখব। আমি যাই।

—একটা কথা বলব। রাগ করবেন না?

—বল।

—ওই মেয়ে-স্কুলের মাস্টার—বঙ্গদেশের মেয়েটি, শান্তি—ওর সঙ্গে মেলামেশা করবেন না গৌরীদা।

রমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গৌরীকান্ত। তারপর বললে—কেন বল তো?

—আপনার মঙ্গল চাই গৌরীদা। তাই বললাম।

—অমঙ্গল হবে? কি ক'রে জানলে তুমি?

—কপিলদেবকে জানেন? তার একটা আড্ডা আমার শ্বশুর-বাড়ীতে।

বিস্ময়ের অবধি রইল না গৌরীকান্তের। যোগপুরে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের পূজারীদের বাড়ীতে কপিলদেবের আড্ডা!

রমা বললে—বিজয়দা তো জানে। বলে নি আপনাকে?

—আমি জানতে চাই নি।

দূরে ঢাকের শব্দ বেজে উঠল। দূরে পথে একখানা ঢাক আসছে। মধ্যে মধ্যে কাঠির মৃদু আঘাতে ট্যাং ট্যাং শব্দ তুলছে, থামছে, আবার শব্দ করছে—ট্যাং ট্যাং। জানিয়ে দিচ্ছে—ঢাক আসছে।

রামহরি বললে—ঢাক আসছে, নয়?

—হ্যাঁ। জগাই মাধাইও আসছে। মৃদুস্বরে বললে—আপনি যান গৌরীদা। আমি একদিন আসব। কিংবা জানাব আপনাকে।

ঢাকীকে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল দুই মূর্তি। হিন্দীতে 'দো মূরত্' বললে যা মনে হয়, যেমন ছবি ভেসে ওঠে—ঠিক তাই। একজনের মাথা ন্যাড়া, অন্যজন সর্বকেশী অর্থাৎ ঝাঁকড়া চুল। দাড়ি গোঁফ সব আছে; বয়স দুজনেরই বিশ থেকে পঁচিশের কোঠায়। দুজনেই গেরুয়া-ধারী। রামহরি চক্রবর্তীর শরীকের বংশধর একজন, অন্যজন শরীক নয়, তবে জ্ঞাতি। সম্পর্কে রামহরির নাতি। রমার দেওরপো ভাসুর-পো। দুজনেরই চোখ বেশ ঘোর রকমের লাল হয়ে উঠেছে।

রামহরি ঢাকীটার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল মুহূর্তে।—বলি, আসতে পারলি? সময় হ'ল? মনে ছিল না?

ঢাকী নবগ্রামের অনি বায়েন। সে আজও যোগীপুরের ধর্মরাজের ঢাকরাণ জমি ভোগ করে। সে জমিটা এই নাগের মাঠেরই এলাকাভুক্ত। পিতৃপুরুষক্রমেই নাকি ভোগ ক'রে আসছে। বিনিময়ে বৈশাখী শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা প্রতিপদ পর্যন্ত তাকে বাজনা বাজাতে হয়। তার আরম্ভ এই নাগের মাঠের গাছতলা থেকে। শেষও হবে এখানেই কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন। ধর্মরাজ নাকি এখানেই প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রবাদ। বলে—নাগ দেহত্যাগ করলে পরমানন্দ ঠাকুর তার সৎকার করলেন। অশ্বত্থবৃক্ষতল শূন্য প'ড়ে রইল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং ধর্ম তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন—পরমানন্দ, কলিযুগে সনাতনধর্ম কালধর্মে পীড়িত, ক্ষীয়মাণ। আমি শান্তির জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য মহানাগের তপস্যা-পবিত্র এবং অক্ষয়-পুণ্যাশ্রিত বোধিক্রমের বীজ থেকে উৎপন্ন এই মহাবনস্পতির পুণ্যময় ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলাম। এই বৃক্ষকে রক্ষা করবার আদেশও আমার উপর। মহানাগ তোমাকেই এই ভূমি দান ক'রে গেছেন। এই ভূমি তোমার এবং এই ভূমির উপর অবস্থিত এই বৃক্ষও তোমার। তোমার কাছে আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি।

পরদিন সকালে অদ্ভুত ঘটনা। দেখা গেল যোগীপুরের ধর্মরাজ-ঠাকুর পূজাবেদী থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। যোগীপুরে সেই অনাদিকাল থেকে ধর্মরাজ আছেন। যোগীদের গুরু চক্রবর্তীদের আদিপুরুষের তপস্যায় ওঁদের বাড়ীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোগীপুরের গোঁসাই বা দেয়াশীরা চিরকাল চক্রবর্তীদের শিষ্য; চক্রবর্তীদের প্রার্থনাক্রমে ধর্মরাজ ওদের হাতের সেবা এবং পূজা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শুধু ওদের পূজাই নয়, পূজার সময় অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশেষ পূজার সময় সর্বজাতির পূজা ও সেবা তিনি নিতেন। এবং যেহেতু তিনি ধর্ম—সেইহেতু যে তাকে আশ্রয় করতে চাইবে তাকেই তিনি আশ্রয় দিতে বাধ্য। বিধাতার নির্দেশ। এই কারণেই অর্থাৎ সব জাতির পূজা নেন ব'লেই অন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁর পূজা করতেন না। তাঁরা ধর্মকেও যারা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদ্যাশক্তির উপাসনা করেন। সে উপাসনায় ধর্মই এসে তাঁদের আশ্রয় করেন। ঠিক এই কারণেই চক্রবর্তীদের সঙ্গে তাঁদের চলত ছিল না। চক্রবর্তীরা অবশ্যই তার উল্টো কথা বলেন। তাঁরা বলেন—ওসব ওদের মিছে কথা। ধর্মই একমাত্র দেবতা। সব দেবতাই ধর্মের বিভিন্ন রূপ। সে সব অনেক তত্ত্বকথা। কিন্তু ধর্মরাজের মাহাত্ম্য চিরদিন তো উপেক্ষিত থাকে না, একদিন তার সত্য মাহাত্ম্য প্রচার হয়। প্রচার করেন নিজেই। নিজেই তিনি পূজাবেদী থেকে অদৃশ্য হয়ে অধিষ্ঠিত হন ওই নাগের মাঠের অক্ষয় অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায়। স্বপ্ন দেন পরমানন্দ ঠাকুরকে।

পরমানন্দ সকালে উঠেই গাছতলায় এসে ধর্মরাজকে প্রণাম জানালেন। পূজা দিলেন। বৈষ্ণবমতে বলিহীন পূজা। ওদিকে যোগীপুরে কান্নার রোল উঠেছিল। ধর্মরাজ অন্তর্হিত হয়েছেন। দেয়াশীরা মাথা কুটছিল। চক্রবর্তীরা আগুন জ্বেলেছিল, আগুনে ঝাঁপ দেবে চক্রবর্তী-বংশের প্রধান—ধর্মরাজের সিদ্ধ সাধক। খবর গিয়ে পৌঁছুল। চক্রবর্তীদের সিদ্ধপুরুষ বসলেন ধ্যানে। ধ্যান থেকে উঠে বললেন—সাজাও ডুলি,

বাজাও কাড়া নাকাড়া ঢাক শিঙে। চল ঘট মাথায় নাচতে নাচতে দেয়াশী ভক্তের দল নাগের মাঠে। আমাদের দেবতা ধর্মরাজ নাগের মাঠ জয় করেছেন। পরমানন্দের মত সাধকের ভুল ভাঙিয়ে তাকে জয় করেছেন, তার হাতের পূজা আদায় করেছেন। চল সব। দখল করব নাগের মাঠ, অশ্বত্থতলা। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দেয়াশীদের ধ্বনি উঠল, বলো—ধ-র্মো-র-জো। মিছিলের আগে আগে চলল ধর্মরাজের কাঠের ঘোড়া। 'ডান ঠ্যাঙটা লটোরপটোর বাঁ ঠ্যাঙটা খোঁড়া। বাবা ধর্মরাজের ঘোড়া।' আর সঙ্গে চলল একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ। বলি হবে অশ্বত্থতলায় ধর্মরাজের পূজায়।

পরমানন্দ তাঁর শিষ্যসেবক নিয়ে পূজা দিচ্ছিলেন। তাঁরা বাধা দিলেন। অনেক বাকবিতণ্ডা হ'ল দুই পক্ষের মধ্যে।

পরমানন্দ বললেন—ধর্ম মুক্তিস্নান ক'রে নূতন মন্ত্রে তপশ্চরণ করবার জন্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সুতরাং তিনি ফিরেও যাবেন না, তোমাদের ওই বলি-সংযুক্ত পূজাও গ্রহণ করবেন না। তোমরা ফিরে যাও।

চক্রবর্তীপ্রধান বললেন—মূর্খ! ধর্মের নূতন মন্ত্রও নাই, তার তপশ্চরণেরও প্রয়োজন নাই। তিনি আদিপুরুষ, তিনি শাশ্বত সনাতন।

পরমানন্দ বললেন—হয় প্রয়োজন। ধর্ম মধ্যে মধ্যে অধর্ম দ্বারা পীড়িত হন। কালক্রমে তাঁর সঞ্চরণক্ষেত্র লীলাক্ষেত্র জীর্ণ হয়, অধর্ম দ্বারা সংক্রামিত হয়। তখন তিনি নূতন পীঠে নূতন তপস্যায় বসেন। চৈতন্যময় পুরুষোত্তম তখন নূতন মন্ত্রে তাঁকে প্রবুদ্ধ করেন। শুষ্ক যজ্ঞকাণ্ডে, বিকৃত আচারে, পশুবলির হিংসার দ্বারা তোমরাই ধর্মকে পীড়িত করেছ।

চক্রবর্তীপ্রধান অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—হিংসা? হিংসা তুমি কাকে বল? তিনি বলেছিলেন—সৃষ্টির মধ্যে অবিরত বৃহৎ করছে ক্ষুদ্রকে গ্রাস, ক্ষুদ্র বিচিত্র পন্থায় বৃহৎকে করছে নাশ এবং গ্রাস। বলেছিলেন—ধর্ম নির্বিকার নির্বিকল্প। অন্ধকার এবং আলো,

জন্ম এবং মৃত্যু, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলা চলেছে। পশুবলি হিংসা নয়, হত্যা নয়, পশুজীবন থেকে মুক্তি। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে মোহাচ্ছন্ন মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়েছে, সেইহেতু এই কথা বলছ।

বাকবিতণ্ডার আর অন্ত ছিল না। এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন নবগ্রামের রাজা যে রাজাকে জয় ক'রে এখানে মুসলমান মিয়া-বংশ এখানকার নবাব হয়েছিলেন। উভয় পক্ষকেই নিরস্ত করলেন তিনি। অশ্বত্থতলেই বিচার সভা বসল। বৈশাখীর পূর্ণিমান্তে প্রতিপদ তিথি চলছে। প্রতিপদে ধর্মরাজের পূজা শেষ। বিচারেই স্থির হবে কোন্ মতে পূজা সমাপ্ত হবে। পূর্ণিমাতেই অবশ্য বলি হোম পূর্ণাহুতি হয়ে গিয়েছে। প্রতিপদে তিথির সামান্য পূজা মাত্র বাকী।

চক্রবর্তীরা শাস্ত্র খুলে দেখালেন ধর্মদেবতার পূজাপদ্ধতি, তার তন্ত্র। গোপন কুলাচার শুধু তাঁরাই জানেন, তাঁরাই মানেন। এই তন্ত্রে এই সাধনায় তাঁদের বংশের সিদ্ধপুরুষদের নাম করলেন, মহিমা বর্ণনা করলেন।

পরিশেষে বললেন—এ তন্ত্র পরমানন্দ যদি বা জানে, তবু মানে না। রাজা, পরমানন্দের বংশে এই তন্ত্রে সিদ্ধপুরুষের পুণ্য নাই। তার একমাত্র দাবী ওই নাগের শেষ অবস্থার কথা। রাজা, জীব মাত্রেরই বার্ধক্যে জীর্ণতা আছে। মৃত্যুও আছে। বুড়ো অথর্ব নাগের শেষ জীবনে যে কোন বেদিয়া এসেই তার সম্মুখীন হতে পারত। পরমানন্দ যা জানে সে হ'ল বেদিয়ার তন্ত্র।

হেসে বললেন—পরমানন্দ বলেছে, নাগের তপস্যায় এই স্থানে হিংসায় প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু দেখুন রাজা, আপনি স্বচক্ষে দেখুন।

ব'লে আঙুল বাড়িয়ে দিলে মাটির দিকে।

সেখানে চলছিল পিঁপড়ের সারি। সারিবন্দী তারা চলেছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকের মুখেই এক-একটি কৃমিকীট। চক্রবর্তী বললেন—দেখুন কোথায় পচা কিছুতে কৃমি জন্মেছে, এই পিঁপড়েরা তাদের শিকার ক'রে·

নিয়ে আসছে এখানে। নিয়ে আসছে কোথায় দেখেছেন? এই অশ্বত্থ গাছেরই কোন কোটরে কিংবা শিকড়ের তলায়।

ব'লে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। এর পর চক্রবর্তী বললেন—রাজা, প্রতিপদ চ'লে যাবে। চ'লে গেলে পূজা অসমাপ্ত থেকে যাবে। আপনি অনুমতি করুন, আমি পূজা শেষ করি।

চক্রবর্তী আগুন জাললেন; বড় বড় কাঠ জেলে পুড়িয়ে জলন্ত অঙ্গার তৈরী হ'ল। ফুলের অঞ্জলি যেমন অনায়াসে তুলে দেয় তেমনি অনায়াসে হাতে জলন্ত অঙ্গারের অঞ্জলি তুলে নিলেন। তারপর 'ব-লো—ধ-র্ম্ম-র-ঞ্জো' ধ্বনি দিয়ে সেই জলন্ত অঙ্গারের অঞ্জলি ধর্মদেবের মাথায় চাপিয়ে দিলেন। বললেন—আমার দেবতার কাছে ফুলের অঞ্জলি আর আগুনের অঞ্জলিতে প্রভেদ নাই। হিংসা অহিংসায় কোন বিকার নাই। শুধু তাই নয় মহারাজ, ধর্মদেবতার কৃপায় মাহাত্ম্যে যারা এই তন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের কাছে আগুনের উত্তাপ আর জলের শীতলতায়ও কোন পার্থক্য নাই।

তাঁর কথা শেষ হতেই ভক্তেরা বিছিয়ে দিল সেই জলন্ত অঙ্গারের রাশি এবং বিচিত্র বোলান গানের সঙ্গে ভক্ত-নৃত্য নাচতে লাগল। অঙ্গারের আস্তরণ যেন ফুলের আস্তরণ তাদের কাছে। রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দর্শকেরা স্তম্ভিত হ'ল। ধর্মরাজের দেয়াশী ভক্তেরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে উঠল একটি অতি কাতর আর্তনাদ। মর্মান্তিক মৃত্যুযন্ত্রণায় কেউ বা কিছু চীৎকার ক'রে উঠল। চমকে উঠল সকলে। কি হ'ল?

পরমানন্দ বললেন—মহারাজ, ওই আগুনের উত্তাপে মাটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এর তলায় বোধ হয় কোন জন্তুর বাসা আছে। উত্তাপে জন্তুটি গর্তের মধ্যে ঝলসে মরছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠল চীৎকার।

পরমানন্দ বললেন—মহারাজ, হতভাগ্য পশু প্রার্থনা জানাচ্ছে, বলছে—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজার অন্তর আকুল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—খোঁড় মাটি। বের কর জন্তুটিকে। রাজার আদেশের আগেই দর্শকেরা এগিয়ে এসেছেন। মাটি খুড়ে বের হ'ল গর্ত। গর্তের মধ্যে দেখা গেল অর্ধদগ্ধ একটি স্ত্রী-নেকড়ে। মৃতপ্রায় অবস্থা। হতভাগিনীর বুকের তলায় কটি বাচ্চা। প্রাণপণে সে নিজের দেহ দিয়ে বাচ্চাদের ঢেকে রেখেছে।

পরমানন্দ বললেন—দেখুন মহারাজ।

চক্রবর্তী হেসে বললেন—মাতৃস্নেহ। স্নেহ আর হিংসা দেবতার মুখের দক্ষিণ ভাগ আর বাম ভাগ পরমানন্দ।

—না। তার চেয়েও কিছু বেশী। দেবতার মুখের বাম ভাগেও দক্ষিণের ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে। দেখ শাবকগুলির মধ্যে একটি ওর নিজের শাবক নয়। একটি হ'ল কুকুরের ছানা। এনেছিল খাবার জন্য। কিন্তু মাতৃস্নেহের মধ্য দিয়ে মহাপ্রকৃতির পরমা বৈষ্ণবী রূপের যে তপস্যা তাই প্রকট হয়েছে।

চক্রবর্তী বললেন—ওটা নেহাতই ব্যতিক্রম ঠাকুর।

—ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়েই ধর্ম বর্তমান স্ব-ভাবকে অতিক্রম ক'রে নূতন ভাবে উত্তরায়ণ করে।

চক্রবর্তী পরমানন্দ ঠাকুরের কথার উত্তর দিলেন না। যেন অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করলেন। দেয়াশীদের বললেন—নিয়ে এস বলি। বলি দিয়ে পূজা হোম শেষ করব।

পরমানন্দ বললেন—বলি দিতে হ'লে আমাকে বলি দাও।

তিনি নিজেই গিয়ে হাড়িকাঠের উপর গলা পেতে দিলেন। চক্রবর্তী চীৎকার ক'রে উঠলেন, দেয়াশীরা চীৎকার ক'রে উঠল—এ কি অন্যায়?

পরমানন্দ বললেন—কোথায় অন্যায়, কিসের অন্যায়? হিংসা অহিংসায় বিকার নেই তোমাদের দেবতার, ফুলে অঙ্গারে প্রভেদ নাই, সেখানে একটি পশুতে আর মানুষেই বা ভেদ কেন? প্রয়োজন বলির। দাও, আমাকেই বলি দাও।

চক্রবর্তী এবার বললেন—নরবলি রাজার আইনে নিষিদ্ধ।

রাজা এবার নিজে উঠে এলেন, বললেন—ঠাকুর, আপনি কোন্ বিধিতে চক্রবর্তীর মন্ত্রে বাধা দিচ্ছেন? আপন তন্ত্রানুযায়ী দেবপূজার অধিকার সকলের আছে।

পরমানন্দ বললেন—মহারাজ, ধর্মের নূতন ভাবের বিধিতে ধর্ম নূতন ভাবে ভাবিত হয়েছেন। এই নাগের মাঠে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিঁপড়েগুলি সে ভাবের নির্দেশ পায় নাই, কিন্তু ওই নেকড়ে বাঘিনী পেয়েছে। মানুষের মধ্যে চক্রবর্তী পায় নি, আমি পেয়েছি। চক্রবর্তীর কথা মিথ্যা বলি না, কিন্তু সে বর্তমান স্ব-ভাবের সত্য, আমার সত্য, নবীন ভাবের সত্য, যাতে নয় কি—মানব-জীবনের মধ্যে ধর্ম ভাবী কালে সিদ্ধি লাভ করবেন। মহারাজ, চণ্ডমুণ্ড দুই মহাপশু বিনাশের জন্য যে দেবীর ললাট-ফলক থেকে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডার আবির্ভাব ঘটেছিল সেই দেবী আসলে অন্তররূপে হলেন পরমা বৈষ্ণবী। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি ওই বৈষ্ণবী রূপে ওই ভাবে প্রকটিতা হবেন; সেই ভাব-সাধনা হ'ল—এ যুগের ভাবসাধনা। আমার ধর্ম এই ধর্ম। প্রাণ দিয়ে আমাকে আমার বৈষ্ণবী-প্রকৃতির নির্দেশকে পালন করতেই হবে। বলি বিধিসম্মত হ'লে নরবলিও বিধিসম্মত। কিন্তু সে বিধি যে কারণে আপনার রাজ্যে আপনি রহিত করেছেন, সেই কারণেই আমি এই জীবটিকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছি। বলি নিষেধ, হত্যা নিষেধ, নরবলি নরহত্যাতেই বা গণ্ডীবদ্ধ থাকবে কেন মহারাজ? সে ভাব সম্প্রসারিত হতে বাধ্য।

ঠিক এই সময়েই অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল রাজার পাঁচ বছরের শিশু-সন্তানটি। রাজা চীৎকার করে উঠলেন—এ কি হ'ল? বৈদ্য, বৈদ্য, বৈদ্যকে ডাক।

চক্রবর্তী বললেন—মহারাজ, এ হ'ল দেবপূজায় বাধা পড়ার ফল। আপনার রাজ্যে দেবতা কুপিত হয়েছেন এ তারই লক্ষণ।

চক্রবর্তীর কথার মধ্যে শিশু অজ্ঞান অবস্থাতেই কথা ব'লে উঠল।

বললে—মহারাজ, কলিতে দৈববাণী হয় না ; সেই হেতু আমি তোমার সন্তানকে আশ্রয় করেছি। আমি ধর্মদেব।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি উঠল চারিদিকে। শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। ধূপধূনার সুগন্ধে অশ্বত্থতল ভ'রে গেল। চক্রবর্তী আসন করে বসে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমার আদেশ তুমি ব্যক্ত কর দেবতা।

শিশুর মুখ দিয়ে দেবতা বললেন—মহারাজ, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল আমার যোগীপুরের আটনে। সেইখানেই আমি চিরাচরিত সনাতন পদ্ধতিতে বলি-পূজা গ্রহণ করব। এখানে আমি অলক্ষ্যে অবস্থান করব—রক্ষা করব মহানাগের এই অশ্বত্থতল। তবে যখন আমি এখানে একবার আবির্ভূত হয়েছি তখন তা মিথ্যা হতে পারে না। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজার সময় এখানে একদিন—পূর্ণিমার পর এই প্রতিপদ তিথিতে আমার পূজা হবে। পূর্ণিমার পূজা বলি হোম শেষে আমি এখানে আসব ভক্তবৃন্দদের নিয়ে। প্রতিপদের পূজা এইখানে গ্রহণ করব। চক্রবর্তী যেমন আপন তন্ত্রে মহাসাধক, পরমানন্দ ঠাকুরও তেমনি আপন পথে সিদ্ধ সাধক। এই মাঠ ঠাকুরকে দান করে গেছে মহানাগ। সুতরাং তার অধিকারের মধ্যে এখানকার পূজায় বলি হবে না। ভোগ হবে শুধু পায়সান্নের। পূজা করবে চক্রবর্তীরা। ভোগ দেবেন ঠাকুরবংশ। এই মাঠের উৎপন্ন তণ্ডুলে আমার পায়সান্ন তৈরী হবে।

জয়ধ্বনি উঠল চারিদিকে।

রাজার মীমাংসায় এখানকার পূজার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য পঁচিশ বিঘা জমি পেলেন চক্রবর্তীরা। পঁচিশ বিঘার আট বিঘা ভোগ করে বাদ্যকর বায়েন, আড়াই বিঘা ভোগ করে সদ্গোপ গোপ কুম্ভকার তেলি তন্তুবায় পাঁচ ঘর—দশকাঠা হিসেবে। সদ্গোপেরা দেয় পায়সান্নের গুড় ; গোপেরা দেয় দুধ ; কুম্ভকারেরা দেয় দুশো ছাপান্নখানি প্রদীপ, ষোলটি ধুনুচি ও মাটির ঘট ; তেলিরা দেয় প্রদীপের জন্য তেল ; তন্তুবায়েরা

দেয় প্রদীপের সলতের জন্য কন্তা। শুক্লা প্রতিপদের দিন থেকে এই অশ্বত্থতলে নিত্যনূতন প্রদীপ জ্বলবে ওই ব্যবস্থা থেকে। প্রথম দিন চক্রবর্তীরা আসবেন—নিজেরা সমস্ত স্থান পরিষ্কার করে নিকিয়ে ষোলটি করে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যাবেন। ধূপ দিয়ে যাবেন। তার পর-দিন থেকে দেবাংশীদের পালা। শুক্লপক্ষ শেষে কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন পূজা হবে। সেদিন দুশো ছাপ্পান্নটি প্রদীপ জ্বলবে, ষোলটা ধুনুচীতে ধূপ জ্বালানো হবে। বায়েনকেও নিত্য সন্ধ্যায় এখানে ঢাক বাজাতে হয়।

বৃদ্ধ রামহরি চক্রবর্তীর এ বংশ-কাহিনী আজ আর বেশী লোক জানে না। আগে কিন্তু এ অঞ্চলের সবাই জানত। বৃদ্ধ রামহরি মনে মনে এই কাহিনী স্মরণ ক'রে বুড়ো মাথাটি কাঁপিয়ে নেড়ে নেড়ে বলে—এই সব কথা কই কারে? বোঝে কে? গুহ্য কথা উহ্য রাখাই বিধি। যে মানুষ তত্ত্ব জানে সে ইসারায় বুঝে নেয়। এ হ'ল কুলের গোপন কথা; এ ভুললে কুলনাশ, আবার যার-তার কাছে ফাঁস করলেও সব্বনাশ।

কালে কালে সে সব বন্দোবস্তের আর কিছুই নাই। সদ্‌গোপ গোপ এরা জমি কোথায় কাকে কবে বেচে দিয়েছে নিষ্কর জমি ব'লে। দুধ গুড় বন্ধ হয়েছে। কুম্ভকারেরা জমি বেচেছে, কিন্তু প্রদীপ দেয়—অবশ্য দুশো ছাপ্পান্নটা নয়—ষোলটা প্রদীপ, একটা ধুনুচী, একটা ঘট বছর বছর দিয়ে যায়। সেও এখানকার কুম্ভকারেরা নয়—এখানে এখন কুম্ভকার বংশই নাই; এখানকার কুম্ভকারদের দৌহিত্রগোষ্ঠী আছে ডাঙ্গালে শেখমপুরে, তাদেরই একজনেরা দেয় প্রদীপ, একজনেরা দেয় ধুনুচী আর ঘট। তেলিরা কিন্তু তেল দেয় না। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। ঠাকুরবংশই নাই। তাদের দৌহিত্রের দৌহিত্রবংশ ওই গৌরীকান্তরা। ওদের বাড়ী থেকে পায়সের দুধ মিষ্টি চক্রবর্তীদের বাড়ী পৌঁছে দেয়। সেই দুধ মিষ্টি নিয়েই রমা যেত যোগীপুর চক্রবর্তীদের বাড়ী; তার বয়স তখন বারো তেরো; সঙ্গে যেত বিজয়দের বাড়ীর বুড়ী ঝি। চক্রবর্তী-বাড়ীর ছেলে শক্তি রমাকে দেখে প্রেমে পড়েছিল।

হতভাগা ছেলে, অল্পায়ু—বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই মরে গেল। মরবেই যে। কুলের কথা ভুললে কুলনাশ হয়। এ একেবারে অবিশ্বাস! আচার আচরণে একেবারে নাস্তিক ম্লেচ্ছ। কতবার বারণ করেছে রামহরি—শক্তি, এত বুদ্ধি ভাল নয়। এ করিস না। এ বংশে সয় না। সয় না। দু'চাকার গাড়ী কিনে, তাতেই চেপে গলাখোলা কোট চড়িয়ে বার্ডসাইয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে শক্তি একেবারে ধরাকে সরা মনে করেছিল। মরল মরল একটা সন্তান রেখে মরল না। মরবে চক্রবর্তীবংশের আরও জনকতক পাখা-গজানো পিঁপড়ে। সে রামহরি জানে। সেকাল থেকে চক্রবর্তীবংশ তো কম নয়। যদু-বংশ। তাও মরে হেজে কত শাখার বংশ লোপ পেয়েছে তার হিসেব নাই। দৌহিত্রদের সঙ্গে ধর্মরাজদের দেবোত্তরের সেবাইত স্বত্বের সম্পর্কে নাই তাই রক্ষে। এ নিয়ে মামলা মকদ্দমা কম হয় নাই। সে একবারে হাইকোর্ট পর্যন্ত। একবার নয়, তিন তিন-বার। এখন চক্রবর্তীবংশের শরীক বিয়াল্লিশ ঘর। আধ পয়সা রকমেরও শরীক আছে। তাতেও ধর্মদেবের কৃপায় পেটের ভাতের অভাব হয় না। চর্মরোগের ওষুধ তেল আর অম্বলের ওষুধ মাদুলী, পুজোর প্রণামী এ থেকে আধ-পয়সার শরীকেরও আয় দিন একটা টাকা। কিন্তু আধ পয়সা এক পয়সার অংশীদারদের পুজোয় অবহেলা নাই। তারা ধর্মদেবকে ভজেই পড়ে আছে। এই যে ছোঁড়া দুটো গেরুয়া প'রে গোঁসাই সেজেছে—এরা আধ পয়সার শরীক। অবহেলা মোটা শরীক ঘর। তিন ঘর মোটা শরীক, প্রত্যেকের অংশ এক আনা হিসাবে। তিন পয়সা রকমের শরীক আছে চার ঘর। দুপয়সার অংশীদার আট ঘর। বৃদ্ধ রামহরির অংশে দুপয়সা, কিন্তু বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ আর এই ধর্মতন্ত্রে সাধনা তিনি ছেলেবেলা থেকেই করে আসছেন—তাই পূজা তিনিই করেন। আজন্মই তিনি অকৃতদার। বিয়েতে তাঁদের কন্যাপণ দিতে হয়। আগে হ'ত। এখন—! বৃদ্ধ রামহরির শীর্ণ ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটে ওঠে। তা এদিক দিয়ে চক্রবর্তী-বাড়ীর হাল-আমলের ছোঁড়ারা

খুব শোধ নিয়েছে এই সব কালীভজা শিবভজা কেষ্টভজা বামুনদের ওপর। সেকালে ওরা হুঁকো দিত না, এক পংক্তিতে খেত না—তা নিয়ে মনোবেদনার অন্ত ছিল না চক্রবর্তীদের। অবস্থা চক্রবর্তীদের চিরকাল ভাল, বরং এখনকার চেয়ে আগে আরও ভাল ছিল। তখন যা হয় নি একালের চক্রবর্তী-বাড়ীর মোটা শরীকদের ছোঁড়ারা ইংরাজ লেখাপড়া শিখে সে কেল্লাফতে করেছে। চক্রবর্তী-বংশে এখন একজন ডাক্তার, দুজন মোক্তার, একজন উকীল। এ ছাড়া ক'টা ছোঁড়া ম্যাট্রিক পাস করেছে। অর্ধাক্ষর—অর্থাৎ আধ আখুরের তো হিসাব নাই। জন কয়েক যায় সবরেজেস্টারী আপিস দলিল লেখে, সনাক্ত দেয়। জনা দুই পাঠশালার পণ্ডিত। একজন স্কুলের মাস্টার। একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। পাঁচ-ছজনে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। ডাক্তার মোক্তার উকীল ইস্কুলমাস্টার ছেলে কজনেরই বিয়ে হয়েছে বাঁড়জ্যে মুখুজ্যে চাটুজ্যে সরকার বামুন বাবুদের ঘরে; এ সব বামুনেরা তো এতদিন শুধু নাকউঁচু বামুনই ছিল না—এরা আবার বাবুঘর ছিল। লম্বা কোঁচা, লম্বা জামা, লম্বা কথা ছিল এদের। পথ খুলে এদের বাড়ীতে প্রথম হানা দিয়েছিল শক্তি। সে রমাকে বিয়ে করে এনেছিল।

এ বিয়েতে রামহরির উৎসাহের আর অন্ত ছিল না। চক্রবর্তী-বংশের এত বড় সম্মান আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত হয় নি। রাজ্য জয় করেও এত বড় সম্মান হয় না। আলো-বাজনা বাজী-পোড়ানো রায়বেঁশেনাচ যাত্রাগান খেমটানাচ—করতে আর বাকী রাখে নি রামহরি। শক্তির বাপ রামহরির খুড়তুত ভাই রামসদয়। রামসদয় মারা গিয়েছিল শক্তির শৈশবে। অকৃতদার রামহরি শক্তিকে বড় ভালবাসত। মোটাসোটা ছেলে, বড় বড় চোখ, কালো রঙ, শক্তি ছেলেবেলায় কোমরে রূপোর বোর, হাতে রূপোর বালা, গলায় তক্তি পরে ছুটে বেড়াত। রামহরির মনে হ'ত যেন ব্রজের গোপাল ছুটে বেড়াচ্ছে, নেচে বেড়াচ্ছে। শক্তির অংশ রামহরির চেয়ে বেশী; অবস্থা ভাল তার, অভাব ছিল না। তবু রামহরিও তাকে অনেক দিয়েছে। ওই দু-চাকার গাড়ী বাইসিকেল, ওখানা রামহরিই

শক্তিকে কিনে দিয়েছে। রমার সঙ্গে বিয়ের সময় সোনার হার দিয়েছিল রামহরি। ওঃ, মনে হয় যেন সেদিনের কথা! বারো-তেরো বছরের রমা গৌরীকান্তের খুড়ো বিজয়ের বাপের পূজো নিয়ে ওই দুধ মিষ্টি নিয়েই এসেছিল ধর্মতলা। ঢলঢলে মুখ, ডাগর চোখ, ঢেউখেলানো একপিঠ মিশমিশে কালো চুল, লালপেড়ে একখানি সাড়ী প'রে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন দেবলোক থেকে কোন কুমারী এসেছে ধর্মকে অর্চনা করতে। শক্তি ছিল রামহরি জ্যেঠার পাশে বসে। সেই পূজোর সামগ্রী নিয়ে জমা করছিল। তখন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছে। বাউণ্ডুলের মত দিনরাত্রি দু-চাকার গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়ায়। লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা সে অনেক করেছিল, বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত ইস্কুলেই পড়েছিল সে, কিন্তু পাস করতে পারে নি। লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছিল। কাপড়ের দোকান করেছিল শহরতুল্য রেলজংসনে। সে ব্যবসা দেখাও ছেড়ে দিয়েছিল। মদ বলতে নাই, 'কারণ' বলে চক্রবর্তীরা। ধর্মরাজের পূজোর অঙ্গ হ'ল ও বস্তুটি, চক্রবর্তী-বাড়ীর ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় অন্ন মুখে দেবার পরই কারণে আঙুল চুবিয়ে জিভে ঠেকিয়ে দিতে হয়, 'কারণ করা' চক্রবর্তী-বাড়ীর সন্তানের দোষের নয়, কিন্তু শক্তি মাতাল হয়ে উঠেছিল। যখন তখন দেবতাকে নিবেদন না করেই খেয়ে চেঁচামেচি করে বেড়াত। বিয়ে করব না পণ ধরেছিল। রমাকে দেখে শক্তি রাঙা চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রামহরি প্রথমটা ভয় পেয়েছিল। ভাল ঘরের মেয়ে তাতে সন্দেহ নাই; সঙ্গের বুড়ীর বাড়ী নবগ্রামে। বাউরীদের ক্ষিতে অর্থাৎ ক্ষিতীশের মা—মেয়েটির বাড়ীও নবগ্রাম। নবগ্রামের ব্রাহ্মণেরা শুধু ব্রাহ্মণ নয়, হাল আমলের বাবুও বটে; অবস্থা মন্দ অনেকেরই হয়েছে, কিন্তু প্রতাপ আছে; সায়েব সুবো দারোগা হাকিমদের সঙ্গে পরিচয় রাখে। মদের ঘোরে শক্তি কিছু বললে সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। তা ছাড়া দেবস্থলের দুর্নাম হবে, যজমান আসবে না, ধরমের আসন নড়ে উঠবে।

দেবকার্য ছেড়ে রামহরি এসে বলেছিল—কই, দাও তো মা লক্ষ্মী, কি পূজো এনেছ? কার বাড়ীর পূজো?

মেয়েটি ভারী সপ্রতিভ, সে শক্তির ওই মাতাল দৃষ্টির সামনেও সঙ্কুচিত হয় নি। রমা তার অভ্যস্ত স্থিরদৃষ্টিতে শক্তির দিকে তাকিয়েছিল। রামহরির কথায় তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিল—ধর্মরাজের পায়েসের দুধ মিষ্টি। ন্যাগের মাঠের ভোগের জন্যে শ্যামাকান্তবাবুর বাড়ী থেকে এসেছি।

—তা। থেমে থেমে সঙ্কোচভরেই রামহরি প্রশ্ন করেছিল—তা—তোমাকে তো। তা—হ্যাঁ মা, শ্যামাকান্তবাবু তোমার কে হন? বাবা? কই, শ্যামাকান্তবাবুর মেয়ের কথা তো শুনি নাই!

রমা উত্তর দেয় নি। উত্তর দিয়েছিল ক্ষিতীশের মা—ইনি হ'ল বাবুর বাড়ী ভাত আন্না করে, নবগেরামেরই শ্যামাঠাকরুণ, তারই কন্যে এটি।

রামহরি বলেছিল—তাই তো! এ যে রাজরাণীর মত কন্যে গো! বিয়ে-টিয়ে—

—বিয়েই তো মুস্কিল বাবা। মা ওর মাথায় মাথায় ভাবছে। গরীব—জ্ঞাতগুষ্টির ভদ্দজনের বাড়ী আন্নার কাজ করে। মেয়ের বিয়েতে যে এক কাঁড়ি টাকা লাগে গো!

রামহরির মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে সে বলে নি; বোধ হয় ধর্মরাজ কথাটা বলিয়েছিলেন—তিনি চক্রবর্তীদের বিধাতা অন্নদাতা মান্যদাতা রক্ষাকর্তা। তিনি চক্রবর্তীদের বহুকালের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই কথাটা রামহরির মুখে জুগিয়ে দিয়েছিলেন। রামহরি বলে ফেলেছিল—আমাদের যে ঘর নয় গো, আমাদের সঙ্গে চলল না যে, নইলে এমন কন্যে—। জিভের ডগায় আপশোষের চুক চুক শব্দ করেছিল রামহরি।

ক্ষিতীশের মা বলেছিল—আপনাদের ঘর তো আমার ঘর গো। দেবতার দয়ায় ধনধানের তো অভাব নাই। ভাগ্যে থাকলে ও

আপনাদের ঘরে পড়বে। চাল নাই চুলো নাই, কুল! তা ওর মায়ের আবার কুল, কুল নিয়ে ধুয়ে খাবে! ওর মা বলে, কুল দেখে আমার বিয়ে হয়েছিল ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে। আমার মেয়ের আমি তা করব না। তার চেয়ে হাত পা বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো।

ওই কথাতেই রামহরি সাহস পেয়েছিল। ইচ্ছে করেই রমাকে ক্ষিতীশের মাকে বাড়ীর মধ্য নিয়ে গিয়ে যত্ন করে জল খাইয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে ফিরে পাঠিয়েছিল। পরের দিন নাগের মাঠের অশ্বত্থ-তলায় প্রতিপদে ধর্মরাজের পূজো শেষ ক'রে বাড়ী ফিরবার পথে রমাকে আশীর্বাদ জানাবার ছল করে গিয়েছিল শ্যামা ঠাকরুণের বাড়ী। শ্যামা ঠাকরুণ এর আগের দিনই শ্যামাকান্তবাবুর বাড়ী থেকে কাজে জবাব দিয়ে নিজের বাড়ী এসেছে। এই ঘটনা হয়েছিল উপলক্ষ্য। ধর্মতলায় পূজো দিয়ে ফিরে ক্ষিতীশ-বাউরীর মা রামহরির কথাগুলিই শ্যামাকান্ত-বাবুর বাড়ীতে বিজয়ের মায়ের কাছেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। পাশেই দাঁড়িয়েছিল শ্যামা। বলেছিল—বুড়োর চোখ যেন আর ফেরে না মা! কি বলব, বুড়ো কিনা। বলে—এ মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যার বাড়ী যাবে তার বাড়ী ধনে ধানে উথ্‌লে উঠবে। কুল ধন্যি হবে। এ মেয়ে আজরাণী হবে।

বিজয়ের মা—চিরকালের ভাল মানুষ। শান্ত ধীর মিষ্টভাষিণী। তিনি হেসে বলেছিলেন—তা চক্রবর্তী মিথ্যে কথা বলেন নি মা কালী।

শ্যামাকান্তবাবুর নামের সঙ্গে শ্যামার এক নাম বলে বিজয়ের মা শ্যামাকে কালী ব'লে ডাকতেন। বিজয়ের মা কথার জের টেনে বলেছিলেন—দেখো, তোমার মেয়েকে দেখে বড়ঘরের ছেলে নিজে এসে চেয়ে নিয়ে যাবেন।

শ্যামা এদিক ওদিক চেয়ে দেখে মৃদুস্বরে বলেছিল—তোমার ঘরও তো রাজার ঘর মামী। তোমরাও তো কম নও। তা দয়া ক'রে তুমিই ওকে নাও না মামী। আমার বড় সাধ। সেই ছেলেবেলা থেকে তোমার ঘরেই এসে ঢুকেছে। বিজয়ের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে—

—শ্যামা! বাড়ীর বাইরের দরজায় রন রন করে উঠেছিল বিজয়ের পিসীমার কণ্ঠস্বর। কথায় আছে—"যে ভয়ে পলাও তুমি সেই দেবী হই আমি।" কথাটা দু ক্রোশ দূরের কালীর কথা। এবং সে কালী এই শ্যামাকান্তদেরই পূর্বপুরুষের উপাস্য দেবী ছিলেন। দেবীর নিত্য নরবলির ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ঘরের পালা ছিল সেকালে। প্রতি বাড়ী থেকে পালা অনুযায়ী বলি যেত। মানুষ বলি। একদিন এই শ্যামাকান্তদের পূর্বপুরুষের পালা পড়েছিল। বাড়ীতে ছিল বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর একমাত্র পুত্র। কে বলি যাবে এই নিয়ে পূর্বদিন সন্ধ্যায় বাড়ীতে সে এক মর্মন্তুদ করুণ নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছিল। বাপ বলেন—আমি যাব, ছেলে বলে—আমি যাব। মা নির্বাক বসে ছিলেন, চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছিল। তাঁর উপায় নাই; নারীবলি গ্রহণ করেন না দেবী, শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। তিনি ভাবছিলেন—কোন্ পুকুরে কত জল আছে! শেষে গভীর রাত্রে বাপ উন্মত্তের মত উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—ওঠ। এখনি চল্। চলে যাব, এ রাক্ষসীর রাজ্য থেকে চলে যাব। দেবী নয়—রাক্ষসী। ওঠ। বলেই এক হাতে স্ত্রীর হাত অন্য হাতে পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। পড়ে থাক্ পূর্বপুরুষের ভিটে, যাক পড়ে সব সঞ্চয় সম্বল, কোন কিছুর প্রয়োজন নাই; একবস্ত্রে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। গভীর রাত্রি—গ্রাম সুষুপ্ত; ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলেছেন। সন্তর্পিত পদক্ষেপে চলেছেন যেন কারুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়। চল দূরে দূরান্তরে। রাঢ়বঙ্গ পার হয়ে চল। কীর্তিনাশা পার হয়ে আছে নাকি দুর্গম দুস্তর দেশ সেখানে চল। হঠাৎ কে যেন কথা কইলে—গ্রামের শেষপ্রান্তে অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে, পরনে লালপেড়ে শাড়ী, হাতে শঙ্খ কঙ্কণ, সিঁথিতে সিঁদুর, এলোচুল—মেয়েটি পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে-ই কথা কইলে—কে গো? তোমরা কে গো?

চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ। চমকে উঠল ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ-কুমার।

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলে—এই রাত্রে তোমরা কোথায় যাবে?

ভাল হ'ত না। উড়ে কুলীনে তোমারও বিয়ে হয়েছিল, তোমাকেও তো আমার বৃত্তি ধরতে হ'ত। তাতে তো তোমার নিন্দে হ'ত না মাসী। আমার মেয়ে রাঁধুনীবামনীর পেটের মেয়ে বটে, কিন্তু কুলে তোমাদের চেয়ে উঁচু গো। হাজার টাকার জমিদারীর আয়ে তোমরা নিজেদের রাজা মনে কর। কুলের গরবে তেমনি আমরাও তো নিজেদের খাঁটী সোনা মনে করি। তাতে যদি ঝুটো পাথরকে হীরে মনে ক'রে সোনার অঙ্গে বসাতে চেয়ে থাকি—তাতে দোষ হয়েছে কি? তোমরাও চাঁদ নও, আমরাও বামন নই। ফানুষ মাসী, বড় জোর ফানুষ, আকাশ-পিদীম, লগি দিয়ে দিব্যি নাগাল পাই।

কথা শেষ করে সে আর দাঁড়ায় নি, রমার হাত ধরে বলেছিল—চল্।

একেবারে এসে উঠেছিল নিজের বাড়ীতে। এবং পরের দিনই গিয়েছিল রামহরির বাড়ী। এবং বিনা ভূমিকায় বলেছিল—চক্রবর্তী ঠাকুর, আপনাকে লোকে বলে বাক্‌সিদ্ধ। ধর্মদেবের সঙ্গে আপনার কথা হয়। আপনি মিথ্যে বলেন না, আপনার কথা মিথ্যে হয় না।

রামহরি একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—মিছে কথা তো বলি না ঠাকরুণ। তবে ধর্ম যদি মিছে বোঝান আর যদি কোন কারণে ভ্রম ঘটে তবে বলতে পারি না। মানুষ তো, ভুল বুঝি, ভ্রম ঘটে। কিন্তু কি বলেছি আমি? কি মিছে দাঁড়াল বল শুনি; বুঝে বিচার ক'রে দেখি।

শ্যামা বলেছিল—কাল আমার মেয়ে রমাকে দেখে আপনি বলেছেন রাজরাণী হবে।

চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রামহরির, বলেছিল—নিশ্চয় হবে। নিশ্চয় হবে। নিশ্চয় হবে।

—সেই শুনেই এসেছি। আপনি রাজপুত্তুরের জ্যাঠামশাই, আপনাদের ঘর রাজার ঘর। ধন থাকলে আর জমি থাকলে যদি রাজা হয়, ওই শ্যামাকান্তবাবু আপনাদের ঘরে সোনার গহনা বাঁধা

দিয়ে জমিদারী বজায় রেখে তার দৌলতে যদি রাজা হয় তবে আপনারা মহারাজা। আপনার ভাইপো শক্তির বউটি মারা গিয়েছে, কনে খুঁজছেন আপনারা। নেবেন আমার কন্যাটিকে দয়া ক'রে?

রামহরি উল্লাসে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

—সত্যি বলছ? দেবে? সত্যি দেবে? তোমার জ্ঞাতগুষ্টীরা রাজী হবে? তোমাদের কুল?

—জ্ঞাতগুষ্টী তো আমার কন্যেদায় উদ্ধার করে দেবে না। আমার ছেলে নাই, এই একটি মেয়ে। মেয়ের যদি আমার রাজার ঘরে বিয়ে হয় তবে কারুর তোয়াক্কা করি না আমি। কুলের মুখে নুড়ো জ্বেলে দি। আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ। সেকালের কুলের ছোট বড় পাঁসকুড়ে ছাইগাদায় চাপা পড়েছে। এখন ধন যার, সম্পত্তি যার, সেই কুলীন। আপনার মত কুলীন আছে কে? আর কুলই যদি বলেন—তবে আপনারাই বা ছোট কিসের? যাদের বংশে ধর্মরাজ কুলদেবতা—তাঁর কৃপা যাদের ওপর, তাদের চেয়ে বড় কে গো? আমি দোব বলে এসেছি; আপনি নিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

সেই দিনই কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল। এক মাস পর আষাঢ় মাসে শক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল রমার।

বিয়েতে রামহরিই ছিল কর্মকর্তা। সে ছিল শক্তির আপন জ্যেঠা-মশাই, তার উপর চক্রবর্তী-বংশের মধ্যে প্রবীণ এবং প্রাচীন-পন্থী। এই বিবাহকে সে তাদের বংশের একটা মহাবিজয় বলেই মনে করেছিল। এতকাল পর তারা সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গে করণকারণের অধিকার পেলে। জয় ধর্মরাজ! তোমার বিচার নিখুঁত, তোমার নির্দেশ অভ্রান্ত! চক্রবর্তী-বংশের অন্যান্যেরা রামহরির মত প্রাচীন মনোভাব পোষণ করত না, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের করণ-কারণের বাধা-বিঘ্নগুলিকে অপমান বলেই মনে করত। প্রথাটিকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করত, কিন্তু ঘৃণা ঠিক করতে পারত না; কারণ ঘৃণার মধ্যে যে অবজ্ঞা থাকে—সে অবজ্ঞা আশ্রয়-দণ্ড অভাবে বেড়ে উঠতে পারত না।

ওই সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজ তাদের আচার-আচরণে চালে-চলনে—সমাজে তাদের থেকে উঁচু স্থান অধিকার করেছিল নিঃসন্দেহে। উপরে যারা থাকে—তাদের পানে উপরের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞা করা যায় না। নীচের দিকে না তাকালে অবজ্ঞার ভাব দৃষ্টিতে ফোটে না, মনের মধ্যেও জন্মাতে পায় না। অবজ্ঞার বদলে তাদের মনে জাতক্রোধ। এ বিয়েতে তাদের সেই ক্রোধটা পরিতৃপ্ত হয়েছিল। কাজেই তাদেরও উৎসাহের আর সীমা ছিল না। সাত দিন ধরে উৎসব চলেছিল।

বিয়েতে নবগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। একদল এ বিয়ে সমর্থন ক'রে প্রথাটিকে উৎসাহ দিয়েছিল। তারা সকলেই প্রায় অবস্থাপন্ন লোক। তাদের আপত্তির কারণ ছিল না, কারণ প্রথা ভাঙলেও ওই চক্রবর্তী-বাড়ীর দ্বারস্থ হবার কোন সম্ভাবনাই তাদের থাকার কথা নয়। খাওয়া-দাওয়াটা প্রায় চলতই ছিল। পংক্তি-ভোজনে মাত্র খানিকটা ফাঁক রেখে বসার নিয়ম ছিল। সে ফাঁকটা না থাকলেই বা কি! মানুষের মন তখন উদারও হয়েছে—এবং সায়েবসুবোর সঙ্গে ভোজন-আলাপনের রেওয়াজটাও হু-হু ক'রে বাড়ছে।

আর একদল সমর্থন করে নি। তারা অধিকাংশই সায়েব-সুবোর সংস্রব-বঞ্চিত এবং আধুনিক শিক্ষা কর্মপথে ব্যর্থ মানুষ; কিছু অবশ্য প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী সৎমানুষও তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু শ্যামার মত অভিভাবকহীনা অসহায় একটি মেয়ের কন্যাদায় পণ্ড করবার মত ইচ্ছা তাদেরও ছিল না। ইচ্ছা কারও কারও থাকলেও সুযোগটাই বা কোথায় ছিল? শ্যামা নিজেই যে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে দিয়েছিল, কুল তাঁর থাকলেই বা কি গেলেই বা কি? মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার ঘরে আর সামাজিক ক্রিয়া হবার কথা নয়। এক দায় সে নিজে মরবার পর। তা সে না হয় বাসী মড়া হয়ে ঘরেই পচবে। চিল শকুন কীট পতঙ্গে খেয়ে তার দেহ শেষ করে দেবে। কথাটা বলেই সে জিভ কেটে বার কয়েক মা ষষ্ঠীকে স্মরণ ক'রে

বলেছিল—ষাট ষাট ষাট। বেঁচে থাক্ আমার শক্তি আর রমা, তার ঘরে সাত ভাই চম্পা এক বোন পারুল ফুটক। তারাই আমাকে খাটে চড়িয়ে খোল বাজিয়ে হরিনাম গাইতে গাইতে নিয়ে যাবে ; খই বাতাসা পয়সা ছিটোবে, কাঁদতে কাঁদতে যাবে। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করবে। সুতরাং পণ্ড করবার সুযোগও ছিল না।

বিয়ে হওয়ার পরও শ্যামার ক্রোধ শান্ত হয় নি। সে রামহরির ঘরে বন্ধক-দেওয়া বিজয়ের মায়ের গহনা রমাকে পরিয়ে বিজয়দের বাড়ীতে প্রণাম করাতে নিয়ে গিয়েছিল। এবং বিজয়ের পিসীকে বলেছিল—এই হার এই অনন্ত জোড়াটা ওর জাঠশ্বশুর ওকে দিয়েছে। হারটা নতুন। অনন্তজোড়াটা কাদের যেন বন্ধক দেওয়া, তাড়াতাড়িতে নতুন গড়ানো হয় নি, তাই এই দিয়ে বললে—এই এখন থাক্। পরে নতুন গড়িয়ে দেব।

রমা শক্তির বিধবা স্ত্রী—একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সে এসেছে স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হিসেবে আজ ধর্মরাজ পূজোয় নাগের মাঠের অশ্বত্থতলায় প্রদীপ জ্বেলে পূজো দিতে।

রামহরি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—থাকবে না, কিছুই থাকবে না। সব যাবে। সব যখন যাবে, সর্বনাশ যখন হাঁ ক'রে তেড়ে আসবে তখন চেতন হবে। তার আগে তো হবে না।

গৌরীকান্ত রমাকে মৃদুস্বরে বললে—আমি যাই রমা, তোমরা পূজো-টুজো দাও।

—যাবেন ?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি ভাই।

—একদিন আসব আপনার ওখানে।

—নিশ্চয় এস।

—লজ্জা করে। দিদির সঙ্গে দেখা করবার কথা ভাবতেই পারি না।

—দিদির সঙ্গে? দিদি? ও বিজয়ের মাকে তুমি 'দিদি' বলতে?

—হ্যাঁ।

—কিসের লজ্জা?

—অনেক লজ্জা।

—আসবার আগে সংকল্প ক'রো—আর জীবনে লজ্জার কাজ করব না। মিথ্যা সংকল্প নয়, সত্য সংকল্প। করলেই দেখবে, লজ্জার লেশ নেই, হেতু নেই; মাথা উঁচু করে হাসি মুখে চলে এসো। কেউ তোমাকে লজ্জা দিতে পারবে না। তুমি লজ্জা পাবে না।

হেসে গৌরীকান্ত বললে—দাঁড়াও।

তারপর রামহরির কাছে এসে কানের পাশে একটু উঁচু কণ্ঠে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—কি?

—ওই যে আচমন মন্ত্র—ইদমহং অমৃতযানৈঃ জ্যোতিষী জুহোমি স্বাহা!

—হ্যাঁ—যদ্ রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা উদরেণ—। হ্যাঁ গো, সব হোম করে ভস্ম হয়ে যায়। তা কি?

—তা কি হয়?

—কেনে হবে না?

—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—কই, আমার আসন পেতে দিলি? কোশাকুশি দিলি? দে, পাত্ আসন। এই ইংরিজি-জানা বাবুটিকে দেখিয়ে দি।

—কি দেখাবেন? পুজো করে উঠেই তো মণ্ডা বাতাসা ভাগ নিয়ে ঝগড়া করতে বসবেন?

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল রমা।

—তুই ঘোর পাপী। বুঝলি, ঘোর পাপী।

—তাই তো সবারই পাপ আমি এক নজরেই ধ'রে ফেলি।

—নিজের পাপ? ধরিস? দেখতে পাস?

—তাও পাই। নিজের পাপ ধরতে পারি, বুঝতে পারি বলেই তো পরের পাপ ধরতে পারি।

—তা হ'লে?

—কি তা হ'লে?

—ওই তো। নিজের পাপ যখন বুঝতে পারিস, তখনই তো বলিস, মনের মনে-মনেও বলিস্—আর করব না। 'ইদমহং সূর্যে জ্যোতিষী পরমাত্মনে জুহমি স্বাহা।'

গৌরীকান্ত হেসে বললে—শুনলে?

রমা একটু হাসলে—ক্রোধের হাসি।

গৌরীকান্ত বললে—এস একদিন, খুব খুসী হব। শুনতে পাই তুমি নাকি বিয়ের পর অনেক পড়েছ। এক সময় আমার কাছেই তুমি পড়া দেখিয়ে নিতে। দেখব কত পড়েছ তুমি। যদি বল তবে আমিও যেতে পারি তোমার বাড়ী।

—না। সেখানে আপনি যাবেন না। আপনাকে আর একবার বলেছি।

রামহরি কানে শুনতে পায় না, চোখেও দেখতে পায় না; তবুও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সে কথাগুলি শুনতে চেষ্টা করেছিল। গৌরীকান্তের সঙ্গে রমা যে কথা বলছে এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। ভাল লাগছে না তার। কিন্তু রমাকে বলবেন কি? বলবার কিছু উপায় নেই। রমা তার স্বামীর উত্তরাধিকারিণী এবং মেয়েটা আশ্চর্য রকমের শক্ত মেয়ে। নিজের অধিকার বোঝে, কেউ সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে হাত বাড়ালে বেশ শক্তভাবেই হাতখানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে—উঁহু, হাত দিয়ো না। আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় মেয়েটা আশ্চর্য। নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই ওর অনেক অপবাদ। সে অপবাদ ও গ্রাহ্যই করে না। রামহরি তবুও মেয়েটাকে বড় ভালবাসে। দিন রাত কটু কথা বলেও ভালবাসে।

রামহরির ছানি-পড়া চোখেও একটা লাল আভার রেশ ধরা পড়ল।

তিনি সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—বলি, আমি না হয় কাণা হয়েছি। তুইও চোখের মাথা খেলি না কি? সূয্যি যে ডুবছে। কি এত কথা যে ফুরোয় না! দেবকার্য হবে কখন? দেবতার দয়ায় পাট-ভাঙা থান কাপড় প'রে, আলবোট কেটে, পানদোক্তা খেয়ে অঙ্গ দুলিয়ে বেড়াচ্ছিস, সে কথা মনে আছে?

রমা কিছু জবাব দেবার আগেই গৌরীকান্ত উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধকে শুনিয়ে বললে—নমস্কার চক্রবর্তী মশায়। আমি তা হ'লে আসছি এখন।

—এস। তুমি কিন্তু কিছু মনে ক'রো না। তোমাকে কিছু বলি নাই আমি। ওই সব্বনাশীকে বলেছি। ওর রীতকরণই ওই।

গৌরীকান্ত চলে গেল। মনের মধ্যে লক্ষ কথার ভিড় জমেছে তার। রমার কথা; এই নাগের মাঠের বিচিত্র কাহিনীর কথা; বিশ্বেশ্বরীর কথা; শান্তির কথা! কপিলদেবের কথা!

রমা বললে, কপিলদেবের একটা আড্ডা ওই ধর্মরাজের পূজারী চক্রবর্তীদের এক শরীকের বাড়ীতে! আশ্চর্য! সে ওখানেই থাকে।

সূর্য ধীরে ধীরে অস্তগামী হচ্ছে। ডুবছে।

অনেক কাল আগের কথা মনে পড়ল—রমা সেঁজুতি ব্রত করত ছেলেবেলায়।

সন্ধ্যাবেলা গ্রামের বাইরে—খোলামাঠে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করত—থালা, থালা, থালা!

সূর্য খানিকটা ডুবে গেল আকারটি খণ্ডিত হলেই চেঁচাত—ঘটি, ঘটি, ঘটি!

আধখানা ডুবলে চেঁচাত—বাটী বাটী বাটী।

তারপর—কোদাল, তারপর—কাস্তে-কাস্তে-কাস্তে। শেষ কালটায় চেঁচাত—তোমার মন ধরলাম, তোমার মন ধরলাম, তোমার মন ধরলাম।

সূর্য ডুবে গেলে মৌনব্রত করে ফিরত। আকাশে সাতটি তারা উঠলে মৌনব্রত ভঙ্গ হ'ত—তারা গুনে। এক তারা নারা খারা, বিচিত্র

সাত তারার ছড়া। এর পর বসন্ত পুজোয়। কামনা করত—রামের মত স্বামী হবে, লক্ষ্মণের মত দেওর হবে, সীতার মত সতী হব। ঘরদোর ছেলেপুলে, মান সম্মান কত কামনা! চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল।

ঢাকের শব্দ শোনা গেল। ওখানে—নাগের মাঠের অশ্বত্থতলায় পূজা আরম্ভ হয়েছে।

ষোল

এরই পরদিন। যোগীপুরে ধর্মরাজের বৈশাখী পূর্ণিমা পর্বের শেষদিন। তিথিতে পূর্ণিমা, এই দিনের সমারোহ চরম। এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম থেকে লোক ভেঙে আসে। আগে শোনা যায় বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ হ'ত। এক দৈধা-বৈরাগীতলার মেলা ছাড়া এত লোকের সমাবেশ এ অঞ্চলে কোথাও হ'ত না। চক্রবর্তীরা এই উপলক্ষ্যে একটা মেলা বসাবার কল্পনা করেছিল, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু বৈশাখ মাসের অনিশ্চিত আবহাওয়ার জন্য মেলা বসতে পারে নি। প্রথম বৎসরেই দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড়ে জলে দোকানপাট লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। সে ঘটনা রামহরি চক্রবর্তীরও প্রথম বয়সের। তখন রামহরির বাপ ছিলেন—চক্রবর্তী-বংশের মুখ্য। জল ঝড়ের পর, পূর্ণিমার দিন—ভক্তদের 'ভাঁড়াল' খেলার দিন—একজন ভক্তের ভর হয়েছিল, সেই ভরের মধ্যে দেবতা নির্দেশ দিয়েছিলেন—মেলা হবে না। মেলা হবে না। মেলা হবে না। মেলা তখন থেকেই বন্ধ, কিন্তু পূজার সুরু হতেই কিছু কিছু দোকান আসে, দুপুরে আসে, বসে, গাছের তলায় বসে, রাত্রে উঠে চ'লে যায়। দোকান ঠিক বলা চলে না, ফিরিওলা বললেই ঠিক হয়। পাঁপর তেলেভাজার দোকান

গামলা-কড়াইয়ে, তৈরী মিষ্টি মাথায় ক'রে এনে চ্যাটাই চট পেতে বসে, মালা চাবি কার ফিতের ফিরিওয়ালারা মেলাময় ফিরি ক'রে বেড়ায়। এ কালে নিলেমী মনিহারীর কারবারও চলে। গাছতলায় তেতাস জুয়ো চলে অনেক, দু-একখানা ডাইস খেলার ছকও পড়ে। বিকিকিনি অনেক হয়; কিন্তু মেলা হিসেবে কিছু নয়। সমারোহ মানুষের। আর সমারোহ ঢাক ঢোল সানাই কাঁসী ও শিঙের। আগে নাকি হাজারখানা ঢাক আসত। ঢাকীরা এখানে ধর্মরাজের কাছে মানত শোধের জন্য আসে। রাঢ়বঙ্গের ঢাক বাজনা বিখ্যাত। সে খ্যাতির মূল্য বোঝা যায় এখানে—এই সময়। যেমন বড় এবং পালকের ঝালর এবং রঙীন ছিটের সাজসজ্জা তেমনি ধ্বনি। এক-একটা ঢাকে যেন বর্ষার মেঘগর্জনের প্রতিধ্বনি ওঠে।

কপিলদেব একটা গাছতলায় অনেকটা নিস্পৃহের মত দাঁড়িয়ে ছিল। সে এখানকার প্রবাদ, কাহিনী, ইতিহাস একটি একটি ক'রে সংগ্রহ করেছে। ওই নাগের মাঠের ইতিহাস থেকে চক্রবর্তীদের ধর্মরাজের ইতিহাস পর্যন্ত। ওখানেই শেষ নয়। আরও অনেক, অনেক, অনেক। ছোটখাটো, বিচিত্র, অতি সাধারণ; কোন কিছুকে সে উপেক্ষা করে নি। সেগুলিকে চিরে চিরে দেখেছে, আসল স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছে।

মানুষের সভ্যতার সেই প্রথম উন্মেষের কাল থেকে এ পর্যন্ত ঈশ্বর এবং ধর্মের ইতিহাস এক। মিথ্যা। ভণ্ডামি। প্রতারণা। আদিম মানুষ গাছ পাথর সূর্য চন্দ্র ঝড় বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে ভয়ে পূজো করতে চেয়েছিল সে এক কথা। চতুর মানুষ তারই সুযোগ নিয়ে পুরুত এবং পণ্ডিত সেজে রাশি রাশি মিথ্যার সৃষ্টি ক'রে জীবনের প্রগতির পথের চারিপাশে পাহাড় গ'ড়ে তুলে তার গতি রুদ্ধ করেছে—সে আর এক কথা। এর মধ্যে মানুষের বংশধারায় কত লক্ষ পুরুষের প্রাণশক্তি, যে ওই মিথ্যার পাহাড়ে ঘেরা বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কুম্ভীপাকের মত অথবা গোলকধাঁধার মত একই স্থানে ঘুরপাক খেয়ে ব্যর্থ হ'ল, শুকিয়ে বাষ্প

হয়ে গেল এবং পরমানন্দে ভাবলে—স্বর্গে যাচ্ছে, মুক্তি হচ্ছে তাদের, নির্বাণ পেলে তারা,—এর হিসেব এখনও হয় নি। সেই হিসেব নিয়ে হবে নতুন ইতিহাস। বার বার কত চাতুরী কত ভণ্ডামি ধরা পড়েছে, তবু অসহায় মানুষ এই মিথ্যার জগদ্দল পাথরের বেষ্টনী ভেঙে পথ ক'রে বের হতে পারে নি। দশমুণ্ড কুড়িহাত, চোখের দৃষ্টিতে মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা, বিতর্কে পরাজিত ক'রে মরা মানুষকে বাঁচানো; মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক, ইন্দ্রের সিংহাসন, গোলোক, ধ্রুবলোক; দৈববাণী; আশীর্বাদ অভিশাপ; এর আর অন্ত নাই, অন্ত নাই। কপিলদেব যখন ভাবে তখন তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর বুকে যেখানে সভ্যতা, যেখানে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সেখানেই এই ব্যাধির চিহ্ন। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী। গোটা ভারতবর্ষটা ঘুরে এস, দেখতে পাবে—শুধু মন্দির শুধু মন্দির আর মন্দির। শুধু কি মন্দির? গাছের তলায় সিঁদুরের চিহ্ন, পাথরের গায়ে দেবতার মুখ আঁকা, নদীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী মানুষের পদচিহ্ন। মানুষের শিল্পজ্ঞান সাহিত্যজ্ঞান, সব এই মিথ্যার মোহে মিথ্যা হয়ে গেল; এতটা কালের এত সব বিরাট প্রচেষ্টা পরিণত হ'ল আবর্জনা স্তূপে।

কপিলদেব যদি বিশ্ববিপ্লবের নেতৃত্ব পায়, তবে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন যে অগ্নিশিখার—সে অগ্নিশিখা সে জ্বালবে শিল্প সাহিত্যের এই আবর্জনা-স্তূপে অগ্নি সংযোগ করে। মনের মধ্যে চঞ্চল করে ওঠে—'আগুন জ্বালো—আগুন জ্বালো। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।' ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনার স্তূপ এগুলি। রবীন্দ্রনাথকে এই গানগুলির জন্যই ভাল লাগে! এত বড় বিরাট প্রতিভা—সে প্রতিভাও এই মিথ্যার অন্ধকূপের মধ্যে প'ড়ে বারো আনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। চার আনা সার্থক হয়েছে। ওই চার আনার জন্যই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। মেকী কালচারবিলাসী যারা রবীন্দ্রনাথের সব কিছুকেই মহৎ সৃষ্টি ব'লে মনে করে, সে তাদের দলের নয়। রবীন্দ্রনাথকেও বিচার করতে হবে। ওই—প্রভু, পরমেশ্বর, বন্ধু, তুমি, সম্বোধন ক'রে যে প্রার্থনা পূজার

গানগুলি লিখে গেছেন—নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে সেগুলি। অচলায়তনের মত হাঁটুভাঙা ব্যর্থ রচনা থাকবে না, থাকতে পারে না। বাইরের মন্দিরে গড়া পুতুলগুলিকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মনের ঘরে কায়েম করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁকে কটু কথা সে বলবে না, বলতে চায় না, বুর্জোয়ার ঘরে জন্ম, ঋণগ্রস্ত বিব্রত ধনী দেবেন্দ্রনাথ আশাভঙ্গে উপনিষদের শরণ নিয়েছিলেন, তাঁর সন্তান রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এটা কাটানো খুব কঠিন।

শান্তি—এ কালের মেয়ে শান্তি, তার দিকে চেয়ে দেখ না! ছেলে বয়সে—ষোল সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত তার বিপ্লবী মামার আওতায় ছিল, তার প্রভাব এখনও কাটাতে পারছে না। শান্তি ঠাকুর-দেবতা এ সবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু ওই অরূপ ঈশ্বরের মায়া কাটাতে পারছে না। ওর প্রধান জোর রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রভুদর্শন'। ব্রহ্মসঙ্গীত। ওই তুমি, ওই প্রভু! মধ্যে মধ্যে হাসি পায় কপিলদেবের। কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় শান্তি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, বলেছিল—কি ক'রে বলছ এ সব কথা? রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে এখানে এসে কি হ'ত আমাদের? এ কথা ভাবতে পারেন?

অসহিষ্ণু হয়ে সে বলেছিল—খুব পারি। রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় একজন না জন্মালেও তাঁর থেকে ছোট অনেক জন জন্মে তাঁর স্থান পূর্ণ করতেন। স্থান অপূর্ণ থাকত না।

শান্তি অবাক হয়ে যায়। বুঝতে পারে না সে, এ কি একটা কথা! কপিলদেব বিচিত্র হাসি হেসে তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝায়। তর্কে তাকে হারিয়ে দেয়। শান্তি কিন্তু তর্কে হার মেনেও বুঝতে চায় না। ওই মন, সেকেলে মন! এ মন ব্যাধিগ্রস্ত। এ মন ভয়ঙ্কর না হলেও ভয়ের কারণ।

রমা, ওই চক্রবর্তী-বংশের বউ, সামান্য লেখাপড়া জানা মেয়ে—ও সে দিক দিয়ে শান্তির চেয়ে অনেক ভাল, অনেক প্রগতিশীল। ওর মধ্যে

আগুন লাগাবার উপাদান অনেক বেশী শান্তির চেয়ে। অনেক বেশী মূল্যবান উপাদান। কাঁচা লোহার মত; জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা—জৈব জীবনের কামনা বাসনার মাটি ও পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে; পুড়িয়ে গালিয়ে পান দিকে ওকে ইস্পাতে পরিণত করে যে যন্ত্রে পরিণত করবে তাই হবে। এদেশের সংস্কৃতি মিথ্যা, কৃত্রিম—তাই বার বার বিকৃত হয়ে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। হাপরের আগুন নয়, খড়ের আগুনের মত ক্ষীণপ্রাণ, ক্ষণজীবী অগ্নি-শিখা; দাউ দাউ করে শূন্যলোকে লক্‌লকে শিখা তুলে জ্বলে, দেখে মনে হয় আগুনের পূর্ণ শক্তি ওর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তাপমান পরিমাপ করলেই ভুল ভাঙবে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে, খড় জ্বলে নিবে ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছাই আর ছাই, ছাই আর ছাই; বিকৃত অন্ধ সংস্কার। সংস্কৃতি নাই। বুকের মধ্যে ক্ষুধা, লক্ষ রকমের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনন্ত তৃষ্ণার মাটি এবং পাথরে ঢাকা মৌলিক ধাতুর মত তার মনুষ্যত্ব তার সংগ্রামী চেতনা অনাবিষ্কৃতের মত পড়ে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাপরের আগুন জ্বালতে হবে। এ দেশের কপচানো বুলির হোমাগ্নি নয়, কাঠের আগুন নয়; কয়লার আগুন; ইস্পাতের কারখানার ব্লাস্ট ফারনেসের মত আগুন, তাতেই গলবে এরা। খাঁটি শিক্ষার নানান ধাতুর মিশ্রণ দিয়ে খাঁটি ইস্পাতে পরিণত ক'রে বের ক'রে আনতে হবে।

রমা আশ্চর্য মেয়ে। তার জীবনের উপাদানে অদ্ভুত প্রাচুর্য। কল্পনার অতীত শক্তি। দরিদ্র ব্রাহ্মণবিধবার কন্যা, যোগীপাড়ার এই ধর্ম-ব্যবসায়ী চক্রবর্তী-বাড়ীতে দু বেলা ধর্মঠাকুরের সেবাপূজায় ব্যাপৃত থেকে, এদের বাড়ীতে অন্তত একশো বছরের ছাইগাদার তলায় চাপা পড়েও তার মনের ধাতু, সহজ জীবন বিকৃত হয় নি। জীবনের আবেগে, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। সহজ অবিকৃত জীবনের কামনায় ভরপুর। সে সুখ চায়, ভোগ চায়, তার রুচিবিকার নাই, কোন দুঃখ ওকে ম্লান করতে পারে না, কোন শাসনে ত্রস্ত নয়, আঘাত করলে অনুভব করা যায় বিস্ময়কর

কাঠিন্যে সে সুকঠিন এবং দৃঢ়, প্রতিঘাতে আঘাতের সমান আঘাত ফিরিয়ে দেয়। রমাকে গলিত করবার জন্য ওই হাপরের আগুন জেলেছে কপিলদেব।

শান্তি রমার তুলনায় উপাদানে অনেক কম মূল্যের। শান্তির জীবনের উপাদান নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর মামার সংস্পর্শদোষে। নন্দলালবাবু পুরনো কালের বিপ্লবী; ইয়োরোপের রাজনীতি সমাজ-নীতি ইতিহাস পড়ে ইংরেজের অধীনতার বেদনা অনুভব করতে পেরে-ছিলেন। ইংরেজী না পড়লে টুলো পণ্ডিতের ছেলে টোলে বসে ছাত্রদের বলতেন—ইংরেজের ভারতাধিকার বিধাতার নির্দেশের ফল। ভবিতব্য। কলির অমোঘ পরিণাম। সঙ্গে সঙ্গে শেখাতেন সর্বদেবো-ময়ো রাজা। এবং বলতেন—কল্কি অবতার রূপে ভগবান অবতীর্ণ হবেন এবং এই যবনাধিপত্য, ম্লেচ্ছাচারের প্রাধান্য রক্তস্রোতে মুছে দিয়ে আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঞ্জীবনী পান ক'রে মনের সাড়া ফিরে পেয়েছিলেন, অধীনতার বেদনা অনুভব করেছিলেন; ইয়োরোপের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে কল্কি অবতারের আবির্ভাবের দিন গণনার অভ্যাস ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য ছিল সেই সনাতন মতে ধর্মরাজ্য স্থাপন। সেই কায়েমী স্বার্থের খেলা। ইয়োরোপের ইতিহাসের ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে গীতা চণ্ডীর তত্ত্বকথা মিশিয়ে জগাখিচুড়ী তৈরী করেছিলেন। আঙুলের মত সরু অশ্বত্থশাখা দিয়ে জ্বালানো হোমের আগুনের চেয়ে বড়ো আগুন জ্বেলেছিলেন। পশ্চিমের আবিষ্কার কয়লার আগুন বটে কিন্তু স্টীল ফারনেস নয়, লোহার মিস্ত্রীদের কামারশালার একালের হাপর। স্মিথি কয়লার উনোনে চামড়ার হাপরের ফুৎকার। তার সঙ্গে ঘিয়ের ছিটে দিয়ে জাত রক্ষা করেছিলেন। জীবনের লোহা গালিয়ে তা থেকে ইস্পাত তৈরী করতে, অবৈজ্ঞানিক চিরকেলে মিশ্রণবস্তু ওই গীতা চণ্ডীতত্ত্ব মিশেল দিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য শত্রুনাশে নরহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং নিজে মৃত্যু

বরণের সাহস অর্জন করতে গীতার শ্লোক মুখস্থ করে আওড়াতেন। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের বিশ্বাস পেয়ে তবে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে পারতেন। তাতে নাকি ওজন বাড়ত এবং এমন ক্ষেত্রে 'ক' বলতেই কৃষ্ণস্মরণ করে চোখের জলে ভাসা দেশের লোকের আর রক্ষা থাকত না। মামা নন্দদুলালবাবুর কথা মনে ক'রে শান্তির চোখে আজও জল আসে। গোপনে হয়তো কাঁদে। কপিলদেবের সামনে কাঁদে না কাঁদতে সাহস করে না। মধ্যে মধ্যে কপিলদেবের মনে হয়, শান্তি শেষ পর্যন্ত পারবে না। পারবে না তার সঙ্গে তার পথে চলতে। নন্দদুলালবাবুর মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বকে স্বীকার করে তার আদর্শ সে গ্রহণ করেছিল। প্রথম প্রথম এই নতুন জীবনদর্শনকে গ্রহণ করতে প্রচণ্ড উৎসাহও দেখিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন কপিলদেব তাকে বলেছিল—তোমাকে আমি ভালবাসি শান্তি।

চমকে উঠেছিল শান্তি। তারপর আত্মসম্বরণ ক'রে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল ; সে তাকিয়ে থাকার অর্থ কপিলদেব ঠিক বুঝতে পারে নি।

অসহিষ্ণু কপিলদেব প্রশ্ন করেছিল—কি, এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যে!

শান্তি মৃদুস্বরে বলেছিল—মা বেঁচে থাকতে তো তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। তা ছাড়া মামার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলাম, দেশ যতদিন স্বাধীন না হবে ততদিন বিয়ে আমি করব না।

কপিলদেব হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিল। শক্ত মুঠোয় শান্তির হাত চেপে ধরে নিজের কাছে টানতে চেষ্টা করে বলেছিল—স্বাধীনতা আসবেই। সে আসবে রক্তবিপ্লবের মধ্যে। সে বিপ্লবের মধ্যে আমরা হয়তো থাকব না। আর তুমি তো জান, ও কালের পুরনো মনোভাব আমরা সমর্থন করি না। তুমি বিয়ে না করলে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট সময়ের এক-মিনিট আগে আসবে এ যদি প্রমাণ করতে পার তা হ'লে আমি মানতে পারি, নইলে নয়। বিপ্লবের আদর্শ ও সাগুলি

দিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর বাঁধবার জন্যে আমরা মিলব না। আমরা মিলব —আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে নিবিড় ভাবে পরস্পরকে ধরে বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুলতে।

পরমুহূর্তেই আবার সশব্দে হেসে উঠে বলেছিল—কথাগুলো নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল শান্তি। সাজানো কথা, গোছানো কথা। লোক ঠকাবার জন্যে লোকে বলে। আমি তোমাকে ঠকাতেও চাই নে, নিজেও ঠকতে চাই নে। ভারতের স্বাধীনতা, গণবিপ্লব চাই। নিশ্চয় চাই। তার জন্যে প্রাণ দিতে হয় দেব, যাদের প্রাণ নিতে হবে, নিতে পারব, নেব। লোকেদের উন্মত্ত ক'রে ছেড়ে দেব। কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুনকে পথ ধরিয়ে নিয়ে যাব। তার সঙ্গে বিয়ে করা, না-করার কোন সম্পর্ক নেই। তবে বিয়ে যেখানে করব, মেয়ে আর ছেলে যেখানে দেহকামনায় মিলবে, সেখানে দলের বাইরে যাওয়া হবে না। হতে পারে না। তুমি আমি দলেই রয়েছি। আমি তোমাকে চাই। এবং চেয়েছি যেখানে, সেখানে পেতে হবে।

শান্তি এর পরও সেদিন বলেছিল—না। সে হয় না কপিলদা।

কিন্তু ধীরে ধীরে কপিল তাকে আকর্ষণ করে অভিভূতের মত নিজের কাছে টেনে নিয়ে এসেছে। এনেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারছে না। নিজেই সে জন্যে সে বিস্ময় অনুভব করে। আরও একটা শক্তি আছে, সে শক্তি শান্তিকে রক্ষা করে অক্ষয় কবচের মত। সে শক্তি হ'ল শান্তির মা—দেবকী দেবী, ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে কপিলদেব নিজেকে দুর্বল অনুভব করে। নন্দদুলালবাবুর কাছে সে যখন প্রথম বিপ্লববাদে দীক্ষা নিয়েছিল তখন সে ছিল তরুণ কিশোর; বয়স তখন পনের কি ষোল। তখন সে দেখেছে দেবকী দেবীর সে কি আধিপত্য নন্দদুলালবাবুর উপর। উনিশ শো তিরিশ সালে—চট্টগ্রাম আর্মারি রেডের আগে, তখন জেলায় জেলায় একটি নির্দিষ্ট দিনে সশস্ত্র বিপ্লব করবার পরিকল্পনা চলছে, সেই সময় নন্দদুলালবাবু গ্রামে দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিদায় নেওয়ার। সঙ্গে

কপিলদেব ছিল। তখন দেবকী দেবী বিধবা হয়েছেন, ধর্মজীবন যাপন করছেন। শান্তি তখন ছোট। রাত্রে দেবকী দেবীর সঙ্গে নন্দদুলাল-বাবুর যে কথাগুলি হয়েছিল সেগুলি তার মনে আশ্চর্যভাবে ভয়ের উদ্রেক করেছিল। নন্দবাবু দিদিকে বলেছিলেন—আমি বলি, তুমি শান্তিকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাও এ সময়। জামাইবাবুর তো আরও দুই বিয়ে ছিল; সেই রকম কোন জায়গায় চলে যাও। আমাদের এবার এস্পার, নয় ওস্পার। আমরাও ছাড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। ওরা ঘা খেয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কামড়াবে। আমার উপর আক্রোশ তোমার ওপর মেটাবে। মেরে ফেললে দুঃখ করব না। কিন্তু মরার বাড়া যদি কিছু করে? মরার বাড়া গাল নেই বলে নাকি একটা কথা আছে। কিন্তু কথাটা ভুল দিদি। মরার বাড়া অবস্থাও আছে, গালিও আছে। অন্তত যারা জীবনের চেয়ে ধর্মকে বড় ব'লে মানে, ইজ্জতকে বড় ব'লে মানে তাদের কাছে আছে।

দেবকী দেবী দেওয়ালে ঝুলানো রামদাও খুলে নিয়ে বলেছিলেন—ভাবিস নে। এ দাওয়ে কালীপুজোয় অনেক বলি হয়েছে; এখানা আমার হাতে রইল। শান্তিকে আগে কেটে তারপর নিজের ঘাড় কোপাব।

দেবকী দেবীর সেই মূর্তি আর মৃদুস্বরের সেই কথাগুলি শুনে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল। কিছুদিন পর, তখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, মারাত্মক ভুলের জন্য একসঙ্গে বাংলাদেশ-জোড়া বিপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিবর্তে চট্টগ্রামে আর্মারি রেড হয়ে গেল সর্বাগ্রে, বিচ্ছিন্ন ভাবে; দেশ-জোড়া ধরপাকড় স্থরু হয়ে গেল। নন্দবাবু তখন আত্মগোপন ক'রে আছেন। কপিলদেবও তাঁর সঙ্গে। সেই সময় আবার একদিন যেতে হয়েছিল কপিলদেবকে—দেবকী দেবীর কাছে। গরু ছাগলের ব্যাপারী সেজে গিয়েছিল। হাতে লম্বা লাঠি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা ছেঁড়া ফতুয়া, মাথায় একটা টুপি, খালি পা, দড়ি বেঁধে দুটো ছাগল নিয়ে গিয়েছিল। বেলা থাকতে পৌঁছুনো সম্ভবপর হয় নি,

গ্রামে ঢুকতে সন্ধ্যে পার হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান-বাড়ীতে আশ্রয় না-নিয়ে উপায় ছিল না। নিযুতি রাত্রে সন্তর্পণে উঠে নন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়ে ডেকেছিল। দরজা খুলে দিতে দেবকী দেবীর দেরী হয় নি। আবার দাওখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতেও ভুল হয় নি। সে মূর্তি মনে আছে। আলো-হাতে সামনে ছিল শান্তি তার পিছনে দাও-হাতে দেবকী দেবী। চোখে স্থির দৃষ্টি; সে দৃষ্টি মর্মভেদী এবং সংকল্পে দৃঢ়। সে কণ্ঠস্বর আজও কানের পাশে বাজে। কে তুমি? কি চাই? শান্তি আলোটা ভাল করে ধর তো!

পরমুহূর্তেই বলেছিলেন—ও। কপিল! এসো।

ওই দেবকী দেবী যেন শান্তিকে ধরে রেখেছেন; সে হাত ছাড়িয়ে শান্তিকে একবারে নিজের আয়ত্তে নেবায় সংকল্প করতে গেলেই দেবকী দেবীর সেই মূর্তি মনে পড়ে।

শান্তির মধ্যেও দেবকী দেবীর ছায়া আছে বোধ হয়। প্রথম প্রথম বুঝতে পারে নি, এখন বুঝতে পারছে। শান্তি অনায়াসে তার জন্য অপবাদ বরণ ক'রে নিতে দ্বিধা করলে না। কিন্তু তার দিকে এক পা এগিয়েও এল না। তার জন্যে কপিলদেবের ক্ষোভ নেই মনের মধ্যে। প্রেম সে মানে না। ওটা নিতান্তই একটা বিকার। ওই অহিংসার মত একটা অসার কল্পনা। জীবনে চলার পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত নারীপুরুষের দেহগত ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন আছে এই মাত্র। ও নিয়ে কাব্য হয়, ও নিয়ে বিলাস করা যায়; বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই যেখানে, সেখানে কোন মূল্য নেই তার। এই সব নিয়েই তার কোন দলের সঙ্গে মতে মিলল না। রাজনৈতিক দলের লোকেরা বলে—তাঁরা তাকে দল থেকে বের করে দিয়েছে। কপিলদেব বলে—আমিই ওদের ছেড়ে দিয়েছি। ওদের রাজনীতি আছে। তাও ভুলে ভরা। নিত্য নতুন ভুল করছে। ওদের জীবনদর্শন নেই। ওরা গাধাবোট। আমি তা নই। আমি নিজে চলি। জীবনে আমার জীবনদর্শন আছে। জীবনদর্শন আমার রাজনীতি।

দর্শন আছে ব'লেই শান্তিকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করছে সে। নইলে অনুগত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে শান্তির তুলনা নেই। কোন নির্দেশ সে অমান্য করে না। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে যায়। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনের আচার আচরণের নির্দিষ্ট নিয়ম থেকে একচুল সে নড়ে না। শান্তির উপর ঠিক সেই কারণেই তার আস্থা কমে আসছে। শান্তির জীবনের 'মেটালে'র চরম পরিণতি হয়ে গেছে। ওর জীবন-বিশ্বাসে আর কোন নূতন সত্য মিশ খাবে না। এই দিক দিয়ে রমার উপর ভরসা তার অনেক বেশী। কাঁচা লোহা, ওকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে তৈরী ক'রে নেওয়া যাবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই বিপ্লব চেয়েছিল শান্তি, ওটা ওর আদর্শ। রমার জীবনে বিপ্লব আদর্শ নয়; ওর জীবনের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা। অনেক অবিচার সে পেয়েছে জীবনে, অনেক ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। অনেক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে, বিপ্লবে তাই পূর্ণ হবে। ভাঙনের মধ্যেই গড়ে উঠবে।

ভাগ্য, অদৃষ্ট—এসব কপিলদেব মানে না। কিন্তু রমাকে পাওয়াটাকে সৌভাগ্য বলতে সে আপত্তি করে না। এ অঞ্চলে সে কাজ করছে অনেক দিন থেকে। ষড়যন্ত্র-মামলায় জেল হয়েছিল সাঁইত্রিশ আটত্রিশ সালে। জেলে থাকতেই সে এই নূতন জীবনদর্শনকে গ্রহণ করে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে জেল-জীবনের বন্ধুর সঙ্গে এই অঞ্চলকেই কর্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিল। নন্দদুলালবাবুর সঙ্গে বিরোধ অবশ্যভাবী বলেই সে নিজের অঞ্চলে ফিরে যায় নি। নন্দদুলাল-বাবু অবশ্য বেশী দিন বাঁচেন নি। বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বছর দুয়ের মধ্যেই এ অঞ্চলে তার কর্মক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত হয়ে উঠেছিল। কর্মসূত্রেই আলাপ হয়েছিল এই চক্রবর্তী-বংশের কিশোরী মোক্তারের সঙ্গে। বৈশাখের আগুনের মত উগ্র, ক্ষুধার্ত। কাঁচা গাছে লাগতে পেলে কাঁচাগাছকে শুকিয়ে নিয়ে জ্বলিয়ে আত্মসাৎ করে দেয়। কিসের ক্ষুধা নেই? কিসের বিরুদ্ধেই

বা ক্ষোভ নেই? সম্পদের ক্ষুধা প্রবল, চক্রবর্তী-বংশের নিষ্কর জোতজমা ধর্মরাজের প্রণামীর অংশ তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। নবগ্রামের বাবুদের জমিদারী সম্পত্তি ও সম্পদের উপর নিদারুণ আক্রোশ; সদরের উকীলদের পসারের উপর নিষ্ঠুর ঈর্ষা। প্রতিষ্ঠার ক্ষুধা সম্পদের ক্ষুধার চেয়েও উগ্র। এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মেম্বরদের উপর কঠিন ক্রোধ তার। কংগ্রেসের নেতাদের কঠোর সমালোচক সে। সব চেয়ে বেশী ক্ষোভ তার নবগ্রামের ব্রাহ্মণ এবং জমিদারদের উপর। ওদের অন্নবস্ত্রের জোগানদার প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজের উপর তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপ বর্ষণ করে কিশোরী মোক্তার। লোকটিকে চিনতে বুঝতে দেরী হয় নি তার। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল। বন্ধু নয়, কমরেড। বন্ধুত্ব হ'ল এদেশের সেই পুরনো কালের ভাবাবেগের আবিষ্কার। ওর চরম নিদর্শন হ'ল সব ত্যাগ ক'রে ভালবাসা। সব ত্যাগ ক'রে ভালবাসা! অর্থহীন, কুয়াশার মত না আলো না-অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-রতনের মত ফাঁকি। সিগারেটের ধোঁয়ার চেয়েও অসার খাদ্যবস্তু। বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর নূতন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এ যুগে—কমরেডশিপ। তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থ এক হ'লেই লক্ষ্য এক হবে, সেই লক্ষ্যে যাত্রাকালে এক পথে হাত ধরাধরি ক'রে যদি চল তবে আমরা কমরেড, বন্ধু; না চল, হাত না-ধর, তুমি আমার বন্ধু নও। বরং তুমি আমার শত্রু। এই ধরণের লোকের উপরেই কপিলদেবের বিশ্বাস দৃঢ়। যার 'স্ব' আছে তারই স্বার্থ আছে। যার স্বার্থ নেই তার 'স্ব' অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বই নেই। স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিদের নিয়ে বিপ্লবের ভরসা করে না কপিলদেব। কমরেড কিশোরী মোক্তারের হাত ধ'রে সে যোগীপুরের চক্রবর্তী-বাড়ীতে এসে রমাকে আবিষ্কার করেছে।

হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল কোথাও। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল কপিলদেবের। কি হ'ল? পরক্ষণেই সে হাসল। কি হবে? এই

যে কয়েক হাজার মানুষ জমেছে, এই যে মাটির বুকের খাঁটি মানুষ, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কামনায় বাসনায় জীবন্ত অবিকৃত মানুষ—এরা তো স্বার্থ-ত্যাগী নয়, স্বার্থবান মানুষ, এদের মধ্যে কারও গায়ে ধাক্কা লেগে কারও স্বার্থ পীড়িত হয়েছে; সেখানে আঘাতের ফলে প্রতিঘাত হতে বাধ্য। তাই হয়েছে। এই তো জীবন। সংগ্রাম! সংগ্রাম! নিয়ত সংঘর্ষ! মানুষে প্রকৃতিতে, মানুষে মানুষে, মানুষের নিজের মধ্যে নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম সংঘর্ষ, এই জীবন! বিপ্লবের বারুদ জমা হচ্ছে। কিন্তু কোলাহলটা যেন বাড়ছে। এবার একটু চিন্তিত হ'ল কপিলদেব। চিন্তা তার এক জায়গায়। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়াটা না হয়! জীবনের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম-শক্তিকে ঠিক এক পথে এক মুখে চালাতে না পারলে তার পরিকল্পনার বিপ্লব নষ্ট হবে। ওই ধর্মমতের পথে ও বেগ ঢুকলে আর ফেরানো যাবে না। ভারতবর্ষে এখনও ওই পথের খাতটা সম্পূর্ণরূপে মজে যায় নি। ছেচল্লিশ সালের সব বিপ্লব-পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে জীবনের বৈপ্লবিক জীবনাবেগ ওই খাত দিয়ে বয়ে চলে গেল। ওর মধ্যে কপিলদেবের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র আশ্বাস এই যে গান্ধীর অহিংসার সত্য মিথ্যা অলীক আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছে। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতি তার জন্মগত প্রবৃত্তির বিপরীত পথে যাবে কেন? সব জিনিসের একটা সীমা আছে। নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে পাশে ক্যানেল কেটে তাকে জমিতে জল-সেচের কাজে লাগানো যায়, খানিকটা উঁচুতে তোলা যায়, কিন্তু তাকে বিপরীতমুখী করা যায় না। গান্ধীর অহিংসা যদি মানুষের প্রকৃতিতে সম্ভবপর সত্য বলে প্রমাণিত হ'ত তা হ'লে কপিলদেবের বিশ্বাস মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হ'ত। শুধু তাই নয়, তা হ'লে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর মানুষ অবশ্যম্ভাবীরূপে আবার এই ধর্মের কুয়াশার মধ্যে পড়ে পথ হারাত। এবং কুয়াশাকেই ভাবত আলো-অন্ধকার-তিরোহিত সেই সনাতন চিরন্তন অবস্থা; সৃষ্টির আদি ও অন্তের মিলন-ভূমি। নির্বাণ, ফাইনালিটি। স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকাটার

মাঝখানের অশোকচক্রের দিকে তাকিয়ে কপিলদেবের অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করে। স্বাধীন ভারতবর্ষ! ইংরেজের উপনিবেশ। বাংলাদেশের জমিদারদের জমিদারীর ভেতরের খাসখামার।

ছুটে যাচ্ছে কিশোরী মোক্তার।

—কি হ'ল কিশোরীবাবু? অ কিশোরীবাবু!

থমকে দাঁড়াল কিশোরী মোক্তার।

—কি হয়েছে? ছুটছেন কেন? গোলমাল কিসের?

একটু হেসেই কিশোরী মোক্তার বললে—নবগ্রামের অক্ষয় ঘোষাল অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেষ্ট বাউরী তাকে এক চড় মেরেছে। মরে গেল কিনা বুঝছি না। আমাদের সত্যকে ডাকতে যাচ্ছি। আর রমা বউদিকেও একটা খবর দিই।

সত্য চক্রবর্তী কিশোরীর জ্ঞাতিভাই, ক্যাম্পবেল ইস্কুলের পাস-করা ডাক্তার। রমা অক্ষয় ঘোষালের সম্পর্কে যেন কি হয়।

* * * *

অক্ষয় ঘোষাল সম্পর্কে ভাই। কৃষ্ণকায় কঙ্কালসার সেই ব্যক্তিটি, যার কণ্ঠভরা বিষে সারা নবগ্রাম অহর্নিশ জর্জর। দিনরাত্রি যে নবগ্রামের প্রতিটি লোককে গালিগালাজ ক'রে বিচিত্র অহঙ্কার ও তৃপ্তি অনুভব করে। মহাদেব সরকারের দোসর। শান্তির বিরুদ্ধে কুৎসিত দরখাস্ত যারা করেছে তাদের অন্যতম নায়ক। পথেঘাটেও শান্তিকে শুনিয়ে গালিগালাজ করে। লোকটা গাঁজাখোর। এবং গাঁজাখোর হয়েও বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এবং হিসেবী লোক। এক সময় নিতান্ত সামান্য অবস্থা,—না, সে অবস্থার বিশেষণ সামান্যও নয়, তার বিশেষণ দুঃস্থ; দুরবস্থার মধ্যে জন্ম অক্ষয় ঘোষালের, তার মায়ের তখন ভিক্ষার উপর নির্ভর; ভিক্ষা ক'রেই অক্ষয়ের মা অক্ষয়কে মানুষ করেছিলেন, নবগ্রামের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর বরপুত্র গোপীচন্দ্রবাবু ইস্কুলে অক্ষয়কে ফ্রি ক'রে দিয়েছিলেন; সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত প'ড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল

অক্ষয়, তখন তাকে একটা চাকরীও দিয়েছিলেন, সেই চাকরীর সামান্ত সঞ্চয় নিয়ে অক্ষয় নিজের বিষয়বুদ্ধির উপর নির্ভর করে জীবন স্থরু ক'রে এখন মোটামুটি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এখন অনেক জমি, বাড়ীতে তার অনেক ধান, পোস্টাপিসে টাকাও আছে, পল্লীগ্রামের হিসেব অনুযায়ী তাকে লোকে মোটা টাকাই বলে থাকে। ধান এবং জিনিস বন্ধকী নিয়ে টাকা দাদনের কারবারই অক্ষয়ের মূল ব্যবসা। সেটা ওই কেষ্ট বাউরীদের মত অবস্থার লোকেদের মধ্যেই বেশীর ভাগ আবদ্ধ। অক্ষয়ের অর্থনীতিতে তিলের মূল্য সর্বাগ্রে; তিল থেকে তাল করে সে এবং সে তাল জমে জমে একদা পাহাড় হয়ে উঠবে এ আঙ্কিক নিয়ম মস্তিষ্কগত নয়, উপলব্ধিগত। এক টাকা থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত ধার দেয় সে, এবং বন্ধক রাখে সোনা রূপোর নাকছবি, মাকড়ী, চুড়ি, হার থেকে কাঁসা-পেতলের থালা ঘটি বাটী, এমন কি গাই বাছুর পর্যন্ত। টাকায় মাসে এক আনা অর্থাৎ শতকরা মাসিক ছ টাকা চার আনা, বার্ষিক পঁচাত্তর টাকা স্থদ। ধানের কারবারে শতকরা পঞ্চাশ টাকা স্থদ এবং বৎসরান্তে স্থদ শোধ না হ'লে আসল হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কাল আগে পর্যন্ত অক্ষয় ঘোষাল কেষ্টদের সমাজের স্বেচ্ছাচারী বিধাতা ছিল। এবং সে স্বেচ্ছাচারে কেষ্টই ছিল ঘোষালের দক্ষিণ হস্ত। সেই অক্ষয় ঘোষালকে এই মেলার মত জনাকীর্ণ স্থানে সকলজনের সামনে ওই কেষ্ট বাউরীই চড় কষিয়ে দিয়েছে?

সতর

ব্যাপারটার মূলে ঝড়ে-খসে-পড়া কয়েকটা আম।

গ্রামের বাইরে বাউরীপাড়ার প্রান্তে অক্ষয় ঘোষালের একটি ষোল আনা পুকুর আছে। অনেক কালের মজাপুকুর, পড়েই ছিল; মজাপুকুরটা সম্পর্কে অপপ্রবাদও অনেক ছিল; বাস্তববাদী দুঃসাহসী ঘোষাল পুকুরটা কিনে কাটিয়ে 'সরোবর' ক'রে তুলেছে। সরোবর কথাটা ঘোষালের

নিজের। পুকুর না, দীঘি না, ঝিল না, এমন কি সরোবরের অপভ্রংশ সায়রও ঘোষালের পছন্দ হয় না। বলে—সরোবর। সরোবরের চারিপাড়ে বাগানও লাগিয়েছে। বাগান বলতে এ অঞ্চলে সাধারণত কতকগুলি আঁটির আমের গাছ, তার সঙ্গে কয়েকটা কাঁঠাল, কয়েকটা জাম আর চারিপাশে ঘন-সন্নিবদ্ধ তালগাছের সারি, কেউ কেউ তালগাছের সারির মধ্যে তেঁতুলের গাছও লাগিয়ে থাকে। অক্ষয় ঘোষালের বাগানের বিশেষত্ব আছে—তার জন্য তার অহঙ্কারও অনেক। আঁটির গাছের সঙ্গে সাত-আটটা কলমের আমগাছ আছে, গোটা দুয়েক লিচু, চার-পাঁচটা জামরুল, ভাল বেল এবং একটা গোলাপজামের গাছ আছে। ঘোষালের ওই একটি ষোল আনা পুকুর এবং তার জীবনে তার দুই কীর্তির মধ্যে ওই একটি কীর্তি এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অপরটি তার বাড়ি। বাড়ি যে যেমনই করুক, এ সংসারে সে বাড়িকে ভোগ ষোল আনা নিজে নিজেই মানুষ করে বলে তাকে বড় বলে জাহির করা যায় না। পুকুর এবং বাগানের জল ও ছায়া এ সর্বসাধারণে ভোগ করে, বাড়ির জন্যে পাঁচ সের মাছ ধরিয়ে পাঁচ ছটাকও প্রতিবেশীর বাড়ি দেওয়া যায়, কখনও সখনও দরিদ্র প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে সের দুই আড়াই খয়রাতও করা হয়। এবং ফলের বেলাতেও তাই—ঝুড়ি দরুনে আম এলে দশটা ছেলের হাতে দশটা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি দু-এক গণ্ডা হিসেবে বিলিয়ে দান-ধর্মের পুণ্যাস্বাদন করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাতা নামের অধিকারীও হওয়া যায়। সুতরাং বাড়ির থেকে বাগান-পুকুর কীর্তি হিসেবে বড়। এই একটিমাত্র বৃহৎ কীর্তির অহঙ্কারে ঘোষাল দস্তুরমত অহঙ্কৃত। কারণ বাগানে কলমের গাছ আছে, লিচু জামরুল গোলাপজামের গাছ আছে; পুকুরে অবশ্য মাছের বৈচিত্র্য নাই, সেই রুই, কাতল, মৃগেল। কিন্তু ঘোষাল বলে—মাছ এমন বাড়ে না কোন পুকুরে। আর টেস্ট! টাটকা মাছ অল্প একটু তেল দিয়ে ছেড়ে দাও, মাছভাজা নামিয়ে তেল মেপে নাও, দেখ এক ছটাক তেল আধ পো তো হয়েছেই, তিন ছটাকও হয় আমি মেপে দেখেছি।

শুধু এইটুকুই সব নয়, আরও আছে। এই অপপ্রবাদজড়িত পুকুরটি কাটাবার সময় পাঁকের নীচের স্তরে একটি হাঁড়ি পেয়েছিল সে। সরা দিয়ে মুখ-বন্ধ ছোট একটি হাঁড়ি। তার ভিতরে কয়েকটি কড়ি, কয়েক টুকরো হাড়ের মত সামগ্রী, দুটি রুদ্রাক্ষ এবং আরও যেন কি কি। দুঃসাহসী ঘোষাল-যে-ঘোষাল সেও ভয় পেয়েছিল। স্থানীয় লোকে সকলেই বলেছিল—অক্ষয় এইবার মরবে। কারণ অক্ষয়ের সংসারে তখন এক অক্ষয় ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নাই। প্রথম পক্ষ তখন বিগত। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র পুত্র সে এক স্বৈরিণীকে নিয়ে পলাতক হয়ে দেশত্যাগী। অক্ষয় তখন গঞ্জিকা সেবন করে—বোম বোম করে গ্রামের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় এবং সুদ আদায় করে। তবুও অক্ষয় সেই হাঁড়িটা পেয়ে শঙ্কিত হয়েছিল। তার এ শঙ্কা দূর করেছিলেন এখানকার বৃদ্ধ তান্ত্রিক হরিশ ভট্টাচার্য। তিনি একদিন এসে হাজির হয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন—ঘোষাল, তোমার পুকুর থেকে কি যেন উঠেছে শুনলাম। অস্থি, রুদ্রাক্ষ, কড়ি? কি বিবরণ বল তো? দেখাও দেখি।

ঘোষাল আগ্রহ করেই হরিশ ভটচাজকে পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে সব পুকুরপাড়েই আছে। ঘরে আনবে কি সাহসে? ভটচাজ জিনিসগুলি দেখে একটু হেসে বলেছিলেন—কই, তোমার হাতখানা দেখি বাবা।

হাতখানি দেখে বলেছিলেন—তোমার কোষ্ঠী আছে?

—কোষ্ঠী নাই। ঠিকুজী আছে।

—চল তো, দেখি!

ঠিকুজীখানা দেখে বলেছিলেন—হুঁ। ঠিক আছে।

—কি ঠিক আছে বলুন তো?

—বয়স তো পয়তাল্লিশ হ'ল তোমার?

—হ্যাঁ। চুয়াল্লিশ বছর দু মাস, ক' দিন।

—হুঁ। পঞ্চাশ বছরে তোমার রাজচক্রবর্তীযোগ আছে।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঘোষালের। রাজচক্রবর্তীযোগ!

—হ্যাঁ, বাবা। আমি একবার তোমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কোষ্ঠী দেখেছিলাম। তাঁর যে যোগ ছিল—তোমারও বাবা প্রায় সেই যোগ। একেবারে তাই। আসছে, দেরী নাই। তোমার ঠিকুজী আমি নিয়ে চললাম, কোষ্ঠী ক'রে এনে দেব, দেখবে তখন। পয়সাকড়ি আমি নোব না। লাগবে না তোমাকে। তুমি বাবা এগুলি ঘরে নিয়ে যাও। বেশ ক'রে গঙ্গাজলে ধুয়ে একখানি পাটের কাপড়ে বেঁধে তুমি লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রেখে দিয়ো। বুঝেছ ! অবশ্য এ কাজ পত্নীতে করলেই ভাল হ'ত। তা—। হেসে বলেছিলেন—পত্নী যখন নাই তখন তুমিই ক'রো।

ঘোষাল বোবা হয়ে গিয়েছিল। হাঁ ক'রে শুনছিল। কানের পাশে শুধুই বাজছিল রাজচক্রবর্তী ! রাজচক্রবর্তী ! রাজচক্রবর্তী ! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন !

সেই দিনই ঘোষাল পট্টবস্ত্র পরে হাঁড়ি মাথায় ক'রে বাড়ী এল। প্রতিষ্ঠা করলে হাঁড়ি-কড়ি-হাড়ের। তারপর কোষ্ঠী এল। কিছুদিন পরই হঠাৎ ঘোষাল দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এল। বউ নয়, রাণী চক্রবর্তিনী। এবং সদম্ভে বেড়াতে লাগল বক্তৃতা অভ্যাস করে।

নবগ্রামের সকল রকম প্রতিষ্ঠানে সকল রকম কোলাহলে কলহে সে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। ওই অট্টহাস দেবস্থলের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড, রামের সঙ্গে শ্যামের কলহে পর্যন্ত অক্ষয় ঘোষাল নিয়মিতভাবে ছুটে যেতে লাগল। মহাদেব সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, নবগ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই স্থুরু করলে, কিন্তু সকল স্থান থেকেই সে সরে আসতে বাধ্য হ'ল। শুধু ওই বাউরীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তৃত্ব-লাভটা কেউ ঠেকাতে পারলে না। তখন একদিন সে ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে কোষ্ঠী খুলে গণনার কাগজখানা বের করে পড়ে দেখলে যে, যে বয়সের মধ্যে তার 'রাজ-চক্রবর্তী'ত্ব যোগটা ছিল, সেটা পার হয়ে গেছে। হরিশ ভটচাজ তখন দেহ রেখেছে ঘোষাল নতুন গণক ডাকলে। গণক বললে—যোগ তো ছিল, সে তে

মিথ্যে নয় বাবু। তবে কথা কি জানেন? বললে রাগ করবেন না তো? দেখুন সংসারে একই গাছের দুটি বীজ দুটি ক্ষেত্রে পড়ে ঠিক একরকম চেহারা তো নেয় না বাবু। ক্ষেত্রের উর্বরতার পার্থক্যে পার্থক্য ঘটে।

—তার মানে? আমি গরীবের ছেলে, আর চিত্তরঞ্জন বড়লোকের ছেলে?

—আজ্ঞে, তাও বটে আর তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ—এ দুয়েও কত প্রভেদ ভেবে দেখুন।

—কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে। ব'লে গণনার কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরোগুলোকে দেশলাই-জ্বেলে পুড়িয়ে রাজ-চক্রবর্তীত্বের আশার মুখে ছাই দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

তারপর থেকেই অক্ষয় ঘোষাল ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ক্রোধে এবং নিদারুণ তিক্ততায় নিজেকে—বাইরের দুনিয়া থেকে নিজের সংসার পর্যন্ত সর্বত্রই—দক্ষালয়ে বিরূপাক্ষের মত অসহনীয় করে তুললে। জীবনের দাক্ষিণ্য ও প্রসন্নতাময় অংশটাই যেন তার পাথর হয়ে জমে গেল। পৃথিবীতে মিত্র বলে কেউ তার রইল না। রইল শুধু শত্রু আর শত্রু। কুটিল বামচক্ষুর দৃষ্টি ও বামহস্তের করাঙ্গুলির গণনাই হ'ল তার সব।

কাল, ঝড়ের আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝড় অবশ্যম্ভাবী বুঝে ঘোষাল তার বড় ছেলেকে বলেছিল—ওরে, ঝড় উঠবে, তুই পুকুর পাড়ে যা। আম সব ভাঁসিয়েছে, পড়ে গাদি হয়ে যাবে।

ছেলের মা বলেছিল—এই ঝড়ে? দাঁড়াবে কোথায়?

—কেন? গাছতলায়।

—গাছতলায়! মা গো! যদি ডাল ভেঙে পড়ে! যদি শিল হয়! বাজ পড়ে!

মুহূর্তে অক্ষয়ের গঞ্জিকা-উগ্র মস্তিষ্কেই বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল; চীৎকার করে উঠেছিল—তা হ'লে মরবে। মরবে। বুঝলি, মরবে।

—হ্যাঁ, বাবা। আমি একবার তোমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কোষ্ঠী দেখেছিলাম। তাঁর যে যোগ ছিল—তোমারও বাবা প্রায় সেই যোগ। একেবারে তাই। আসছে, দেরী নাই। তোমার ঠিকুজী আমি নিয়ে চললাম, কোষ্ঠী ক'রে এনে দেব, দেখবে তখন। পয়সাকড়ি আমি নোব না। লাগবে না তোমাকে। তুমি বাবা এগুলি ঘরে নিয়ে যাও। বেশ ক'রে গঙ্গাজলে ধুয়ে একখানি পাটের কাপড়ে বেঁধে তুমি লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রেখে দিয়ো। বুঝেছ! অবশ্য এ কাজ পত্নীতে করলেই ভাল হ'ত। তা—। হেসে বলেছিলেন—পত্নী যখন নাই তখন তুমিই ক'রো।

ঘোষাল বোবা হয়ে গিয়েছিল। হাঁ ক'রে শুনছিল। কানের পাশে শুধুই বাজছিল রাজচক্রবর্তী! রাজচক্রবর্তী! রাজচক্রবর্তী! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

সেই দিনই ঘোষাল পট্টবস্ত্র পরে হাঁড়ি মাথায় ক'রে বাড়ী এল। প্রতিষ্ঠা করলে হাঁড়ি-কড়ি-হাড়ের। তারপর কোষ্ঠী এল। কিছুদিন পরই হঠাৎ ঘোষাল দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এল। বউ নয়, রাণী চক্রবর্তিনী। এবং সদম্ভে বেড়াতে লাগল বক্তৃতা অভ্যাস করে।

নবগ্রামের সকল রকম প্রতিষ্ঠানে সকল রকম কোলাহলে কলহে সে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। ওই অট্টহাস দেবস্থলের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড, রামের সঙ্গে শ্যামের কলহে পর্যন্ত অক্ষয় ঘোষাল নিয়মিতভাবে ছুটে যেতে লাগল। মহাদেব সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, নবগ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই সুরু করলে, কিন্তু সকল স্থান থেকেই সে সরে আসতে বাধ্য হ'ল। শুধু ওই বাউরীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তৃত্ব-লাভটা কেউ ঠেকাতে পারলে না। তখন একদিন সে ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে কোষ্ঠী খুলে গণনার কাগজখানা বের করে পড়ে দেখলে যে, যে বয়সের মধ্যে তার 'রাজ-চক্রবর্তী'ত্ব যোগটা ছিল, সেটা পার হয়ে গেছে। হরিশ ভটচাজ তখন দেহ রেখেছে। ঘোষাল নতুন গণক ডাকলে। গণক বললে—যোগ তো ছিল, সে তো

মিথ্যে নয় বাবু। তবে কথা কি জানেন? বললে রাগ করবেন না তো? দেখুন সংসারে একই গাছের দুটি বীজ দুটি ক্ষেত্রে পড়ে ঠিক একরকম চেহারা তো নেয় না বাবু। ক্ষেত্রের উর্বরতার পার্থক্যে পার্থক্য ঘটে।

—তার মানে? আমি গরীবের ছেলে, আর চিত্তরঞ্জন বড়লোকের ছেলে?

—আজ্ঞে, তাও বটে আর তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ—এ দুয়েও কত প্রভেদ ভেবে দেখুন।

—কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে। ব'লে গণনার কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরোগুলোকে দেশলাই-জ্বেলে পুড়িয়ে রাজ-চক্রবর্তীত্বের আশার মুখে ছাই দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

তারপর থেকেই অক্ষয় ঘোষাল ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ক্রোধে এবং নিদারুণ তিক্ততায় নিজেকে—বাইরের দুনিয়া থেকে নিজের সংসার পর্যন্ত সর্বত্রই—দক্ষালয়ে বিরূপাক্ষের মত অসহনীয় করে তুললে। জীবনের দাক্ষিণ্য ও প্রসন্নতাময় অংশটাই যেন তার পাথর হয়ে জমে গেল। পৃথিবীতে মিত্র বলে কেউ তার রইল না। রইল শুধু শত্রু আর শত্রু। কুটিল বামচক্ষুর দৃষ্টি ও বামহস্তের করাঙ্গুলির গণনাই হ'ল তার সব।

কাল, ঝড়ের আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝড় অবশ্যম্ভাবী বুঝে ঘোষাল তার বড় ছেলেকে বলেছিল—ওরে, ঝড় উঠবে, তুই পুকুর পাড়ে যা। আম সব ভাঁসিয়েছে, পড়ে গাদি হয়ে যাবে।

ছেলের মা বলেছিল—এই ঝড়ে? দাঁড়াবে কোথায়?

—কেন? গাছতলায়।

—গাছতলায়! মা গো! যদি ডাল ভেঙে পড়ে! যদি শিল হয়! বাজ পড়ে!

মুহূর্তে অক্ষয়ের গঞ্জিকা-উগ্র মস্তিষ্কেই বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল; চীৎকার করে উঠেছিল—তা হ'লে মরবে। মরবে। বুঝলি, মরবে।

অক্ষয়ের স্ত্রী—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং ব্যর্থ-রাজচক্রবর্তী ঘোষালের অনেক প্রত্যাশার ব্যর্থ-রাণীচক্রবর্তিনী। সেও ফোঁস করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে—কি বললি? ওরে ঘাটের মড়া! ওরে বুড়ো! আমার ছেলে মরবে? তার চেয়ে তুই মর্, তুই মর্, তুই মর্। আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে, শাখা ভেঙে, নোয়া ফেলে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

—আমি মরব? দন্তহীন মাড়ি বের করে দু হাত নেড়ে ঘোষাল বলেছিল—ওরে হারামজাদী, শূয়োরের পালের মা—তোদের ময়লা মাটির পিণ্ডি জোগাবে কে?

অক্ষয়ের স্ত্রী একেবারে বঙ্গদেশের সেই বিখ্যাত বাক্পটু বঙ্গ-ললনাদের যুগের এবং বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হয়েও অক্ষয়কে পেরে ওঠে না। কাজেই তাকে হার মানতে হয়েছিল। কিন্তু বাঁচিয়েছিল তাকে ঝড়টা। দেখতে দেখতে ঝড়টা একটা প্রবল ঝটকা মেরে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার করে দিয়ে এসে পড়েছিল। তার মধ্যে অক্ষয় ঘোষালও বিভ্রান্ত হয়ে বলে উঠেছিল—ওরে বাপ রে, এ যে প্রলয়! সুযোগ পেয়ে ছেলের মা ছেলের হাত ধরে ঘরে ঢুকে ছেলেকে বলেছিল—খবরদার বাবা, যাস নে তুই। জল-ঝড় থামুক, তারপর যাবি। ভয় নেই, কেউ যাবে না পুকুরপাড়ে। প্রাণের ভয় সবারই আছে। তার উপর তোর বাবার যা মুখ! কেউ যাবে না। পাকা আমের স্বাদের জন্যে কানে তপ্ত কথার ছেঁকা কোন লোকের সহ্য হবে না।

কথাটা কিন্তু সত্য হয় নি, তেমন লোকও আছে, অনেক আছে। এবং তাদের মধ্যে এককড়ি বাউরিনী একজন—কেষ্ট বাউরীর খুড়তুতো বোন। সে শুধু একজনই নয়, এমন জনেদের অগ্রবর্তিনী একজন। কড়ি ঠিক ঝড়ের মধ্যেই অক্ষয় ঘোষালের বাগানে এসে হাজির হয়েছিল।

ঝড় শেষ হতেই অক্ষয়ের ছেলে ছুটে গিয়েছিল বাগানে। অক্ষয় যেতে পারে নি, ঝড়ে তার ধানের একটা মরাইয়ের চাল উল্টে দিয়েছিল,

সে ছুটে গিয়েছিল তার মুসলমান কৃষাণের কাছে। তখন কড়ি বাগানে উপস্থিত। এক আঁচল আম কুড়িয়ে ঝড়ে-খসে-পড়া কয়েকখানা শুকনো তালপাতা জড়ো করে মাথায় তুলে বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। সে আম সে তালপাতা কেড়ে নিতে অক্ষয়ের ছেলের সাধ্য হয় নি। সে সমানে তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। বলেছিল—চিরকাল এ নিয়ম আছে; ঝড়ে-ঝরে-পড়া আম, তার উপর কারও স্বত্ব নাই। এবং এ অধিকার সেই আদ্যিকাল থেকে ভোগ করে আসছে তারা। আর তোমরা বাবুভাইয়েরা যে হাজার কাজ বিনি পয়সায় করিয়ে নাও, তার কি? এই তো সেদিন অক্ষয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে সে আসছিল, অক্ষয় যে তাকে বলেছিল—ওরে, নর্দামায় এই কাপড়খানা উড়ে পড়েছে, ওখানা তুলে পুকুরঘাটে নিয়ে গিয়ে কেচে দিয়ে যা দেখি! সে কি তা দেয় নি?

এ সব তকরারে কড়ির নৈপুণ্য অসাধারণ। এবং সে মুখরা। অক্ষয়ের ছেলেকে তকরারে হারিয়ে আম এবং তালপাতার বোঝা নিয়ে দিব্য গজেন্দ্রগমনে বিজয়িনীর মত চলে গিয়েছিল।

আজ রমার বাড়ীর নিমন্ত্রণে সকালবেলাতে অক্ষয় যোগীপাড়ায় এসেছে, নইলে কড়ি-বাউরিনীর দণ্ডবিধান সে পাড়ায় গিয়েই ক'রে আসত। একটু আগে খাওয়াদাওয়া করে ভক্ত দলের সঙ্গে বের হবে ব'লে বেরিয়ে এসে মেলার মধ্যে হঠাৎ কড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খাওয়ার আগেই অধিকাংশ গঞ্জিকাসেবী ক্ষুধার জন্য একবার গাঁজা খায়, অক্ষয়ও খেয়েছিল। তার উপর বৈশাখের উত্তাপ। অক্ষয় ঘোষাল কড়িকে দেখবা মাত্র—'হারামজাদী' সম্বোধন করে ধরেছিল চুলের মুঠোয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা 'হারামজাদা' শব্দ এসেছিল তার কানে; কে বললে দেখবার জন্য মুখ ফেরাতে ফেরাতে একটি সজোর চপেটাঘাত ধাঁই শব্দ ক'রে এসে লেগেছে তার গালে, এবং কড়ির চুল ছেড়ে একটা পাক খেয়ে ধড়াস ক'রে পড়ে গেছে সে কড়ির পায়ের তলায়।

* * *

কপিলদেব ভিড় ঠেলে এসে সেখানে দাঁড়াল। অক্ষয় ঘোষাল তখন কোন রকমে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। কেষ্ট বাউরী তার দলবল নিয়ে সরে গেছে। একপাশে কড়ি বাউরিনী শুধু বন্দিনী অবস্থায় হাঁউমাউ করে কাঁদছে। কড়ি পালাতে পারে নি। লোকজনে ওকে ঘিরে রেখেছে। ওপাশ থেকে ঠিক এই মুহূর্তেই এসে হাজির হ'ল রমা। দেওর কিশোরী মোক্তারের কাছে খবর পেয়ে সেও ছুটে এসেছে। ঘোষাল তার মাতৃকুলের আপনার লোক; সম্পর্কে মামাতো ভাই; তার উপর আজ সে এখানে তার বাড়ীতেই কুটম্ব হিসাবে এসেছে। সুতরাং তার আসবারই কথা। অক্ষয়ের উপর মমতা স্নেহ তার বিশেষ নেই। সংসারে আপনার বলে কাউকে রমা স্বীকার করে না। সে এসেছে শুধু কর্তব্য পালন করতে। ঘোষালের হাত ধ'রে সে বললে—ওঠ। চল, বাড়ী চল।

—নাঃ। অক্ষয় ঘাড় নাড়লে।

—আমার অনেক কাজ অকুদা। চল। এই রোদে ব'সে থাকে না, চল।

—আমি থানায় যাব। ডায়েরী করব। আমাকে একটা গরুর গাড়ী ক'রে দে।

—কি ব'লে ডাইরী করবে? তুমি কড়ির চুলে ধরেছিলে? তাই কেষ্ট বাউরী তোমাকে চড় মেরেছে? মামলা করলে তার সাজা হয়তো হবে। কিন্তু কড়ি নালিশ করলে তার চেয়ে বেশী সাজা হবে না তোমার?

অক্ষয় ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল রমার মুখের দিকে। তার কথার জবাব খুঁজে পেলে না। তার মুখভঙ্গি দেখে রমার হাসি পেল। আত্মসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ক্ষীণরেখায় হাসির আভাস তার ঠোঁটের ডগায় ফুটে উঠল।

অক্ষয় ওর হাসি থেকে কথা খুঁজে পেলে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—তুই হাসছিস? তুই হাসছিস?

রমা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে এবার সত্য সত্যই হেসে ফেললে। বললে—না হেসে কি করব বল? যে রকম তুমি করছ!

চীৎকার ক'রে উঠল অক্ষয়—হে ভগবান, হে সূর্যদেব, হে ধর্মরাজ! এই বৈশাখ মাস—আমি ব্রাহ্মণ—

বাধা দিয়ে রমা বললে—হয়েছে। ভগবান বজ্রাঘাত করবেন। এখন ওঠ। আর লোক হাসিয়ো না।

অক্ষয় উঠল কিন্তু রমার কথামত তার বাড়ীর দিকে গেল না, সে ভিড় ঠেলে নবগ্রামের পথ ধরল; চীৎকার সে থামায় নি—সমানে চীৎকার করে চলেছিল—হবে—হবে। বজ্রাঘাত হবে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হবে। মাথায় সর্পদংশন হবে।

প্রতিশোধ নেবার শক্তি নাই অক্ষয়ের। মামলা করবারও উপায় নাই। কড়ি মেয়েছেলে, তাকে সেই চুলে ধরেছে আগে। কথাটা তাকে রমাই মনে পড়িয়ে দিয়েছে। নিরুপায় অক্ষয় প্রথমেই এল নবগ্রামের দক্ষিণপাড়ায়। এই দক্ষিণপাড়াই নবগ্রামের সর্ব্বশেষ অভিজাতদের পাড়া। এই পাড়াতেই স্বর্ণবাবুর বাস ছিল, তাঁর বংশধরেরা আজও রয়েছে, ওই শান্তির বাবা সন্তোষবাবুর শ্বশুরবাড়ী। এই পাড়াতেই এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ধনী গোপীকান্তবাবুর বাড়ী। গুণী তাঁর বংশধর। গুণী এখানে থাকে না, কিন্তু তার কাছারী এখানে আছে। লোকজন ম্যানেজার আছে। এই পাড়াতেই গৌরীকান্ত ও বিজয়ের বাড়ী। কিশোরবাবুও এই পাড়ার লোক। বিচার প্রার্থনা করে অক্ষয় দুয়ারে দুয়ারে ঘুরল; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সবাই তাকে বললে এক কথা—মেয়েছেলের গায়ে হাত তুললে কেন?

কিশোরবাবু বললেন—তুই আর এত ক'রে গাঁজা খাস নে অক্ষয়।

নিরুপায় হয়ে অক্ষয় ফিরল। চীৎকার করতে করতেই ফিরল।

চীৎকার করে অভিসম্পাত দিয়ে কুৎসা রটনা করে আকাশ পর্যন্ত বায়ুস্তর দূষিত করে তুললে। ক্ষমা কাউকে করলে না।

কিশোরকে বললে—তুমি ভণ্ড, তুমি ইতর, ধার্মিকতার অন্তরালে তুমি—তুমি—তুমি দেশটাকে দিয়েছ উচ্ছন্নে।

স্বর্ণবাবুর বংশধরকে বললে, গুণীকে উদ্দেশ করে বললে। বললে—নবগ্রামের পুঞ্জীভূত পাপে আজ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের আগুন লাগল। এইবার দাউ-দাউ করে জ্বলবে। তাকিয়ে দেখ—ওই অট্টহাসের ডাঙার দিকে। চেয়ে দেখ ওই মহাপীঠ অট্টহাসের পূর্বদিকে রুক্ষ তৃণহীন প্রান্তরের দিকে। নাম পোড়াডাঙা। ধূ-ধূ করছে লাল মাটি। ওইখানে ছিল এককালে সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে কোন এক যুগে বিরাট নগর। সে নগর অপমানিত রাজগুরুর অভিশাপে পুড়ে ছারখার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ঘাস জন্মায় না। জন্মাবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণের অভিশাপ।

অক্ষয় ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলে এই কথা—এই কাহিনী। নূতন করে উপবীত ধারণ করে মহাপীঠ অট্টহাসে গিয়ে স্নান করে দেবীর পূজা করে হাত জোড় করে বললে—তুমি ব্রাহ্মণের মান-রক্ষা কর।

বেরিয়ে এসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দু' হাত তুলে উপবীত ধরে বললে—হে দিনের ঠাকুর, তুমি এর বিচার কর।

মনে মনে সে কল্পনা করলে—কাল রাত্রি-প্রভাতে ওই [illegible]পাড়ার প্রান্তে বাউরীপাড়ার আকাশ দীর্ণ করে উঠবে ক্রন্দনরোল, কানাইয়ের মোটা চেরা-গলায় আর্ত চীৎকারের সঙ্গে নারীকণ্ঠের কান্না—ওরে বাবা রে—ওরে মাণিক রে!

কাল রাত্রে কানাইয়ের দুটি ছেলের দুটিই গিয়েছে। সর্পাঘাত হয়েছে। অথবা মহামারী হয়েছিল। কলেরা। ডাক্তার বৈদ্য অনেক করেছিল কানাই; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

শুনবে বিজয় মরণাপন্ন। হঠাৎ পড়ে গিয়ে অ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোক হয়েছে। কিংবা কেউ খুন করেছে।

শুনবে স্বর্ণবাবুর বাড়ীতে মহা বিপদ।

শুনবে জিপ উল্টে শশী হাসপাতালে গিয়েছে—এখন-তখন অবস্থা।

শুনবে গৌরীকান্তের বাড়িটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বিকেলবেলা সে রাস্তায় বের হ'ল। তখন সে যেন অন্য অক্ষয় ঘোষাল—সে তখন চীৎকার ক্ষান্ত ক'রে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চলে গেল শেখপাড়া। সেখানে সইদ শেখ জোবেদ আলিকে ডেকে নিয়ে বললে—যে কোন উপায়ে হাটে মাঠে ঘাটে, যেখানে হোক, গায়ে পড়ে ঝগড়া করে কেষ্ট বাউরীর হাতখানা ভেঙে দিতে হবে। দশ টাকা দেব আমি। মামলা মোকদ্দমা হয়, তার খরচও দেব। বিজয়কে ঘায়েল করতে পারলে একশো টাকা। ইতিমধ্যে সে খবর পেয়েছে যে, বিজয় কেষ্ট বাউরীর বাড়ী গিয়ে তাকে শুধু অভয় দিয়েই আসে নি—তাকে উৎসাহিত করেও এসেছে। কেষ্টর চেয়ে বড় শত্রু তার ওই বিজয়।

সইদ, জোবেদ এ কাজ পারে না তা নয়। খুব পারে। অন্তত বছর দেড়েক আগে অনায়াসেই পারত। কিন্তু এখন তাদের শক্তি থাকলেও সাহস নাই। তারা এ অঞ্চলের লাঠিয়াল-শ্রেণীর লোক। অক্ষয়ের সঙ্গে সদ্ভাবও অনেক দিনের। এই কেষ্ট প্রভৃতি খাতকদের ভয় দেখাবার জন্যই ঘোষাল ওদের হাতে রাখত। অভাবের সময় অক্ষয় ঘোষাল আজও তাদের ধান দেয়, টাকাও দেয়; বিনিময়ে তারা ঘোষালের দাদন আদায়ে সাহায্য করে, দু-চারটে ডাক-হাঁক করে দেয় প্রয়োজনমত। তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমাদের কোমর ভেঙে গিয়েছে ঘোষাল মশায়, আমরা জ্যান্তে মরার সামিল। কোন মুসলমান হ'ত তবে তা পারতাম। কিন্তু হিঁদুর গায়ে হাত তুললে দাঙ্গা লেগে যায় তো সব্বনাশ হয়ে যাবে। ইয়ার লেগে কোনও হিঁদুকে দেখেন।

নিরুপায় হয়ে ফিরতে হ'ল অক্ষয়কে।

মনে মনে বলতে হয়—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

* * *

না। মিথ্যে নয়। সত্য। তার ব্রাহ্মণত্ব সত্য। তার অভিশাপ সত্য। বিজয়ের তিন বছরের ছেলেটা জলে ডুবে গেল তার চোখের সামনে।

ঠিক পনের দিন পর। বেলা প্রায় দুটো, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ। অক্ষয় ঘোষাল বের হয়েছিল সেই রৌদ্রে। বের হয়েছিল চিনি এবং কেরোসিন সংগ্রহের জন্য। কন্ট্রোলের বাজারে আজ চিনি কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। কার্ডে যা পাওয়া যায় তাতে গরীবগুলোর চলে। কিন্তু ভদ্রলোকের চলে না। গরীবগুলো যারা তারা অধিকাংশই তাদের চিনি কেরোসিন কিছু চড়াদাম নিয়ে ভদ্র-জনেদের বিক্রী ক'রে দেয়। কেষ্টদের সম্প্রদায়ের অনেক লোকই অক্ষয় ঘোষালের খাতক। অক্ষয় সেই দাবীতে অন্যের চেয়ে কম দামে তাদের কাছে চিনি কেরোসিন সংগ্রহ করে। সেদিনও সেই সন্ধানে গিয়েছিল বায়েনপাড়ায়। দুপুরবেলা ছাড়া অন্য সময়ে এ কাজে যাওয়ার বিপদ আছে। কিশোর মুখুজ্জে জানতে পারলে ক্ষমা করবে না। বিজয় তার শত্রু। তার কার্ড বাতিল করবে, যে বেচেছে তার কার্ডও যাবে, হয়তো বা পুলিস পর্যন্ত যাবে। জ্যৈষ্ঠের বেলা-দুপুর রাত্রি-দুপুরের চেয়েও নিরাপদ। তাই ভর্তি দুপুরবেলা সে বের হয়েছিল। কিন্তু বায়েন-পাড়ায় এসে তার আর ক্ষোভের সীমা রইল না। অনি বায়েন বায়েন-পাড়ার মাতব্বর, সে বললে—রুপায় নাই ঘোষাল মশায়।

—উপায় নাই? মানে?

—চিনি কেরাচিনি বেচা বারণ হয়ে গিয়েছে। আপনকাকে তো নয়ই।

—কে বারণ করেছে? কোন্ হারামজাদা?

চুপ ক'রে রইল অনি। অনির বউ হঠাৎ বেরিয়ে এসে মাথার

ঘোমটাটা বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় বললে—বুঝতে পারছ না মাশায়? ওই যে, আপনকার যারা শত্তুরু—তারাই—

আঙুলটা কেষ্টর বাড়ীর দিকে। কেষ্টর বাড়ী এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। কাছেই। বাউরী ও বায়েন-পাড়ার একতলা মেটে ঘরগুলোর মধ্যে কেষ্টর কোঠা বাড়ীর চালটা দেখা যাচ্ছে; নতুন ছাউনীর টাটকা খড়ের সোনালী রঙ ঝলমল করছে।

—কেষ্ট বাউরী?

—বোঝ তো সবই আপুনি। কেষ্টর বুকের পাটা কি পিছুতে লোক না থাকলে এত বড় হয়! আশেপাশে লোক আছে মাশায়। আপুনি—চিনি কেরাচিনি হাতে করবে—আর থপ ক'রে এসে ধরবে। আপনকার সঙ্গে আমরাও যাব।

বিজয়! বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, কষ্ট হ'ল না ঘোষালের। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ সে 'আচ্ছা' বলেই হন হন ক'রে চলতে সুরু করলে। খানিকটা দূর এসেই সে পথ পরিবর্তন করলে। পথ ধরলে বিজয়ের বাড়ীর দিকে। বিজয়কে অভিসম্পাত দিয়ে গালিগালাজ করে তবে বাড়ী যাবে সে। না-হ'লে অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শিরা ছিঁড়ে সে মরে যাবে। ওই হরিজনপল্লীর ভিতর দিয়েই গ্রাম্য পায়ে-চলা পথ। পথটা বিজয়দের খিড়কীর পুকুরের পাড় হয়ে—বিজয়ের বাড়ীটা বেড় দিয়ে ঘুরে এসে সদর রাস্তায় পড়েছে। সেই পথ ধরে ঘুরল সে। বিজয়ের বাড়ীর খিড়কীর দরজার মুখে এসেই চমকে উঠল সে। বাঁধানো ঘাটের উপর একটা বছর তিনেকের ছেলে। একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। পড়বে। 'এই! এই!'—শব্দ ঘোষালের গলা থেকে আপনি বেরিয়ে এল। ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝপ ক'রে পড়ে গেল জলের মধ্যে। ঘোষাল মানুষের স্বাভাবিক আকুতিবশে ছুটে এল খানিকটা, কিন্তু খানিকটা এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুকের মধ্যে নিষ্ঠুর হিংসা পরিপূর্ণ হওয়ার তৃপ্তি জেগে উঠল। বিজয়ের

ছেলে। জলে পড়েছে। ডুবেছে, মরবে। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এই বিধান। তার ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হবার নয়। মরুক। মরুক। মরুক। প্রতিহিংসার উল্লাসে পিশাচ হয়ে উঠেছে অক্ষয় ঘোষাল। পরমুহূর্তেই চমকে উঠল সে।

বিজয়ের কণ্ঠস্বর।

পুকুরটার ঠিক ওপারে গুণীবাবুদের বাড়ী; বাড়ীটা পড়ে আছে। ওই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে পূর্ববঙ্গের রেফিউজী। বিজয় ওখানে কার সঙ্গে কথা বলছে।—সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয় যাবেন কিন্তু।

ওই যে গুণীদের বাড়ী থেকেই বেরিয়ে এল বিজয়। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়াল—ও কে? শান্তি! হ্যাঁ। শান্তি বললে—তোমার বউ না বললে আমি যাব না। বউকে পাঠিয়ে দিয়ো।

মুহূর্তে অক্ষয় ঘোষাল স্থানটা অতিক্রম ক'রে মোড় ফিরে সদর রাস্তায় এসে পড়ল। জ্যৈষ্ঠের দুপুরের জনহীন রাস্তাটা ধরে খানিকটা এগিয়ে এসেই আবার একটা গলিপথে ঢুকে পড়ল। কেউ দেখে ফেলবে। আবার একটা গলিপথ। ব্রহ্মবাক্য—ব্রাহ্মণের অভিশাপ মিথ্যা হয় না। হয় না।

আঠারো

গৌরীকান্ত সবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের মায়ের কান্নার শব্দে।—কি হ'ল? বোধ করি বিজয় কলহ করছে মায়ের সঙ্গে। কটুভাষী বিজয়ের মুখের আগল নেই। তাই বটে। ওই তো বিজয়ের চীৎকারও শোনা যাচ্ছে।

মা এবং ছেলের মধ্যে এই ধরণের কলহপর্ব অতি সাধারণ। দিনে এক-আধবার হয়েই থাকে। অভাবের সংসার; অভাব থেকেই কলহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য বিজয়ের পৈতৃক যা আছে এবং গৌরীকান্ত ও বিজয়দের এজমালী যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তাতে অভাব হবার কথা

আদৌ নয়। কিন্তু সম্পত্তি থেকে আয় তো নিজে এসে ঘরে ঢোকে না, সেও তো আদায় করতে হবে। সে আদায় চিরকালই করে গোমস্তায়। আজও করে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আদায় করা বিজয়ের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সময়ও নেই তার এবং যোগ্যতাও নেই। বিষয়-সম্পত্তির আয়-আদায়ের আসল অস্ত্র তার হিসেব-নিকেশের কাগজ। আয় যতই কম হোক, আয়ের হিসেবের কাগজ—বড়তেও যা ছোটতেও তাই। সেই পুরনো আমল থেকে এ পর্যন্ত জমে জমে এক ঘর কাগজ ছিল। একা বিজয় তাকে শেষ করে দিয়েছে। উইয়ে খেয়েছে, তদ্বিরের অভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে মিশেছে, ঝড়ে উড়েছে; বিজয়ের ছেলেরা ছিঁড়েছে, লেখাপড়ার খসড়া খাতা করেছে। শেষ হয়েছে সেবারের সাইক্লোনে; ঘরখানার চালের একটা দিক উড়ে গিয়ে পাঁচিল চাপা পড়ে বিজয়ের হাতে পূর্বপুরুষের জমিদারবাদের কবর হয়েছে। এখন সম্পত্তির খানিকটা হিসেব বিজয়ের পকেটে, খানিকটা ওর মাথায়।

মায়ের অবশ্য তার জন্য কোন দুঃখ নেই। বিজয়ের মা এক বিচিত্র ধরণের মানুষ। নিজের জীবনে তাঁর কোন কামনাই নেই। সংসারে দুঃখ-ভোগকেই শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এবং পরম কাম্য বলে ভেবে এলেন সারা জীবন। ছেলে দেশোদ্ধার করে বেড়ায়—তাতেই মা গৌরব অনুভব করেন। শুধু দুটি কারণে ঝগড়া হয়। এক, দেবসেবার প্রাচীন কালের বরাদ্দের মূল্যের মত বরাদ্দের অভাব হ'লে। এখন পাঁচ ছটাকে দেবতার ভোগ দিতে হয়। এবং ওই পাঁচ ছটাকের মূল্য দিতেও বিজয়ের কষ্ট হয়। সে ঘোরতর আপত্তি করে, রূঢ় কঠোর ভাষায় প্রচণ্ড নাস্তিকতা প্রচার করে বলে—আমি পারব না, দোব না, আমার নাই। ভোগ দিয়ো না, দিতে হবে না। ঠাকুর! দেবতা! ঠাকুরই বা কিসের? দেবতাই বা কিসের? ও-সব আমি মানি না। ফেলে দাও গে জলে।

মা বলেন—তুমি পারব না বললে হবে না। ঠাকুর যিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি সম্পত্তি করে গেছেন। ঠাকুর এবং সম্পত্তি যখন হয়েছিল তখন তুমি ছিলে না। তুমি তারপর উড়ে এসে জুড়ে বসেছ।

সুতরাং আগে ঠাকুরের হবে, তারপর থাকলে—তুমি খাবে; তোমার ছেলেরা খাবে।

এই নিয়ে কলহ এমন উচ্চ হয় যে গোটা নবগ্রাম শুনতে পায়। কোনদিন রাগ করে বিজয় বেরিয়ে চলে যায় গ্রামান্তরে দু মাইল আড়াই মাইল দূরে। কোন প্রজার কাছে টাকা সংগ্রহ করে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—ওই নাও। রাশ রাশ কিনে এনে দেবতার নাম করে গুষ্টিশুদ্ধ গেলো।

কোনদিন মা নিজেই পাড়ায় বেরিয়ে ধার করে এনে অথবা চাল বিক্রী করে দেবতার সামগ্রী কিনে আনিয়ে কাজ চালান।

আর কলহ বাধে—বিজয়ের ছেলেদের নিয়ে।

বিজয়ের ছেলে মেয়েতে ছ-সাতটি; এ ছাড়াও চার-পাঁচটি মারা গেছে। দু-তিনটি মারা গেছে অবহেলায়—অচিকিৎসায় বললে বেশী বলা হবে না। বিজয় দেশোদ্ধারে প্রমত্ত, মদমত্ত গণ্ডারের মত গোঁয়ের মাথায় চলে, তার ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাতের অবকাশ নাই। বিজয়ের স্ত্রী বোকা নন—বুদ্ধিমতীই বলা চলে, কিন্তু স্বামীর ওই স্বভাবের জন্যই হোক অথবা জন্মায়ত্ত কোন দোষগুণের জন্যই হোক তিনি বেশ খানিকটা নির্বিকার ধরণের মানুষ। ছেলেরা নিজেদের যত্ন যা পারে নিজেরাই করে, না-পারে অযত্নেই থাকে। তিনি বলেন—আমি আর কত করব? বাবা! আর পারি না। যা হয় হবে, যেমন অদেষ্ট তেমনি করবে।

ছেলেরা পড়ছে—হাত পা ছড়ছে, রক্তপাত হচ্ছে, হোক।

জ্বর আসছে, কাঁথা পাড়ছে, বিছিয়ে শুচ্ছে। তিনি এক গেলাস জল মাথার গোড়ায় রেখে নিশ্চিন্ত। বাস্।

ছেলেদের কাপড়-জামা ছেঁড়া ময়লা, তার আর তিনি কি করবেন? কত পরিষ্কার করবেন? কত সেলাই করবেন? ওতেই একরকম করে মানুষ হয়ে উঠবে।

স্বামীকে বলেই বা কি করবেন? সে যাবেই বা কোথা আর

রোজগারই বা করে কখন? তাকে বললে তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনতে হবে—কি করব? আমার নাই। আমি দিতে পারব না।

এইখানে মা এসে দাঁড়ান: দিতে পারব না বললে তো হবে না বিজয়।

—হবে না মানে? না থাকলে আমি দেব কোথা থেকে?

—সে ওরা জানে না। এটা বাপের দায়িত্ব।

—সে দায়িত্ব আমি মানি না। বাপের দায়িত্ব! বাপ হয়ে যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি!

মা বলেন—ছি-ছি-ছি!

বিজয় বলে—ওরা মরুক, মরুক, মরুক।

মা বলেন—বিজয়!

—কি?

—তার থেকে তুই মর্ বিজয়, আমি ওদের কাছে তোর মা ব'লে মুখ দেখানোর লজ্জা থেকে রেহাই পাই।

বিজয় বলে—আমি কেন মরব? তুমি মর। তুমিও লজ্জা থেকে খালাস পাবে, আমিও তোমাকে পিণ্ডি দিয়ে খালাস পাব। বলতে বলতেই ছেঁড়া জুতোটা টেনে নিয়ে উত্তর দেয়—আমি দরবারপুর চললাম। সেখানে কলেরা হয়েছে শুনলাম। ফিরব ও-বেলা।

—ছেলেদের মাইনে চাই। ইস্কুলে নাম কেটে দেবে।

—দিকগে কেটে। পড়তে হবে না। পড়ে দরকার নাই।

—কি বললি?

—ঠিক বলেছি। পড়ে কি হবে?

মা মাথা ঠুকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যায়, অস্নাত অভুক্ত। ফিরে এসে ডাকে—মা!

মা সাড়া দেন না। তিনি সেই তখন থেকেই শুয়ে আছেন, তিনিও খান নি। বিজয়ের স্ত্রী বলে—মা শুয়ে আছেন।

—কেন? কি হ'ল?

—কি হ'ল! জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা করে না?

—ও! সেই কথা নিয়ে?

—সেই কথা! সে কথাগুলো কি সামান্ত কথা হ'ল? ছি! তোমাকে ছি! গলায় দড়ি দাওগে তুমি।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিজয়। তারপর বলে—বেশ। আমি চললাম। সেই ভাল—আমার গলায় দড়িই ভাল। তোমরাও খালাস, আমিও খালাস।

এর পর মা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন—বিজয়!

—কি?

—আমার দশটা টাকা'র প্রয়োজন বাবা। আমি ভাইয়েদের ওখানে যেতে চাই। আমি আর পারছি না, পারব না। তোমার যদি না-থাকে বল, আমি ভিক্ষে ক'রে যোগাড় ক'রে নেব। তোমার বাসনের ঘরের চাবি নাও, লক্ষ্মীর ঘরের চাবি নাও।

তিনি ফেলে দেন চাবি।

চাবি পড়ে থাকে—বিজয় উঠে চলে যায়।

এর পর মা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন, ডাকেন—বিজয়, ফিরে আয়।

বিজয় ফিরে আসে।

কোন কোন দিন মা ডাকেন না। বিজয় তবুও কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। মায়ের কাছেই বসে। কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে—আমার দোষ হয়েছে।

মা পা টেনে নিতে চেষ্টা করেন—পা ছাড়ো বাবা, ছাড়ো।

—না। আমাকে ক্ষমা কর তুমি। কেঁদে ফেলে বিজয়।

এইভাবেই শেষ হয়। অবশ্য সব দিন এতখানি এগোয় না; ঝগড়া হয়ে কিছুক্ষণ বাক্যে কর্মে অসহযোগিতার পর আবার এক সময় কথাবার্তা শুরু হয়। মায়ে ছেলেতে বিচার করে দেখেন—কে বেশী কটু কথা বলেছে।

ছেলে বলে—আমার স্বভাব তো জান! কেন আমাকে রাগাও?

তারপর সাড়ম্বরে শুরু করে কোথায় আজ কোন্ মহৎ কর্ম করে এসেছে তারই বিবরণ বর্ণনা। মা মনে মনে ছেলের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন—ওরে বিজয়, তোর কথা তুই সংশোধন কর্। রূঢ় ভাষাটা ছাড়্ বাবা। ওটা ছাড়্।

আজকের কলরবের স্বরটা স্বতন্ত্র।

কান্না। মা কাঁদছেন। কোন্ গোপাল-মানিকের নাম করে কাঁদছেন।

কিশোরবাবু এবং গৌরীকান্ত ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দাওয়ার উপর বছর দুয়েক বয়সের একটি শিশুর মৃতদেহ। পাশে বিজয়ের স্ত্রী বসে আছে পাথরের মত। মা বসে কাঁদছেন—ওরে গোপাল! ওরে গোপাল! ওরে মানিক—এ কি দুঃখ তুই পেলি রে—কি দুঃখ আমায় দিলি রে! ওরে সোনা। বাপের অপরাধে তোর ওপর এ কি নিষ্ঠুর দণ্ড রে! অভিশাপ শেষে তোর উপর ফলল বাবা—

বিজয় মাকে বলছে—চুপ কর বলছি। চুপ কর।

কিশোরবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, যেন পাথর হয়ে গেছেন—তাঁর চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে দুটি জলধারা। উষ্ণ লবণাক্ত। শিশুটির মৃতদেহ দেখে তাঁর অন্তর স্বভাবধর্মবশে আলোড়িত বিগলিত হয়ে পড়েছে মুহূর্তে। কথা বলবার শক্তি হারিয়েছেন তিনি। এই কিশোরবাবুর স্বভাব।

—কি হয়েছিল বিজয়? কোন অসুখের কথা তো শুনি নি?

—অভিশাপ গৌরীকান্ত, অভিশাপ। মানুষের মর্মান্তিক দুঃখের অভিশাপ বড় ভয়ঙ্কর বস্তু বাবা।

বিজয় চীৎকার করে উঠল—মা, তোমাকে আমি চুপ করতে বলছি, তুমি চুপ কর। অভিশাপ! অভিশাপে যদি মানুষ মরত, তবে পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকত না। ভগবান পর্যন্ত মরে যেত।

গৌরীকান্ত বিজয়ের হাত ধরে বললে—আয়, বাইরে আয়। এ সময়ে এ সব তুই কি বলছিস? ছি! আয়। আসুন কিশোরবাবু, কাঁদলে

একটু শান্তি পাবেন ওঁরা। আমরা থাকলে বউমার অসুবিধে হবে। আসুন।

—নাও, কাঁদ। পেট ভরে কাঁদ। পেট ভরে কাঁদ। কিন্তু—

বিজয় কেঁদে ফেললে হঠাৎ। বললে—অভিশাপে এই হয়েছে বলে কেঁদো না কিন্তু। আমি কোন অন্যায় করি নি। আমি বিন্দু-বিসর্গ জানি না। এ অপরাধ, এ অন্যায় মা হয়ে আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না তুমি।

গৌরীকান্ত তার হাত ধরে আকর্ষণ করল, সে-হাত সে ছাড়িয়ে নিল। একবার কাঁদল। তারপর আবার চোখের জল মুছে রূঢ় কণ্ঠে বললে—আমি মানি না। আমি মানি না।

—তুই না মানলে কি হবে? সত্যি তো মিথ্যে হয় না বাবা।

—কি সত্যি? কোন্ কথা সত্যি? আমি কানাই বাউরীকে দিয়ে অক্ষয় ঘোষালকে মারিয়েছি?

—না। তা তো বলি নি বাবা। সে মিথ্যে তো বলি নি।

—তবে? তবে কি?

—মানুষের অভিশাপ সত্যি বাবা। দেখছ তো চোখের ওপর।

—কোন পাপ করি নি, তার কোন ক্ষতি করি নি, তবু সে অভিশাপ দিলে সেই অভিশাপ সত্যি হবে?

—তার বিশ্বাসে, সে তোমার অনিষ্ট চিন্তা ক'রে যদি ভগবানকে ডেকে থাকে?

—সে ভগবানকেই আমি মানি না।

—বিজয়! আর সর্বনাশ করিস নে।

—সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ? একটা দু বছরের ছেলে মরা সর্বনাশ! তা হ'লে পৃথিবীতে অহরহই সর্বনাশ হচ্ছে। অভিশাপ! অভিশাপে যদি মানুষ মরত, তা হ'লে পৃথিবীতে আজ একটা মানুষও থাকত না বেঁচে। তুমি এমন ক'রে চীৎকার ক'রো না বলছি। গিয়েছে—গিয়েছে। সবারই যায়, দশটা হ'লেই পাঁচটা যায়, সাতটা যায়, কারুর বা দশটাই যায়। আমার একটা গিয়েছে, কি হবে? তোমার ছেলে মরে নি,

আমার ছেলে মরেছে। তুমি এমন ক'রে বুক চাপড়াও কেন? আমি মরি, তখন যা খুশী করো।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরবাবু।

গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল।

এই মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলেন দেবকী দেবী এবং শান্তি। বোধ করি বাড়ীর বাইরে থেকেই কথাগুলি তাঁরা শুনেছিলেন। শান্তি এসেই সেই কথার সূত্র ধরে বললে, ছি বিজয়, এ সব কি বলছ?

জ্বলে উঠল বিজয়। বললে—থামুন, আপনি থামুন। বি.এ. পাস, লেখাপড়া জানা মেয়ে আপনি, তা আমি জানি। আপনাদের সঙ্গে আমার মেলে না। আমি যা বুঝি তাই বলি।

সে হন হন ক'রে বেরিয়ে চলে গেল।

বাড়ীর বাইরে অনেক লোক এসে জমেছিল। বিজয়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। এরা সব মায়ের ওই প্রলাপোক্তি শুনছে, মনে মনে হাসছে, বিশ্বাস করছে যে, অক্ষয় ঘোষালের অভিশাপে এই হয়েছে। ভাবছে ঘোষালকে কানাই চড় মেরেছে তারই নির্দেশে এইটাই সত্য। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে সে বললে—যাও ভাই, বাড়ী যাও সব। ছোট ছেলে জলে ডুবে মরেছে। মা কাঁদছে। এর আর কি শুনবে, কি দেখবে? যাও, সব বাড়ী যাও। ভক্তি, শোন।

ভক্তি বিজয়ের চেলা। শিক্ষার দিক দিয়ে বিজয়ের চেলা হতে তার বাধা নাই। বিজয় ম্যাট্রিক পাস করেছিল এককালে, শক্তি থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। প্রকৃতিতে সে কিন্তু শান্ত মানুষ, একটু মুখচোরা লোক; সেই দিকে একটু গরমিল আছে এবং সেইখানেই বিজয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হতে পেরেছে। ভক্তির অন্যদিকে গুণ বিজয়ের চেয়ে কম নয়। মড়া-ফেলা, ময়লা মাটি সাফ করা থেকে আগুন নেবানো, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোতে বিজয়ের পাশে পাশেই ফেরে। ভক্তি চুপ করেই একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ করি কি ব'লে বিজয়দাকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ভক্তি এগিয়ে এল।

বিজয় বললে—যা হয় ব্যবস্থা কর।

অর্থাৎ শ্মশানে পাঠাবার ব্যবস্থা।

ভক্তি বললে—একটা কথা আছে, ওদিকে চলুন।

—কি কথা? কথা-টথা এখন থাক্ ভক্তি। পরে হবে। এখন ভাল লাগবে না।

—চলুন না।

—বল, তবে এইখানেই বল।

—না—

—চল। আমার মরণ, হয় তো বাঁচি, তোমাদের কথার দায় থেকে—

ভক্তি কোন কথা না-বলে এগিয়ে চলল নির্জন স্থানের দিকে।

—কি? কি কথা বল?

ভক্তি মুখ নীচু করেই দাঁড়িয়ে রইল।

—বল হে।

এবার ভক্তি মৃদুস্বরে বললে—ওরা একটা দরখাস্ত করেছে।

—দরখাস্ত? কিসের দরখাস্ত? করুক। করুক দরখাস্ত। যা করতে পারে করুক।

বিজয় হন হন করে চলে এল। ভক্তির উপর তার বিরক্তির আর সীমা ছিল না। দরখাস্ত করেছে। এখন সেই দরখাস্ত নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই বটে তার! আর এরা, এই ভক্তি পর্যন্ত সেই দরখাস্ত দরখাস্ত করে পাগল হয়ে উঠেছে। দরখাস্তকে সে গ্রাহ্যই করে না। কারও সাহায্যেরও তার প্রয়োজন নাই। সে নিজেই চলল বাউরী-পাড়ার দিকে।

লোক চাই।

এ অঞ্চলে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুর শব দাহ করে না; সমাধি দেয়। একজন লোক চাই যে গর্ত খুঁড়ে দেবে। আর ছেলেটাকে নিয়ে সে নিজেই যাবে। কারও সাহায্যের তার প্রয়োজন নাই।

—বিজয়দা, শুনুন।

—না। শুনব না। শুনবার আমার সময় নাই ভক্তি। আমাকে তুমি মাফ কর।

—কিন্তু ছেলেটিকে শ্মশানে পাঠাবার আগে থানাতে একবার খবর দিতে হবে তো। জলে ডুবে মৃত্যু।

হ্যাঁ। কথাটা তার ভুল হয়ে গিয়েছে। বিজয় থমকে দাঁড়াল, বললে—তুমি একবার যাও। কিংবা—। কিংবা কিশোরবাবুকে বল গিয়ে।

—আমি থানা থেকেই আসছি বিজয়দা।

—ব'লে এসেছ?

—সেই কথাই বলছি। ওরা এরই মধ্যে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছে। দরখাস্ত করেছে—

থেমে গেল ভক্তি। বলতে সে পারছে না। আটকে যাচ্ছে মুখে।

এবার বিজয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে। কাছে এসে মৃদুস্বরে ডাকলে—ভক্তি!

—বিজয়দা।

—কি দরখাস্ত করেছে?

—দরখাস্ত করেছে, আমরা জনপরম্পরা শুনিতেছি, ছেলেটির জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয় নাই। খুব সম্ভব ছেলেটিকে হত্যা করা হইয়াছে।

—হত্যা করা হয়েছে!

—হ্যাঁ। আপনি নাকি চড় মেরে মেরে ফেলেছেন।

—আমি চড় মেরে মেরে ফেলেছি খোকনকে?

—হ্যাঁ। তারপর সেইটা ঢাকবার জন্যে জলে ফেলে দিয়ে, তুলে প্রকাশ করা হচ্ছে যে, জলে ডুবে মারা গেছে। দারোগাবাবু আমাকে দরখাস্ত দেখালেন। বললেন—কি করব ভক্তিবাবু, আমি বুঝতে পারছি না।

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল বিজয়।

অভিশাপের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু হত্যার অভিযোগ? সে তার ছেলেকে চড় মেরে খুন করেছে? হত্যা করেছে?

একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে বললে—বিজয়দাকে ডাকছে। দারোগাবাবু এসেছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজয় বললে—চল।

তাই হবে। ফাঁসীকাঠেই ঝুলবে সে। চল।

*　　　*　　　*　　　*

কিশোরবাবু দীর্ঘপদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মর্মান্তিক ক্ষোভে আক্ষেপে। মনে মনে তাঁরও যেন অভিসম্পাত দেবার বাসনা উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে, উচ্চকণ্ঠে আকাশ-বিদীর্ণ-করা চীৎকারে অভি-সম্পাত দেন--ধ্বংস হয়ে যাক, এ পাপ নবগ্রাম ধ্বংস হয়ে যাক।

দারোগা বসে আছেন নতমুখে।

গৌরীকান্ত বসে রয়েছে গম্ভীরমুখে। তার হাতে দরখাস্তখানা।

একজন অপরিচিত লোক খামখানা একজন কনস্টেবলের হাতে দিয়েই চলে গিয়েছে। বলেছে—এখুনি দারোগাবাবুর হাতে দাও। জরুরী।

বাইসিক্লে চেপে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বাইসিক্লে চেপে চলে গিয়েছে। এতে সন্দেহের কিছু ছিল না, কনস্টেবল সন্দেহও করে নাই।

দরখাস্তের নীচে লেখা আছে—অবিকল নকল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হইল।

কারণের পর কার্য, কার্যের ফলে নূতন কারণের উদ্ভব, তার ফলে কার্য, সুনিপুণ পরম্পরায় গেঁথে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ফাঁক রাখা হয় নি কোথাও। এর মধ্যে জড়ানো রয়েছে—শান্তি, গৌরীকান্ত, বিজয়, বিজয়ের মা।

লেখা হয়েছে—ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী শান্তি মুখার্জির রীতি-আচরণ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এখানকার লোকের ধারণার কথা সাব-ইন্‌স্পেক্টর অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। এবং সম্প্রতি গৌরীকান্তের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা

লইয়া যে দরখাস্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি যে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাও সর্বজনবিদিত অর্থাৎ প্রমাণিত সত্য।

পূর্বে এই শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বিজয়চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা লইয়াও দরখাস্ত হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে এখানকার লোকের ধারণার কথাও সকলে জানেন।

গত রাত্রে এই লইয়া শিক্ষয়িত্রী শান্তি দেবীর সঙ্গে বিজয়ের বচসা হয়। বিজয় তাহাকে চাকরী ছাড়িয়া যাইতে দিবে না বলে। শান্তি দেবী চাকরী ছাড়িয়া গৌরীকান্তের সঙ্গে কলিকাতা যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সব লইয়া গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়াযুক্ত যে সব বিজ্ঞাপন মারা হইয়াছে তাহা দেখিতে পারেন।

অদ্য ভোরে এই লইয়া বিজয়ের সহিত তাঁহার মায়ের কলহ হয়। সে কলহ অনেকে শুনিয়াছে। সেই কলহের সময় ছেলেটি বার বার তাহার পিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া কোলে চাপিতে চাহিলে ক্রোধোন্মত্ত বিজয় তাহার গালে চপেটাঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির মৃত্যু হয়। বিজয়ের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, বিজয় তাঁহাকে শাসায় এবং চুপ করিতে বলে।—চুপ কর বলছি, চুপ কর। বিজয়ের এই শাসনবাক্য পাড়ার সকলেই শুনিয়াছে।

আমরা এই অপরাধের এবং মহাপাপের ধর্মসম্মত ও ন্যায়সম্মত বিচার চাই। রীতিমত তদন্ত করা হউক। লাস সৎকারের আদেশ দিলে প্রধান প্রমাণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়াই অবিলম্বে থানা-অফিসারকে সমুদয় বিবরণ জানানো কর্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। এবং অত্র দরখাস্তের নকল মাননীয় জেলা-শাসক মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইল। ইতি—নবগ্রামের ন্যায় ও ধর্ম-বিচারপ্রার্থী অধিবাসীবৃন্দ।

নীচে পুনশ্চ লেখা হইয়াছে—ছেলেটি মারা গেলে জলে ডুবাইয়া দিয়া তুলিয়া আনিয়া জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, এই কথা রটনার পরামর্শ দিয়াছেন সুচতুরা শ্রীমতী শান্তি দেবী। ভাল করিয়া তদন্ত করিলে সবই প্রকাশ পাইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

বিজয় দরখাস্তখানা প'ড়ে গৌরীকান্তের হাতে ফিরিয়ে দিলে এবং হন হন করে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে শিশুটির মৃতদেহ এনে দারোগার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—চালান দিন লাস। এই নিন।

উনিশ

দরখাস্তের লেখাটা অক্ষয় ঘোষালের হাতের; কিন্তু দরখাস্তটা থানায় দিয়ে গেছে কপিলদেব নিজে। বিজয়ের ছেলেটিকে জলে প'ড়ে যেতে দেখে—সেই গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরের নির্জনতায় অলিগলি ঘুরে নিজের বাড়ীর দোরে এসেও তার বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছে হয় নি। সারা গ্রামে চীৎকার করে বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল।—দেখ দেখ, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের ফল দেখ!

তার সারা জীবনের বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হওয়া ক্ষোভ অকস্মাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রামে চীৎকার করতে তার সাহস হয় নি। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সেই রৌদ্রে গিয়েছিল দেবীপুর। দেবীপুরে গিয়ে বলেছিল রমাকে। সবিস্তারে বলেছিল—সে যখন বায়েনপাড়ায় শুনলে যে ওই পাষণ্ড বাউরীটার পৃষ্ঠপোষক, তাকে চড় মাখানোর পিছনে ছিল ওই পাষণ্ড বিজয়েরই উস্কানি, তখন মনে মনে সে সূর্যদেবকে ডেকে বলেছিল—তুমি যদি এর বিচার না কর তবে তুমি মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। তোমাকে অভিসম্পাত দেব আমি, তুমি নিবে যাবে, তুমি গলে যাবে।

অক্ষয় কথা বলে হাত-পা নেড়ে ভঙ্গি ক'রে। তাই বলেছিল—

ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হয় না। ওই তো বায়েনপাড়া থেকে ওই ওদের বাড়ীটুকু আসতে আসতে ঘটে গেল।

এইখানে মিথ্যা কথা বললে অক্ষয়। সত্য বলতে সাহস হ'ল না। বললে না—আমার চোখের সামনেই ছেলেটা এসে ঘাটে নামতে গিয়ে টুপ করে পড়ে গেল। বললে, দেখলাম ঘাটের ধারেই একটা ছোট

ছেলে ভাসছে। আমি ছুটে তুলতে গিয়ে দেখলাম—বিজয়ের ছেলে। আমি আর ছুঁলাম না, ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।

তারপরই বললে—হবে না? শুধু কি আমার অভিশাপ? পাপ কত! আকাশে ঠেকার মত পাপ। লম্পট ব্যাভিচারী ষড়যন্ত্রকারী—ওর পাপ আকাশপ্রমাণ। ওই ছেলেটাকে যখন আমি ঘাটে ভাসতে দেখলাম, তখন ওই পাষণ্ড কি করেছিল জানেন? ওই আপনার প্রিয়পাত্রী—লোকে বলে আপনি নাকি তাকে বিয়ে করবেন—ওই শান্তির সঙ্গে প্রেমলীলা করছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি এপাড়ের ঘাটে, ওরা দুজন পুকুরের ওপাড়টায় গুণীদের খিড়কির দরজায়। আমি স্বচক্ষে দেখলাম শান্তিকে ও টেনে নিলে বুকে।

কপিলদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অক্ষয়ের মুখের দিকে। সে দৃষ্টি দেখে অক্ষয় অস্বস্তি বোধ করলে, বললে—এমন করে তাকাবেন না মশায়। অক্ষয় ঘোষাল কাউকে ভয়ও করে না, কাউকে খাতিরও করে না। সত্যি কথা বলতে তার ভয় নাই।

—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—মিথ্যে বলছি? স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল কপিলদেবের মুখের দিকে। তারপর সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কপিলদেবের হাত ধরে বললে—আসুন।

—কোথায়?

—আসুন আমার সঙ্গে। আসুন।

হিড় হিড় ক'রে সে টেনে নিয়ে গেল ধর্মরাজের মন্দিরের দিকে। বললে—দাঁড়ান। নিজে উঠে গেল দাওয়ার উপর; দরজার শিকল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে সিংহাসনাসীন শিলাখণ্ডটিকে স্পর্শ ক'রে বললে—মিথ্যে বললে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

অক্ষয়ের কাছে ওই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নির্জনে দুটি যুবক যুবতীর ওই ধরনের উল্লাস-মুখরতার সঙ্গে হাত ধ'রে টানাটানি আর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার মধ্যে তফাত কিছু নেই।

* * *

অতি বাস্তববাদী কপিলদেব। জীবনে এই সব ধরনের আচার-আচরণের কোন মূল্যই তার কাছে নেই। সমাজ আর শৃঙ্খলা এ দুটি ছাড়া পাপ পুণ্য নীতি দুর্নীতি তার কাছে নিতান্তই অর্থহীন। কিন্তু আজ সমাজও নেই তার কাছে। কারণ সমাজ ব'লে যা আছে—তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে তাকে। নতুন সমাজ, নতুন নিয়ম, নতুন আদর্শ, নতুন দৃষ্টি, সব নতুন, সব নতুন, সব নতুন। অলীক কল্পনার ঈশ্বর পাপপুণ্য স্বর্গনরক সর্বস্ব মিথ্যাচারে ভরা—এই সমাজের কণামাত্র অবশেষ থাকবে না। আজ এই ভাঙার কাজেই সে নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। এ ছাড়া আর কোন কাজই তার নেই, কোন বিশ্বাসও নেই। ভাঙার সময় সব ভেঙে যাক; আবার আপনা থেকেই সব নতুন গড়ে উঠবে। ন্যায়, নীতি, বিশ্বাস—সব এই কারণেই কোন দলের কোন ন্যায় কোন নিয়মের সঙ্গেই তার বনল না। সে ছিল গীতাবাদী বিপ্লবী নন্দদুলালের শিষ্য। তারপর গিয়েছিল আর একটি দলে; ছোট দল—নিজেদের কয়েকজন নিয়ে একটি দল; বিয়াল্লিশ সালে দলটা ভাঙল। জন কয়েক গেল আগস্ট আন্দোলনে; কয়েকজন গেল এ-দলে ও-দলে সে-দলে; সে গড়লে নতুন দল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় সে দল নিয়ে মেতেছিল দাঙ্গায়। হিন্দুধর্মের জন্য তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। এই আত্মঘাতী কলহকে মোড় ফিরিয়ে বিপ্লবের খাতে বইয়ে দিতে চেয়েছিল; কিন্তু চেষ্টা তার সফল হয় নি। দেশ ভাগ হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গে থাকাও তার পক্ষে নিরাপদ হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে নতুন চেষ্টা আরম্ভ করেছে। সে জানে বামপন্থী দলের বিপ্লবচেষ্টা ছাড়া বাঁচবার পথ নেই। তাদের সে চেষ্টা করতেই হবে। হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানাতে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সে মনে মনে হাসে আর ওদের ব্যঙ্গ করে। রাজাকারদের সঙ্গে কংগ্রেসের কলহের সুযোগ নিয়ে আজ যে বিদ্রোহ ওরা হায়দ্রাবাদে করতে যাচ্ছে—বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের আত্মকলহের মধ্যে সেই চেষ্টা করলে আজ বিপ্লব অনেক পথ এগিয়ে যেত। সে জানে তাকে অনেকে উন্মাদ বলে, ভ্রষ্টচরিত্র বলে। বলুক। সে অট্টহাস্য করে।

ওই সব বামপন্থী দল, ওদের দলের লোকেরা ওকে ঘৃণা করে। করুক। সে জানে, এই লগ্নে তারা যখন বিপ্লবকে উপেক্ষা করলে তখন অনেক দূরে পড়ে গেল তাদের আশা-ভরসা। থাক্ সে কথা, থাক্ ওদের প্রসঙ্গ। তার লক্ষ্য শুধু বিপ্লব। ভেঙে যাক, চুরমার হয়ে যাক প্রাচীন জগৎ, পুরনো সমাজ জীর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা—সব—সব—সব। এই কাজে সে চলেছে বুকের-পাঁজর-জ্বালানো মশাল হাতে ক'রে। তবে প্রাণ দেবার জন্য নয়, বিপ্লবকে সফল করবার জন্য। তার জন্য প্রয়োজন হলে এবং সুবিধা পেলে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি অতিক্রম করবার সময় শবদেহ বিছিয়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে চলে যাবে, পায়ে কাঁটা ফোটাবে না। বিপ্লব শেষ করবার জন্য তাকে বাঁচতে হবে। এ পথে যে চলে তার কোন মোহ নাই। সেই কারণেই ক'দিন আগে রমা আর শান্তির কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়েছিল—রমার চেয়ে শান্তির মূল্য অনেক কম।

এ সবই সত্য। কিন্তু তবু কপিলদেব ক্রোধে যেন উন্মত্ত হয়ে গেল। অক্ষয় ঘোষাল যে মুহূর্তে ওই ধর্মরাজকে স্পর্শ করে শপথ ক'রে বসল—সেই মুহূর্তে তার সব অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল। অক্ষয় ঘোষাল ওই পাথর ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলবে না, বলতে পারে না, পারবে না। সন্দেহ তার কিছুদিন থেকে হয়েছে। শান্তি যেন আর সে শান্তি নেই। নন্দবাবুর ভগ্নীর, দেবকী দেবীর মেয়ের পক্ষে তার এই অতি বাস্তব মতবাদকে গ্রহণ করা কঠিন এটা সে জানত, তবু যেদিন শান্তি সেই মাতৃহারা শিশুটির মাতৃত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে অপবাদ কলঙ্ক মাথায় করতে ভয় পায় নি সেদিন তার মনে এ আশাও হয়েছিল যে, হয়তো পারবে। কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা সাময়িক উন্মত্ততা, একটা উচ্ছ্বাস—তার বেশী কিছু নয়। ধীরে ধীরে আবার সেই নন্দবাবুর ভাগ্নীর সত্তা নূতন করে জেগে উঠছে। সেই পুরনো পচা ন্যায়-অন্যায়বোধ, পাপপুণ্য, মনগড়া নীতি-দুর্নীতি। ধর্ম পরলোক ঈশ্বর নামক অন্ধবিশ্বাস থেকে এক দৌড়ের পথ এই বিংশ শতাব্দীর জীবনবিশ্বাস এবং তাও আবার অ্যাটমবোমার ঘা খেয়ে মোড় ফিরে ঘুরে সেই শ্রীঈশ্বরের চরণতলে এসে শরণ নেবার

উপক্রম করছে। আজ অক্ষয় ঘোষালের শপথ করে প্রকাশিত এই সত্য—শান্তির উপর সব বিশ্বাস ঘুচিয়ে দিয়েছে। ওই মূর্খ বর্বর বিজয়ের প্রতি তার আসক্তি !

আসক্তিতে অবশ্য সে বিশ্বাস করে না। এখনও করে না।

অক্ষয় যা দেখেছে সে তার দৃষ্টিবিভ্রম নিশ্চয়। আলিঙ্গন চুম্বন নয়। তবে তারা যে দুজনে নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিল—পরম কৌতুক ও উল্লাসের সঙ্গে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করেছে, হেসেছে, এতে তো সন্দেহ নেই। প্রেম না হোক, প্রীতি নিশ্চয়।

আর প্রেম হতেই বা বাধা কি ? শান্তির শিক্ষা, তার রুচি ?

অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করে কপিলদেবের।

এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের অন্ধকার মহলের খবর সে খুব ভাল ক'রে জানে। শুধু এ দেশের কেন, সকল ধর্মাশ্রিত দেশের সেই একই ইতিহাস। আঁধার ঘরের গোপন কথা। অমাবস্যার ইতিকথা।

কপিলদেব অক্ষয় ঘোষালকে বললে, লিখুন থানা-অফিসারের কাছে দরখাস্ত। কপি টু দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

অক্ষয় এবার হতভম্ব হয়ে গেল।

কপিলদেব বললে, সে হবে না। নইলে চলুন আমার সঙ্গে থানায়। আমি বলব, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। বলবেন যা দেখেছেন। নইলে আমি থানায় যাব, গিয়ে বলব, আপনি নির্জনে ঘাটের ধারে ছেলেটাকে পেয়ে জলে ডুবিয়ে মেরেছেন বা মেরে জলে ফেলে দিয়েছেন।

কপিলদেবের ওইটেই ছিল আসল বিশ্বাস।

অক্ষয় ঘোষালের বিবরণ শুনেই তার বিশ্বাস হয়েছিল—এটি যে হত্যাকাণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ হত্যা অক্ষয়ই করেছে। নির্জন ঘাটে ছেলেটাকে একলা দেখে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

সে জানে চড় মেরে ছেলেটাকে মেরে ফেলে জলে ডুবিয়ে দেবার

বাবু, যদি আমার একটা মেয়ে থাকত তবে তোমার গৌরীকান্তের সঙ্গে বিয়ে দিতাম। আমরা বাক্‌দত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু শর্ত করেছিলাম—ভারতবর্ষ স্বাধীন না হ'লে আমরা লৌকিক বিবাহে আবদ্ধ হব না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল, কিন্তু দেশের দুর্যোগ ঘুচল না। আমরা নতুন শপথ করলাম, আসুক নতুন কাল—সুসময়। ততদিন আমরা অপেক্ষা করব। বিজয় কথাটা জানে। সম্পূর্ণ না জানলেও কিছুটা জানে। বিজয়ের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক রহস্য-কৌতুকেরই বটে। তাতে বিজয়ের বউয়ের রাগ হতে পারে। এবং কপিলবাবুরও রাগের কারণ আছে। নন্দবাবুর এই শিষ্যটি শান্তিকে তাঁর দলে টেনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবেও পেতে চেয়েছিলেন। কপিলদেববাবু কঠোর বাস্তববাদী লোক, এ যুগের অতিবাস্তব বিজ্ঞানবাদকে কঠোর সাধনায় আয়ত্ত করেছেন ; তবুও হৃদয়ের ব্যাপারে বিচলিত হয়ে তিনি শান্তিকে বিজয়ের প্রতি অনুরাগিণী ভেবেছেন—এটাই আশ্চর্য!

সমবেত লোকেদের মধ্যে বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। অবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে। হয় নি শুধু কপিলদেব। সে হেসে বললে—অতি চমৎকার নাটক গৌরীকান্তবাবু! কনগ্র্যাচুলেশন। বলেই সে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল।

কিশোরবাবু খপ ক'রে তার হাত দুখানা চেপে ধরে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার জিভখানা টেনে ছিঁড়ে দি।

কপিলদেব একটু হেসে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

শান্তির হাত ধ'রে গৌরীকান্ত মৃদু আকর্ষণ ক'রে বললে—চল শান্তি। ওঠ।

কুড়ি

দিন কয়েক পর।

শান্তি এসে গৌরীকান্তের সামনে দাঁড়াল। সুপ্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়ে গৌরীকান্ত বললে—এস। প্রতিদিনই তোমার প্রতীক্ষা করেছি। তুমি আস নি। তোমাদের ওখানে গিয়েছি; তুমি নির্বাক্‌ই থেকেছ। জানতাম তুমি আসবে একদিন। ব'স, ওই চেয়ারখানা টেনে নাও। আমার এখানটায় তো দেখছ ছোট তক্তাপোশখানা পুঁথিতে ভ'রে গেছে।

শান্তি চেয়ারখানাতেই ব'সে বললে—এই শিভালরিটুকু কি না করলেই হ'ত না? এর জবাব কি আমি দিতে পারতাম না?

—পারতে। নিশ্চয় পারতে। তোমাকে অবলা বা অবোলা অপবাদ আমি কখনই দেব না।

—আমাকে আপনার জীবনের সঙ্গে কেন জড়াচ্ছেন?

—ওই মুহূর্তটিতে সেদিন উপলব্ধি করলাম তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে আছে। সেই নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে আজও পর্যন্ত তোমাকে চেয়ে এসেছি। তুমিও আমাকে চেয়েছ ব'লেই আমার ধারণা। অস্বীকার হয়তো করতে পার। কিন্তু আমি বলব—তোমার মন তুমি জান না। আমার মনে আছে, নারায়ণগঞ্জের বাসায় তোমার মা আমার পরিচয় পেয়ে বলেছিলেন—শান্তি বড় হওয়া পর্যন্ত আমি বাঁচব কি না জানি না, যদি বাঁচি আর রাধাকান্তবাবুর ছেলে যদি বেঁচে থাকে—

শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরীকান্ত থেমে গেল। হেসে বললে—আজও তোমার মুখ ঠিক সে দিনের মতই রাঙা হয়ে উঠেছে শান্তি। তা ছাড়া তোমাকে তো আমি প্রকারান্তরে মুক্তিও দিয়েছি শান্তি। কালান্তর—সে যে কবে সম্পূর্ণ হবে তা তোর ছুটি [illegible]

শান্তি এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করে বললে

ফেলে জলে ডুবিয়ে দেবার

ঘেঁটে, অহিংসা মন্ত্র জপ করে কোনদিনই হবে না। কালান্তর হয় বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে।

—আমিও একদিন তাই ভাবতাম। গান্ধীজীর সাধনার উপর বিশ্বাস রেখেও তাই ভাবতাম। মনে হ'ত—এ ভুল, এ ভুল। কিন্তু না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে যা বুঝতে পারি নি, এখানে এই নবগ্রামে ফিরে এসে তা বুঝলাম।—এই হাতের লেখ চেন?

একখানা খাতা সে এগিয়ে দিল শান্তির সামনে।

—বাবার হাতের লেখা?

—হ্যাঁ। নবগ্রাম নিয়ে তিনি নবগ্রাম-মঙ্গল কাব্য রচনা করবার কল্পনা করেছিলেন। এখানকার কাহিনী থেকে এই মহাসত্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমি এখানে এসে তাঁর খাতা পেলাম কিশোর-বাবুর কাছ থেকে। তিনি কিশোরবাবুকে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিশোর-বাবু সারা অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে আরও অনেক কাহিনী, অনেক কথা সংগ্রহ করেছেন। খানিকটা লিখেছেনও। তারপর দিয়েছেন আমাকে।

* * *

শান্তি খাতা তুলে নিয়ে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে উল্টে উল্টে দেখছিল।

খাতাখানির প্রথম পৃষ্ঠাতেই অন্য কারুর হস্তাক্ষরে লেখা—"সাধুপ্রবর শাস্ত্রজ্ঞ কুলীনকুলশিরোমণি রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার দেবশর্মার করকমলে উপহার প্রদত্ত হইল। আপনি এই খাতায় নবগ্রাম-মঙ্গল লিখিবেন। ইতি শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্মা।"

শান্তি দ্রুত পাতা উল্টে গেল—শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

প্রায় একশো পাতা লিখেছেন। গৌরীকান্ত বললে—শেষটুকু আগে পড়। শেষটুকুর দিকেই চেয়ে বসে ছিল শান্তি। এটুকু মোটা মোটা অক্ষরে লেখা:

"শ্বশুরের অন্নভোজী কুলীন ব্রাহ্মণ
…বি তা হতেও মন্দ যে জীবন।
…ন মন্দ, উচ্চ আচরণ

অভিলাষে থাকিলেও হয় না পূরণ।
মানুষের উপহাস করিতাম না গ্রাহ্য
নিরুপায়, বিধিবাদী, করিলেন না সহ্য।
সরস্বতীর ক্ষমা মাগি কাব্য হল না শেষ।
স্ত্রীর সঙ্গে অন্ন গেল ছাড়িলাম দেশ।

এর পর আর খানিকটা গদ্যে লেখা রয়েছেঃ "নবগ্রামের ভবিষ্যৎ-কালে যে কবি আসিবেন, এই নবগ্রাম-মঙ্গল কাব্য সুসম্পন্ন করিবার দায় তাঁহার উপর বর্তিল। কবি হইয়া জন্মিয়া যিনি ইহা উপেক্ষা করিবেন, তিনি সংসারে নিন্দিত হইবেন। ধর্মের নিকট তিনি অপরাধী হইবেন। ভগবানের নিকট দণ্ডিত হইবেন। আর যিনি এই কর্ম সম্পাদন করিবেন, তিনি ইহলোকে সকল জনের প্রশংসা পাইবেন। পরলোকে [illegible]পদ প্রাপ্ত হইবেন। সর্বোপরি নবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাশক্তির আশীর্বাদে ধন্য হইবেন। ফুল্লরা দেবীর দিব্য, নবগ্রামের দিব্য, এই গ্রামের সকল বংশের দিব্য রহিল।"

আবার সে ওল্টাল প্রথম পৃষ্ঠা। প্রথমেই সৃষ্টি-তত্ত্ব।

কালী নাই কাল নাই—বিচিত্র সে নাস্তি
ব্রহ্মরূপিণী অব্যক্ত—অস্ত কোথা অস্তি?
বিন্দু নাই, বিশ্ব নাই, প্রতিবিম্ব কুত্র?
শূন্যমাঝে ছিদ্র কোথা—কোথা কোন সূত্র?
সহসা আনন্দ ব্রহ্ম বীজ সম ফোটে—
এক দলে কাল অন্য দলে কালী প্রকটে।
প্রশান্ত অনন্ত কাল অরূপেতে স্থিতি—
দুরন্ত গতি ব্যাপ্ত—অসীমা প্রকৃতি।

উঠে এলো গৌরীকান্ত। পৃষ্ঠাটির দিকে তাকিয়ে দেখে বললে-বিচিত্র তাঁর উপলব্ধি। আমি ভাবি আর অবাক হই, কি ভাবে তি[illegible] সেকালের লোক হয়েও নিজের চিন্তাকে শাস্ত্রতন্ত্রে[illegible] দিয়ে ছুটে পালিয়ে ভয় করেন নি। সঙ্কোচ হয় নি।

[illegible] ফেলে জলে ডুবিয়ে দেবার